উৎসর্গপত্র

ভাওয়াল-অধিপতি, সুধীগণাগ্রগণ্য

শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী

বাহাদুর করকমলেষু—

রাজন্,

আপনি সুশিক্ষিত, সাহিত্য-সেবী, বিদ্যোৎসাহী, বদান্য এবং বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের আশ্রয়; আপনি বঙ্গমাতার সুসন্তান। তাই আপনার গুণমুগ্ধ এই দীন গ্রন্থকার আজ তাহার এই হিমালয় লইয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত। ভক্তিপূর্ণ এই ক্ষুদ্র উপহার দয়া করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক আমাকে কৃতার্থ করুন।

বিনয়াবনত

শ্রীজলধর সেন।

তৃতীয় সংস্করণের কথা।

অতি অল্পদিনের মধ্যে 'হিমালয়ের' তৃতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইল—বাঙ্গালা ভাষার দুর্ভাগ্য! ভাষার যথেচ্ছ-ব্যবহার যদি পিনাল কোডের অন্তর্ভূত অপরাধ হইত, তাহা হইলে যে 'হিমালয়ের' লেখকের নির্ব্বাসন দণ্ড বিহিত হইত, সেই 'হিমালয়ের' তৃতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইল, ইহা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি-প্রয়াসী বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ গবেষণার বিষয়!

আর একটী কথা গোপন করিবার আবশ্যকতা দেখি না। কয়েকজন শ্রদ্ধেয় বন্ধুর অনুরোধে এবং কিঞ্চিৎ অর্থ লাভের আশায় আমি না বুঝিয়া না ভাবিয়া 'প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব' বামনের অভিনয় করিতে গিয়াছিলাম—'হিমালয়' খানিকে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলাম। সে ধৃষ্টতার উপযুক্ত ফললাভ হইয়াছে। অতঃপর 'হিমালয়ের' তৃতীয় সংস্করণ বাহির করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু পূজনীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র, আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় কিছুতেই ছাড়িলেন না, তাই তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

পুস্তক ত প্রকাশিত হইল; এখন ভাবিতেছি এ পুস্তক কিনিবে কে? ইহা ছাত্রগণের পাঠের 'অনুপযুক্ত', সংসারপ্রবিষ্ট শিক্ষিত ভদ্রলোকের পুস্তক-পাঠের অবকাশাভাব। এক ভরসা পুর-মহিলাগণ; আমি 'হিমালয়ের' এই তৃতীয় সংস্করণ তাঁহাদিগের পবিত্র করে সমর্পণ করিলাম। নিবেদনমিতি

সন্তোষ—ময়মনসিংহ।
১৩১৭

শ্রীজলধর সেন।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিবরণ।

এত দিনের পর 'হিমালয়ের' দ্বিতীয় সংস্করণ হইল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে প্রথম সংস্করণের সহস্র খণ্ড নিঃশেষিত হইয়াছে, এজন্য আমি ক্ষুব্ধ নহি—ক্ষোভ প্রকাশও নিরর্থক। আমার 'হিমালয়ের' যে দ্বিতীয় সংস্করণ হইল, ইহাতেই আমি বঙ্গ সাহিত্যানুরাগী পাঠক মহোদয়গণের নিকট কৃতজ্ঞ। বাঙ্গলা সাহিত্যের এই উন্নতির যুগেও যখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য-রথিগণের বহুবিধ অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক অর্দ্ধ মূল্যে, নামমাত্র মূল্যে এবং বিনামূল্যেও সংবাদপত্রের ও থিয়েটারের উপহার রূপে প্রদত্ত হইতেছে, তখন সহস্র খণ্ড পূর্ণ মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে, ইহা সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ কি ?

নিজের সন্তান নিতান্ত কুৎসিত হইলেও তাহার বেশভূষার পারিপাট্য সংসাধনে পিতামাতার স্বতঃই ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই আমি এবার 'হিমালয়ের' অঙ্গরাগের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছি। পুস্তকের কাগজ, ছাপা, বাঁধাই যতদূর সাধ্য সুন্দর করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। আর আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আর একটি কাজ করিয়াছি—গ্রন্থারম্ভে আমার পরিব্রাজক অবস্থার একখানি হাফটোন ছবি দিয়াছি। যাঁহাদের নিকট আমি পরিচিত, তাঁহারা এই ছবিখানি দেখিলেই আমার বর্ত্তমান অবনতির চিত্র সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবেন।

বর্ত্তমান সংস্করণে অনেকস্থলে সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছি। এখন পাঠকগণ ইহাকে পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখিলেই আমি কৃতার্থ হইব, নিবেদন মিতি।

কলিকাতা
১ লা জানুয়ারী
১৯০৬।

বিনয়াবনত
শ্রীজলধর সেন।
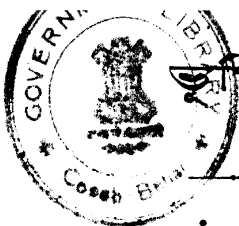
ভূমিকা

পৃথিবীর সকল সভ্যদেশের সাহিত্যেই ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়; দেশভ্রমণ শিক্ষার একটি অঙ্গ; দেশভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না, এমন লোক বোধ করি আমাদের দেশেও এখন একান্ত বিরল।

হয় ত ইহা মনুষ্য-জীবনের একটি স্বাভাবিক বৃত্তি। যাঁহারা কোন রকমে বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া উপার্জ্জনের পন্থায় দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত আফিস করেন, এবং অর্থোপার্জ্জন ব্যতীত অন্য চিন্তার অবসর পান না, তাঁহাদের তৃষিত হৃদয়ও অনতিদীর্ঘ অবকাশ কালে রথচক্র মুখরিত ইষ্টকবদ্ধ রাজপথ এবং অট্টালিকাসঙ্কুল সহরের দূষিত বায়ুপ্রবাহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্ত প্রকৃতির চিরবৈচিত্র্যময় শ্যামলবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বিশ্ব-বিধাতার প্রেমধারা পান করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠেন। কেহ দারজিলিং যান, কেহ শিমলাশৈলে আশ্রয় গ্রহণ করেন, কেহ বা শস্যশ্যামলা নদী-মেখলা পল্লীগ্রামের কুঞ্জ-কুটীরে বসিয়া সুখ অনুভব করেন।

ইউরোপের কথা ছাড়িয়া দিই; সেখানে মানুষের অর্থ, সুযোগ, শক্তি আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক। লাপলাণ্ডের ছয়মাসব্যাপী দীর্ঘরাত্রি ইংরোপীয় পর্য্যটকের চক্ষুর সম্মুখে কেন্দ্রীর উষার বিমল বিভা ব্যক্ত করে; উত্তর মেরুর চিরহিমানীরাশির মধ্যে তাঁহারা সঙ্গীহীন, অবলম্বনশূন্য দীর্ঘ সাধনায় কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করেন;—তাঁহাদের সাহিত্য তাঁহাদের

সুকঠোর মনুষ্যত্বের স্মৃতিচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া জগতের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

আমাদের ক্ষুদ্র বাঙ্গালী জীবনে সে অর্থ, সে সুযোগ, সে শক্তি লাভ করা দুরূহ। জাহাজে চড়িয়া বিদেশগমনে ত সামাজিক অধিকারই নাই, কিন্তু চক্ষু থাকিলে, হৃদয় থাকিলে জাহাজে চড়িয়া বিদেশে না গিয়াও আমাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-স্পৃহা চরিতার্থ হইতে পারে। আমাদের ভারতবর্ষকে ভগবান জগতের শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক শোভা হইতে বঞ্চিত করেন নাই; এক হিমালয়—তাহার নিভৃত হৃদয়ে কত রত্ন নরচক্ষুর অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছে, আমরা কি তাহার কিছু সন্ধান রাখি? শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ, শত শত গিরিশৃঙ্গের মুক্ত শোভা, সহস্র নির্ঝরের অস্ফুট করতান, কত বিচিত্র পুষ্পলতা, কত প্রাচীন স্মৃতি-বিজড়িত সুপবিত্র তীর্থ, এই হিমালয়ের দুর্গমবক্ষে সংগুপ্ত রহিয়াছে। ইউরোপ হইলে এই এক হিমালয়ের সহস্র সহস্র বিভিন্ন মনোরম দৃশ্য অবলম্বন করিয়া বহু পুস্তক বিরচিত হইতে পারিত, কিন্তু আমাদের?—আমাদের একখানিও নাই।

কেন নাই, এ কথার উত্তর অতি সহজ। যেখানে রেল পথ যায় নাই, অনেক স্থানে পথ পর্য্যন্তও নাই; আহার সামগ্রী সেখানে পাওয়া যায় না, শয়নের সুবন্দোবস্তও যে অঞ্চলে নাই, আমাদের ন্যায় শ্রমবিমুখ, বিলাসপ্রিয়, সুখলিপ্সু বঙ্গযুবক সখের খাতিরে সে সকল বিপদসঙ্কুল দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে ভ্রমণ করিতে যাইবেন, ইহা একবারেই অসম্ভব। শিক্ষিত সৌখিন লোকের সে সকল স্থানে গতিবিধি নাই; যে সকল পুণ্যলাভেচ্ছু, মুক্তিপথাবলম্বী সন্ন্যাসী এই সকল দুর্ভেদর্শন স্থানে জীবন বিপন্ন করিয়া পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বোধ করি একজনেরও এ ইচ্ছা বা ক্ষমতা নাই যে, এই পুণ্যময় পার্ব্বত্যভূমির মধুর কাহিনী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের পাঠক সমাজের কৌতুক নিবারণ করেন।

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু বাবু জলধর সেন মহাশয় একবার সংসারসাগরের ঘূর্ণ্যাবর্ত্ত ভেদ করিয়া তাঁহার সংসার-বাস-বর্জ্জিত কর্ম্মহীন জীবন মৃত্যুর মহিমাময় তটে নিক্ষিপ্ত করেন, সংসারের সুখের প্রলোভন ছাড়িয়া শান্তির আশায় তিনি হিমালয়ের বিজন বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা কতদূর পূর্ণ হইয়াছিল সে সংবাদ আমরা রাখি না, কিন্তু তাঁহার সুদীর্ঘ বিরহীজীবন আমাদের বঙ্গভাষার দীনভাণ্ডারে যে মহার্ঘ্য রত্ন দান করিয়াছে তাহা চিরদিন বঙ্গ সাহিত্য সমলঙ্কৃত করিয়া রাখিবে বলিয়া আশা হয়। বিধাতা তাঁহার হৃদয়ের প্রিয়তম সামগ্রী হরণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ের যে তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছিলেন, তাহার করুণ ঝঙ্কার প্রত্যেক বঙ্গীয় পাঠকের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইবে। বঙ্গভাষার সৌভাগ্য, তিনি হৃদয়ে গভীর আঘাত পাইয়া হিমালয়ের অমরকাহিনী বঙ্গ-ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন; এ আঘাতে তাঁহার যতই ক্ষতি হউক বঙ্গ-ভাষার মহোপকার হইয়াছে; পাঠকগণও একটী বিস্ময়পূর্ণ, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অসা-ধারণ দৃশ্যপরম্পরার সহিত পরিচিত হইয়াছেন।—ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে, নাইটিংগেল পক্ষী কণ্টকের উপর বক্ষ স্থাপন না করিয়া কখন গান গাহিতে পারে না, কবিবর শেলীও বলিয়াছেন" Our sweetest songs are those that tell of saddest thought"—তাই বুঝি জলধর বাবুর ভ্রমণ-কাহিনী এত সুমধুর।

জলধরবাবুর ন্যায় স্বভাবভীরু লোক সহজে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহেন না। বর্ত্তমান ভূমিকা-লেখকের সহিত এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ বিষয়ে কিছু সম্বন্ধ আছে। আমি তাঁহার ডাইরীখানি তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া যদি হিমালয় কাহিনী যথানিয়মে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশ না করিতাম, তাহা হইলে তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া বঙ্গভাষায় এ রত্ন প্রকাশ করিতেন কি না এ সম্বন্ধে আমার এবং যাঁহারা জলধরবাবুকে জানেন, তাঁহাদের অনেকেরই সন্দেহ আছে। আজ

স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে এই কাহিনী প্রকাশিত হওয়ায় আমার যত আনন্দ তাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ আর কাহারো সম্ভাবনা আছে কিনা জানি না ; এবং সেই জন্যই আজ অতীতবর্ষের এই কাহিনী স্মরণ করিয়া সে কথার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক বোধ করিলাম না।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

প্রবেশ
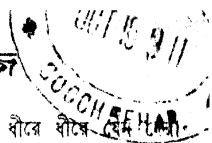
পশ্চিম দেশে ভ্রমণ করতে গিয়ে আমি কেমন ধীরে ধীরে যেন দেরা-তুনের অধিবাসী হোয়ে পড়েছিলুম। দেরাতুনের বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী অধিবাসিগণ তাঁদের স্বাভাব-সুলভ স্নেহের বশবর্ত্তী হোয়ে আমাকে তাঁদের আপনার জন কোরে নিয়েছিলেন। আমিও যেন কেমন হোয়ে গিয়েছিলুম; দু-দশদিনের জন্যে যেখানেই ছুটে যাই না কেন, ক্লান্ত হোলেই দেরাতুনের বন্ধুগণের স্নেহশীতল আশ্রয়ে এসে হাঁফ ছাড়তুম। এই বিদেশে হিমালয়ের ক্রোড়ের মধ্যেও আমাদের ঘর বাড়ী হোয়ে গিয়েছিল। আমি এই সংসারের পাশ ছিন্ন করবার জন্যে লম্বা একদৌড়ে—হিমালয়ের কোলের মধ্যে গিয়েছিলুম; কিন্তু সংসারের আসক্তি আমার পিছনে পিছনে ছুটে এসে এই পাহাড়ের নিভৃত-নেপথ্যদেশেও আমাকে গ্রেপ্তার কোরে-ছিল! এই সব কারণে মধ্যে মধ্যে ভারি একটা দুর্দ্দমনীয় বাসনা হোতো যে, একেবারে পাহাড়ের মধ্যে ডুবে যাই—খুব একটা লম্বা পথে যাত্রা করি;—নিতান্ত পথের সন্ধান না হয়, একেবারে নিরুদ্দেশ-যাত্রাই করা যাক! তাতে কার কি ক্ষতি?

দেশে থাক্‌বার সময় সাধু সন্ন্যাসীর মুখে কেদারনাথ-বদরীনাথের কথা অনেক শুনা গিয়েছিল। কিন্তু কোন দিন স্বপ্নেও সে সব দেশে যাবো, এ কথা মনে উঠে নাই। এখন আমার মধ্যে মধ্যে—সেই সব দেশে যাবার ইচ্ছা হোতো, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে সে কাজটা যে হোয়ে উঠ্‌বে, সে বিষয়ে খুব সন্দেহ হোত। কেদারনাথ-বদরীনাথে যাত্রী অতি কম যায়, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর সংখ্যা ত আরো অল্প, প্রতি বৎসর পাঁচ সাত জনের বেশী হবে না। আমার বদরিকাশ্রমে যাবার জন্যে অত্যন্ত আগ্রহ হোতে লাগ্‌লো, কিন্তু সেবারে সুবিধা কোরে উঠ্‌তে পারলুম না। তার তিন চার বৎসর আগে—

থেকে গবর্ণমেণ্ট যাত্রীদের বদরিকাশ্রম যাওয়া বন্ধ কোরে দিয়েছিলেন। কয় বৎসর গাড়োয়ালরাজ্যে এমন ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েছিল যে, যাত্রীদের পথ ছেড়ে দিলে তারা হয় ত অনাহারে মারা পড়্‌তো। আমি কিন্তু সেই থেকেই বরাবর চেষ্টায় আছি, সুযোগ কোরে উঠ্‌তে পার্‌লেই একবার যাব। তার পরে এক বছর হরিদ্বারের মহাকুম্ভ মেলায় গিয়ে আমার একজন পূর্ব্ব-পরিচিত শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হো'লো। ইনি বাঙ্গালী, বাল্যকাল হতেই ইনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, এখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে-ছেন। বলা বাহুল্য পথে ঘাটে যে রকম সন্ন্যাসী দেখা যায়, ইনি সে প্রকৃতির নন; ইনি প্রকৃতই একজন সাধু ব্যক্তি; আধুনিকভাবে শিক্ষিত, এবং সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ। আমি নানা প্রকার অনুরোধ কোরে তাঁকে হরিদ্বার হোতে দেরাদুন নিয়ে এলুম; কিন্তু তিনি লোকালয়ে আসতে স্বীকার পেলেন না। কাজেই তাঁকে টপকেশ্বরের এক পর্ব্বতগুহায় রেখে বাসায় এলুম। অবকাশমত তাঁর নিকট যাতায়াত কর্‌ত লাগলুম; দুই এক দিন সেই নির্জ্জন পর্ব্বতগহ্বরে বাসও করা গেল এবং এই রকম কোরে আমরা দুজন—একজন সন্ন্যাসী ও একজন গৃহবাসী—পর-স্পরের নিকট অধিকতর পরিচিত হোতে লাগলুম। অবশেষে তাঁর সঙ্গে আমার বদরিকাশ্রমে যাওয়া স্থির হোয়ে গেল। অল্প সময়ের মধ্যেই দেরাদুনস্থ বন্ধুবান্ধবগুলীর মধ্যে এ সংবাদ র[illegible] হালো। আমার সকল হিন্দুস্থানী বন্ধুর ত চক্ষু স্থির! তাঁরা ভাব্‌লেন, তাঁদের ভবিষ্যৎবাণী বুঝি বা সফল হয়।

সন্ন্যাসী মহাশয়কে আমি 'স্বামীজি' বোলে ডাকতুম। তাঁর সঙ্গে আমার যাত্রা করার পরামর্শ স্থির হোয়ে গেলে, আমি যে সত্যই এমন একটা বড় রকম ব্যাপারে প্রবৃত্ত হোচ্চি, আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তা কেউ বিশ্বাস কর্ত্তে রাজী হোলেন না। যদি আমি কথঞ্চিৎ করুণা উদ্রেক অভিপ্রায়ে কান বন্ধুর কাছে মুখ ভার কোরে বলি, "ভায়া হে ছেড়ে ত, চল্লুম, একেবারে ভুলো না।"

অমনি দুই বিন্দু অশ্রু এবং একটা দীর্ঘনিশ্বাসের পরিবর্তে একমুখ হাসি আমাকে বিব্রত ও অপ্রস্তুত কোরে ফেল্‌তো; বিদ্রূপের স্বরে তাঁরা বোল্‌তেন, "তুমি যাবে?—তীর্থভ্রমণে! দেখলেও ত বিশ্বাস হয় না।" বাস্তবিক আমার মত শ্রমকাতর মনুষ্য যে বহুকষ্ট স্বীকার কোরে পদব্রজে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঘুরে বেড়াবে, একথা তাঁরা কি কোরে সহজে বিশ্বাস করেন? আমারই এক এক সময় মনে হোতে লাগলো, এই সমস্ত পাহাড় পর্ব্বতের মধ্যে এত দীর্ঘ পথ হাঁটা কি আমার পক্ষে সহজ হবে? সামান্য দূরে ক্ষুদ্র এক চড়াইয়ে উঠ্‌তে হোলেই আমার ডাণ্ডীর দরকার হয়—আর আমি কি কোরে এত পথ অতিক্রম কোর্‌বো? আর পথে বিপদ সম্ভাবনাও ত কম নয়!

কিন্তু নানাজনের নানাকথার মধ্যে পোড়ে আমার ভ্রমণেচ্ছা ক্রমেই দৃঢ় হোতে লাগ্‌লো,—যতই চারিদিক্ থেকে পথের ভীষণতা সম্বন্ধে কথা শুনতে লাগ্‌লুম, ততই আমার যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হোতে লাগ্‌লো,—শেষে যাত্রা কর্‌বার দিন পর্য্যন্ত স্থির হোয়ে গেল। তখন আমার বন্ধুদের পরিহাস ও বিদ্রূপ আর কোথায়,—বিদায়ের অশ্রুতে সব ভেসে গেল। সকলের মনে হোলো, এই হয়ত শেষ দেখা। আর কি ফিরে আস্‌তে পার্‌বো? এখান থেকে আমার দৈনিক লিপি উদ্ধৃত করি।

৫ই মে, ১৮৯০; মঙ্গলবার।—আগামী কাল অতি প্রত্যূষে আমার যাত্রা কর্‌বার দিন। বন্ধুবান্ধব সকলেই খুব বিষণ্ণ, বিমর্ষ, যেন আমি চিরদিনের জন্যে সকলের স্নেহবন্ধন ছিঁড়ে চোলে যাচ্চি। পাড়ার বাঙ্গালী স্ত্রী-পুরুষ সকলেই কাতরতা প্রকাশ কর্ত্তে লাগ্‌লেন, বন্ধুবান্ধবেরা আপনার আপনার নাম লেখা পোষ্টকার্ড আমার গানের বইয়ের ভিতর রেখে দিলেন। সমস্ত দিন এই ভাবে কেটে গেল। দেরাদুনে এমনও দুই একজন লোক ছিলেন, যাঁরা আমার উপর অনেক বিষয়ে খুব বেশী রকম নির্ভর করেন; মনে মনে অখিল-নির্ভরের উপর তাঁদের ভার সমর্পণ কর্‌লুম। রাত্রে আর নিদ্রা হোলো না। সামান্য কোথাও যেতে হোলেই নানা উৎকণ্ঠায় রাত্রে নিদ্রা

হয় না, আর এ ত আমার সুদীর্ঘকালের জন্যে যাত্রা। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ও নানা কাজে সমস্ত রাত্রি কেটে গেল। আয়োজনের জন্যে কিছু ব্যস্ত হোতে হোলো না; দীনের বেশে বের হবো, তার আয়োজন কি কোরবো?

৬ই মে, বুধবার।—আজ রাত্রি সাড়ে চারটার সময় দেশত্যাগের বন্দোবস্ত; তৎপূর্ব্বেই বন্ধুবর্গ বিদায়ের জন্যে সমবেত হোলেন। জ্যোৎস্নারাত্রি, সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, নিসুপ্ত। আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তনে পৃথিবীর ধারা কি পরিবর্ত্তিত হয়? সকলকে ছেড়ে চল্লুম, আত্মীয় বন্ধুবর্গ অনেক দূর পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এলেন; তাঁদের এই দীর্ঘকালের স্নেহবন্ধন ছিন্ন করা সবিশেষ কষ্টকর বোলে মনে হোতে লাগ্‌লো। তাঁদের আর বেশী দূর অগ্রসর না হোতে অনুরোধ কল্লুম, শেষে তাঁরা অনিচ্ছাসত্ত্বেই ফিরলেন। আমিও ফিরে ফিরে অনেকক্ষণ ধোরে তাঁদের চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। আমার মনে হোলো, এতেই এত কষ্ট, আর নিতান্ত আপনার লোকের কাছ থেকে এ রকম বিদায় নেওয়া না জানি আরো কত কষ্টকর! দিনকতক আগে Pilgrim's Progress পড়েছিলুম, তারই একটা ছবির কথা আমার বারবার মনে আস্‌তে লাগলো। নানা চিন্তার মধ্যে অগ্রসর হোতে লাগ্‌লুম।

সূর্য্যোদয় হোলো। আমরা হৃষীকেশের পথে আস্‌তে লাগ্‌লুম,—এ আর একটা পথ, এ পথেও লোকজনের সংখ্যা বড় অল্প। পাহাড় ও জঙ্গল অতিক্রম কোরে বেলা ১১টার সময় 'খানু' নামে একটা ছোট গ্রামে উপস্থিত হোলুম। গাছপালায় ঢাকা পাঁচ সাত ঘর গৃহস্থের বাড়ী নিয়ে এই গ্রামখানি শাখাপত্রসমাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র বিহঙ্গনীড়ের ন্যায় স্নিগ্ধ ও শান্তিপূর্ণ। এই গ্রামের পাশ দিয়ে একটা ছোট ঝরণা চলে যাচ্ছে; আমরা সেই ঝরণার ধারে একটা গাছের তলায় আশ্রয় নিলুম; ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অধীর হোয়েছিলুম, প্রাণভরে ঝরণার জল পান করা গেল। তারপর সেই বৃক্ষতলেই আহারাদি শেষ কোরে অপরাহ্ণ ৫টার সময় আবার যাত্রা আরম্ভ কল্লুম। গ্রাম যখন

ছাড়িয়ে গেছি—তখন দেখলুম দুজন সন্ন্যাসী আমাদের আগে আগে যাচ্ছে। ভাবলুম আমরাও দুজন আছি, এ দুজন সাধু ব্যক্তির সঙ্গ লওয়া যাক্ না; কিছুদূর একসঙ্গেই চারজনে যাওয়া যাবে সেই দুজন সাধুকে ধরবার জন্যে আমরা একটু তাড়াতাড়ি চলতে লাগলুম; কিন্তু সন্ন্যাসীদ্বয়ের কাছে গিয়ে আমার হাসিও এলো, রাগও হোলো; দেখি একজন আমারই বাসার চাকর; চুরী অপরাধে আজ ২০।২৫ দিন পূর্ব্বে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। আজ তাকে যে রকম জাঁকাল সন্ন্যাসীর বেশে দেখলুম এবং যে রকম উৎসাহের সঙ্গে সে ঘন ঘন "হর হর বম্ বম্" করচে, তাতে কার সাধ্য তাকে চোর বলে! তবে তার নিতান্তই গ্রহবৈগুণ্য যে আজ আমার সম্মুখে পড়ে গেছে। আমি 'স্বামীজি'কে সমস্ত কথা খুলে বল্লুম; তিনি বল্লেন "হয় ত ওর সঙ্গীর ঝুলিতে কিছু অর্থ আছে, তাই আত্মসাৎ করবার জন্যে বেটা এ রকম ভেক ধরেছে।" গৈরিক বসন ও জটা কমণ্ডলুর মধ্যে এই রকম কত চুরী ডাকাতি ও নরহত্যা ছদ্মবেশে দ্বিতীয় সুযোগের প্রতীক্ষা করছে তার আর সংখ্যা নাই। আমার এই ভ্রমণবিবরণে পাঠকের এ রকম অনেক সাধুদর্শন ঘট্‌বে। আমার চাকর বাবাজী হয়ত প্রথমে মনে করেছিল, আমি তার এই নূতন ভোল দেখে তাকে চিন্‌তে পারবো না, তাই তার পশ্চিমে বুদ্ধির দ্বারা আমার বাঙ্গালী বুদ্ধির পরিমাণ স্থির কোরে নিশ্চিন্ত ছিল! তাই আমাদের দেখে আরো জোরে জোরে 'বম্ বম্' কোর্ত্তে লাগ্‌লো; —এ ভণ্ডামী আমার নিতান্তই অসহ্য হোয়ে উঠ্‌লো, আমি একটু হেসে বল্লুম "আরে লৌণ্ডে, কব্‌সে চোরী ছোড়্‌কে সাধু বন্ গিয়া?"—আমার কথা শুনে বাবাজীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হোলো। সে একটা কথাও বল্‌তে পার্‌লে না। তখন তার সেই বিশ্বস্তচিত্ত সঙ্গী সাধুটীকে সমস্ত বল্লুম; সে বেচারী নিতান্ত ভালমানুষ, এই অল্পবয়সী, জোয়ান ছোক্‌রা তার চেলা হোতে স্বীকার করায় সে তাকে সঙ্গী করেছে; একটু আধটু ধর্ম্মোপদেশ দেয়, আর বেশ ভাল ক'রে খাওয়ায় দাওয়ায়। আমি বল্লুম "সাধু, তুমি

ওকে রাখ, খেতে দেও, তাতে আমার আপত্তি নেই; কিন্তু যদি তোমার ঝুলিতে কিছু টাকাকড়ি থাকে ত তা সাবধান কোরে রেখো। দশ বারো দিনে যে এমন সাধু হতে পারে, দু পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আবার তার নরঘাতক দস্যু হওয়ারও আটক নেই।"—পরে জেনেছিলুম, সাধু আমার এই অযাচিত উপদেশ গ্রহণ কোরেছিল।

সন্ধ্যার সময় আমরা 'ভোগপুরে' উপস্থিত হলুম। এ গ্রামে অনেকগুলি লোকের বাস। দু-চারটে ছোট কোটাঘর দেখে বুঝলুম, এখানে ধনীও দু-পাঁচ ঘর আছে; অবিলম্বে তার প্রমাণও পাওয়া গেল। এ অঞ্চলে যে গ্রামে দু-পাঁচজন বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাস সেইখানেই গ্রামের লোকের ব্যয়ে ও যত্নে এক একটা ধর্ম্মশালা থাকে; বিদেশী সাধু অতিথি সেখানে আশ্রয় পায়; গ্রামের লোকে যথাসাধ্য আহার সামগ্রী দিয়ে যায়। তবে গ্রামে দোকান থাকলে, কি পথিকের হাতে পয়সা থাকলে তাদের ধর্ম্মশালায় আশ্রয় নেবার বড় দরকার হয় না। বাঙ্গালা দেশে ধর্ম্মশালার মত জিনিসের অভাব বড় বেশী। নানা বিষয়ে আমরা ভারতের অন্যান্য দেশের লোক অপেক্ষা উন্নত ও সভ্য, কিন্তু পথিক বা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি পথপ্রান্তে প্রাণত্যাগ কল্লেও তাদের দিকে ফিরে তাকাবার আমাদের অবসর নেই; এতই আমরা কাজে ব্যস্ত! তবে আমাদের মধ্যেও দু-পাঁচজন এ দলের বাইরে আছেন, এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে। কিন্তু আমার যেন মনে হয়, পরোপকার, কি বিপন্নকে আশ্রয় দান এবং অতিথি-সৎকার প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোক অপেক্ষা অশিক্ষিত গাড়োয়ালী কৃষকের হৃদয়ের উচ্চতা অনেক বেশী।—ভোগপুরের ধর্ম্মশালায় রাত্রিবাস করা গেল, আহারাদির কিন্তু বেশী দরকার হোলো না; পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হয়েছিলুম, শয়নমাত্রেই নিদ্রা!

৭ই মে, বৃহস্পতিবার।—প্রত্যূষে উঠে আবার যাত্রা। এবার সেই পূর্ব্ব পরিচিত হৃষীকেশের জঙ্গলে প্রবেশ করা গেল; জঙ্গল পরিচিত হোতে

পারে কিন্তু রাস্তা সম্পূর্ণ অপরিচিত ; পূর্ব্বে যে রাস্তায় এসেছিলুম, এবারও সেই রাস্তায় যাচ্ছি কিনা বুঝতে পাল্লুম না। বেলা ১ টার সময় হৃষীকেশে পৌছলুম! বৃক্ষতলে বিশ্রাম করা গেল, আহারাদি কিছুই হোলো না! অপরাহ্নে রৌদ্রের তেজ কম্‌লে যাত্রা কোরে লছমন-ঝোলায় উপস্থিত হতে সন্ধ্যা হয়ে গেল! লছমন-ঝোলায় গঙ্গার উপর যে ক'খানা দোকান ঘর ছিল, দেখলুম তা যাত্রীর দলে পূর্ণ; সেই দিন এখানে একদল উদাসী সন্ন্যাসী এসেছে। এরা শিখ; গুরু নানক একেশ্বরবাদ প্রচার করেছিলেন; কিন্তু এরা এখন পৌত্তলিক। ইহারা হিন্দুর সমস্ত তীর্থই পর্যটন কোরে থাকে এবং নানকের লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থ পূজা করে; এরা সেই পুস্তককে 'গ্রন্থ সাহেব' বলে। এই দলে প্রায় ২০০ লোক। এদের কথা পরে বোল্‌ব।

পশ্চিম দেশে যাওয়ার আগে আমি প্রায়ই পদ্মানদীর ওপারে আমার কোন বন্ধুর বাড়া সর্ব্বদা যাতায়াত করতুম। সেখানকার এক ব্রাহ্মণ ঠাকুর একবার বদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন; কিন্তু আমাদের মত ইংরেজী-পড়া কতকগুলি ছেলের বিশ্বাস ছিল, ঠাকুর হরিদ্বার পর্য্যন্তও যান্‌নি; যা হোক দেশের লোকে গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন যায়, সুতরাং সে সব যায়গার গল্প আমরা সর্ব্বদা শুনতে পেতুম; কিন্তু বদরিকাশ্রমে দেশের লোক বড় একটা যায় না, কাজেই সেখানকার কাহিনী সম্বন্ধে বামুন ঠাকুরই প্রধান 'অথরিটী' ছিলেন। তিনি অনেকগুলি আজগুবি গল্প করেছিলেন, তার মধ্যে তাঁর লছমন-ঝোলার গল্প আমার বেশী মনে ছিল, এবং তৎসম্বন্ধীয় একটা ভয়াবহ ভাব ছেলেবেলা হোতে একেবারে রক্তের সঙ্গে মিশেছিল। আমি যে গ্রামের কথা বল্‌ছি, সেখানে একটা জায়গায় প্রতি বৎসর বর্ষার সময় কাদায় জলে মিশে একটা নরক কুণ্ড হোয়ে থাক্‌ত; এবং সেখান থেকে উদ্ধারলাভের জন্যে গ্রামের লোক একটা বাঁশের সাঁকো প্রস্তুত রাখ্‌ত, সে সাঁকোর 'আইডিয়া' সহরের লোককে দেওয়া শক্ত। কাদার মধ্যে

দু'খানা বাঁশ পুঁতে তার উপরে একটা বাঁশ ফেলে খানিক উপরে আর একটা বাঁশ বেঁধে দেওয়া হোতো ; সকলকে সেই নীচের বাঁশে পা দিয়ে উপরের বাঁশ ধোরে ধীরে ধীরে সেই কর্দ্দমাক্ত স্থান পার হোতে হোত। হঠাং হাত কি পা ফস্‌কে গেলে সেই মহাপঙ্কে একেবারে নিমজ্জন ছাড়া অন্য গতি ছিল না ! লছমন-ঝোলার গল্প শুনে অবধি, আমরা এই অপরূপ সাঁকোর নাম রেখেছিলুম, লছমন্-ঝোলা ! তখন কি একবার স্বপ্নেও ভেবেছিলুম আসল 'লছমন-ঝোলা'ও আমাকে পার হোতে হবে ?

কিন্তু এখন যাঁরা লছমন-ঝোলা দেখ্‌বেন, তাঁরা পূর্ব্বে লছমন-ঝোলা কি রকম ছিল, তা বুঝ্‌তে পার্‌বেন না। অতএব সে কালের ঝোলার একটু সংক্ষেপ বিবরণ দিচ্ছি।

প্রথমে একটা দড়ির সিঁড়ি প্রস্তুত কোরতে হয় ; খুব মোটা দু'গাছা দড়ি সমান্তরাল ভাবে বসিয়ে তার মাঝে মাঝে সিঁড়িতে যেমন পা দেওয়ার জন্যে কাঠ থাকে, তেমনি ছোট ছোট শক্ত কাঠ বেশ ভাল কোরে বেঁধে সেই দড়ির সিঁড়িগাছটা দুই পারে বেশ কোরে আটকাইয়া দেয়। তার উপরে পা দিয়ে পার হোতে হয় এবং হাতে ধরবার জন্য নীচে যেমন, উপরেও সেই রকম দুটো শক্ত রশি এপার হোতে ওপারে বেঁধে দেয়। সেই রশি দুটো দুই কুক্ষির মধ্যে দিয়ে দু'হাতে ধোরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হোতে হয় ! এখন একবার মনে করুন, ব্যাপারটা কি ভয়ানক ! দুই কুক্ষির মধ্যে দুই রশি আর পা সেই রশিনির্ম্মিত সিঁড়ির উপর ; পায়ের তলায় চার পাঁচশো হাত নীচে ভয়ানক বেগবতী গঙ্গা ! একবার কোন রকমে পা পিছ্‌লে গেলে আর রক্ষা নেই ! প্রথমে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ বেশ ঝুল্‌তে পারা যায় বটে, কিন্তু পা আবার যথাস্থানে স্থাপন করা অতি কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে ! আরো এক ভয়ানক কথা এই যে, এই রকম ঝোলার উপর দিয়ে একটু গেলেই পা এমন ভয়ানক দোলে যে, হাত পা ঠিক রাখা দুরূহ হোয়ে পড়ে। প্রতিক্ষণেই মনে হয়, এইবারই হয়ত পোড়ে যাবো। লছমন-ঝোলা

পার হওয়া এই জন্যেই ভয়ানক ছিল। এই ঝোলা পার হোতে গিয়ে কত যাত্রী যে মারা গেছে তার সংখ্যা নেই। সেই জন্যেই সে কালের লোক লছমন-ঝোলা পার হোলেই নারায়ণ দর্শনের আশা করতো। সেকালে বদরিনারায়ণের পথে আরো চার পাঁচটা ঝোলা ছিল বটে, কিন্তু সেগুলি অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট ; এই এক লছমন-ঝোলার ভয়েই অনেক লোক সে পথে যেতে পার্‌তো না ; এখন চেতলার পুলের মত সর্ব্বত্র টানা পুল হয়েছে। লছমন-ঝোলার বর্ত্তমান পুলটি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী রায় সুরজমল ঝুনঝুনি-ওয়ালা বাহাদুর বহু অর্থব্যয়ে প্রস্তুত করিয়ে দেছেন। এ পুল পার হোতে পয়সা দিতে হয় না। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এই পুল প্রথম খোলা হয় ; তাহার পর হোতেই বদরিনারায়ণের (বদরিকাশ্রমের) যাত্রীর সংখ্যা অনেক বেশী হয়েছে।

সত্য কথা বল্‌তে কি, 'লছমন-ঝোলা' সম্বন্ধে ছেলে বেলা থেকে মনে মনে যে ভয়াবহ ভাব পোষণ কোরে রেখেছিলুম, লছমন-ঝোলায় উপস্থিত হোয়ে তার কিছুই না দেখে খানিকটে নিরাশ হোয়ে পড়লুম। এখন দু'বছরের ছেলেরা পর্য্যন্ত মনের আনন্দে খেলা কর্‌তে কর্‌তে ঝোলা পার হোতে পারে। পূর্ব্ববিভীষিকা মনে করিয়ে দেবারও কিছু দেখা গেল না। কেবল দেখ্‌লুম, এপারে দু'খানি ওপারে দু'খানি, জীর্ণ কাষ্ঠ খণ্ড দাঁড়িয়ে তাদের অতীত গৌরবের সাক্ষী দিচ্চে।

দোকানগুলি সব দখল হোয়ে গেছে দেখে আমরা লছমন-ঝোলা পার হোয়ে অপর পারে বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ কল্লুম। পূর্ব্বকথিত দোকানঘরে সাধুর দলের সকলের স্থান সংকুলান না হওয়ায় তাঁদেরও অনেকে এই সমস্ত বৃক্ষতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন! কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি—প্রথম কয়েক ঘণ্টা অন্ধকার ; ধুনীর আলোতে অন্ধকার আরও গভীর হোতে লাগ্‌লো। আমরা অন্ধকারের মধ্যেই বালির উপর কম্বল বিছিয়ে বসলুম এবং অন্ধকারেই দু'চারখানা রুটী তৈয়েরী কোরে ধুনীর আগুনে সেকে একটু গুড় দিয়ে আহার

কল্লুম। সমস্ত দিন অনাহার ও পথশ্রমের পর এই আহার এবং অন্ধকার নদী সৈকতে বালুকার উপর এই কম্বলশয্যা খুব শান্তিদায়ক হোলো। আমার বোধ হোলো, আমরা সংসারে নানা রকম বিলাসিতার মধ্যে জোর কোরে নূতন নূতন অভাবের সৃষ্টি কোরে নিই; তাই সংসারে আমাদের এত দুঃখ কষ্ট, পদে পদে ভগ্ন-মনোরথের ক্লেশ, ও নৈরাশ্যের যন্ত্রণা। যাহোক সে রাত্রে যে রকম শান্তি উপভোগ করতে পাব ঠিক্ করেছিলুম, আমার অদৃষ্টে তা ঘটে নি। শয়নের প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে আমি আমার ডান হাতের আঙ্গুলে এক ভয়ানক দংশন-যাতনা অনুভব কল্লুম। সর্পাঘাত কি রকম জানিনে, কিন্তু আমাকে যে জীবে কামড়েছিল, তার যন্ত্রণা কখন ভুল্‌ব না! অনেকে কথায় কথায় সহস্র বৃশ্চিক-দংশনের কথা পেড়ে থাকেন, আমার আজিকার এ দংশন যদি বৃশ্চিক-দংশন হয়, তবে আমি নিঃসন্দেহে বোল্‌তে পারি এই একটাই যথেষ্ট, 'সহস্র' দূরে থাক, দুটিরও দরকার হয় না। বেদনার জ্বালায় আমি চীৎকার কোরে উঠ্‌লুম; সঙ্গী 'স্বামীজি' হাতের উপর দু তিন জায়গায় দৃঢ় কোরে বাঁধন দিলেন, কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তীব্র বিষ সর্ব্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত কোরে ফেলেছিল; আমার সর্ব্ব শরীর অবশ হোয়ে গেল, নড়বার পর্যন্ত শক্তি রইল না; আর যাতনায় গভীর আর্ত্তনাদ কর্ত্তে লাগলুম। দুই চারজন নিকটস্থ সন্ন্যাসী এসে অনেক ঝাড়্‌তে লাগলেন, কিন্তু কিছুমাত্র ফল হোলো না। আমার সঙ্গী স্বামীজি বড়ই কাতর হোয়ে পড়লেন, তিনি আমাকে মার মত কোলে কোরে বসলেন, কিন্তু কি কোরবেন কিছুই স্থির কর্ত্তে পারেন না।

এই রকমে প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল; যাতনা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এমন সময় বুঝি আমাকে রক্ষা করবার জন্যেই ভগবান একজন সন্ন্যাসীকে লছমন-ঝোলা পার কোরে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি একটু আগে লছমন-ঝোলায় পৌঁছিয়েছিলেন। দু একজন সাধুর মুখে আমার এই রকম ভয়ানক দংশন-যাতনার কথা শুনে তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে উপস্থিত

হোলেন। তিনি আমাকে যে উপায়ে আরোগ্য কল্লেন, তা অতি আশ্চর্য্য। আমার যে অঙ্গুলি দষ্ট হোয়েছিল সন্ন্যাসী সেই অঙ্গুলি মুখের মধ্যে দিয়ে দষ্টস্থান একটু কামড়িয়ে ধর্‌লেন, বোধ হোলো আমার শরীরের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটছে। শরীরে যন্ত্রণা আছে তা বুঝছি, কিন্তু আর যন্ত্রণা অনুভব করতে পাল্লুম না। সন্ন্যাসী অল্প একটু কামড়িয়ে আঙ্গুল ছেড়ে দিলেন। ক্লোরোফর্ম্ম করলে শরীর যেমন ধীরে ধীরে অবসন্ন হোয়ে পড়ে আমিও পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে সেই রকম অচেতন হোয়ে পড়লুম। প্রাতঃকালে সাধুর দলের যাত্রার আয়োজনের গোলমালে নিদ্রাভঙ্গ হোলো। দেখলুম, আমি স্বামীজির কোলের মধ্যেই রয়েছি; তিনি আমাকে কোলে নিয়ে সমস্তরাত্রি কাটিয়েছেন। বিদেশে পথপ্রান্তে এই রকম বিপন্ন অবস্থাতে একজন সন্ন্যাসীর নিকট যে মাতার স্নেহ ও প্রিয়তমার যত্ন পাওয়া যেতে পারে, একথা আমার নিতান্ত অসম্ভব বোলে মনে হোতো; কিন্তু এ সংসারে, গৃহহীন পথিকের জন্যেও ভগবানের প্রেম স্বর্গ হোতে মানবহৃদয়ে নেমে আসে। কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হোলো।

৮ই মে শুক্রবার,—শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত, তবু সকালে উঠে রওনা হওয়া গেল। বার মাইল গিয়ে আর চলবার ক্ষমতা রইল না, তাই 'ফুলবাড়ী' চটিতে সমস্ত দিন কাটান গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে রওনা হোয়ে ছয় মাইল, রাস্তা চোলে সন্ধ্যার সময় 'বাগড়া' চটিতে পৌঁছিলুম। উলুবেড়ে হোতে উড়িষ্যার পথের ধারে যেমন সুন্দর সুন্দর চটি আছে, তাদের সঙ্গে তুলনায় এ সমস্ত চটি কিছুই নয়; বিশেষতঃ গত তিন চার বৎসর গবর্ণমেণ্টের আদেশে বদরিকাশ্রমে যাত্রী যাওয়া বন্ধ থাকায় সেই সমস্ত পাতার কুটীর একেবারে ভেঙ্গে গেছে। এবৎসরও যাত্রী যাওয়া বন্ধ থাক্‌বার কথা ছিল, কিন্তু কুম্ভমেলা উপলক্ষে হরিদ্বারে বহু যাত্রীর সমাগম হওয়ায় অল্প কয়েক দিন হোলো যাত্রী যাওয়ার হুকুম হোয়েছে; কিন্তু ভগ্ন চটিগুলি মেরামত হোয়ে উঠেনি এবং তাতে আজও দোকান বসেনি। আমরা দ্বিতীয় যাত্রী

দল, আমাদের পূর্ব্বে একদল মাত্র যাত্রী গিয়েছে। 'বাগড়ী'-চটিতে পৌঁছে দেখি সেই পূর্ব্বদিনের উদাসী সাধুর দল সেখানে সে দিনের জন্যে আড্ডা গেড়েছেন। একখানি মাত্র পাতার ঘর প্রস্তুত হোয়েছে, আর তাতেই সামান্য জিনিস পত্রের দোকান বোসেছে। বলা বাহুল্য, সে দোকানে যা কিছু জিনিস ছিল তা সেই দুইশত সাধুর পক্ষেই নিতান্ত অল্প সুতরাং আমরা দেখলুম দোকানদারের কাছে আর ক্রয়োপযোগী কোন জিনিসই নেই।

এখানে এই সাধু-দলের একটু পরিচয় দিই। এদের বড় বড় দল আছে এবং একজন দলপতি আছেন। তাঁর আদেশানুসারে দলস্থ লোক ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হোয়ে নানা স্থানের তীর্থপর্যটনে বাহির হয়। কাশীতে, নর্ম্মদাতীরে এবং অমৃতসরে ও আরো অনেক স্থানে এই সাধুদের অনেক বড় বড় মঠ আছে; মঠের অগাধ সম্পত্তি, হাতী ঘোড়া প্রভৃতিও অনেক। যে দলের সঙ্গে আজ আমাদের দেখা হোলো, তাদের মধ্যে এক-জনকে প্রধান কোরে এরা ভ্রমণে বাহির হয়েছে। এদের সঙ্গে অনেক লোকজন আছে, বড় বড় পিতলের হাঁড়ি প্রভৃতিও সঙ্গে দেখলুম; এরা যেখানে উপস্থিত হয় সে সময় সেখানে অন্যান্য যে সমস্ত লোক থাকে তাদের সকলকেই সযত্নে আহার করায়, এমন কি বাইরের লোকের খাওয়া না হোলে এরা জলস্পর্শ করে না। এদের কোন রকম বদ্‌খেয়াল দেখলুম না, সকলেই সন্ন্যাসী এবং সকলেরই মাথায় বেণী ভাঙ্গান চুল। এরা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, সঙ্গে 'গ্রন্থ সাহেব' আছেন; তাঁর রীতিমত পূজা আরতি ও স্তব পাঠ হয়; তা ছাড়া এরা বিশেষ কোন ধর্ম্মালোচনায় যে সময়ক্ষেপ করে তা নয়; দু একজন ধর্ম্মপিপাসু সাধু ব্যক্তি আছেন; কিন্তু এদের অধিকাংশ লোকই খুব আমোদপ্রিয়; এমন কি, দেখলুম দুই তিন দল তাস ও দাবা খেলা আরম্ভ কোরে দিয়েছে।

আমরা এদের কাছে আসিবামাত্র এরা খুব যত্নের সঙ্গে আমাদের অভ্যর্থনা কোল্লে; কোন রকমে আতিথ্য সংকারও সম্পন্ন হোলো। তার

পর সেই অনাবৃত আকাশতলে—প্রকৃতির রত্নখচিত নীল চন্দ্রাতপের নীচে শয়ন করা গেল। এদের একজন আমাকে বাঙ্গালী দেখে বাঙ্গলা ভাষায় আমার সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে লাগলেন; তাঁর বয়স এখনও ত্রিশ হয় নি। অতি বিনয়ী, শাস্ত্রজ্ঞানও বেশ আছে বোলে বোধ হোলো। ইনি বাঙ্গালী, কিন্তু বাড়ী কোথায় তা প্রকাশ কোল্লেন না, তবে জানতে পাল্লুম এগার বৎসর বয়সের সময় ইনি এই সাধুর দলে প্রবেশ করেছেন, এবং এই দলের মধ্যে থেকেই শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে খানিক বাঙ্গলা ভাষায় খানিক হিন্দীতে কথাবার্ত্তা হোলো। শাস্ত্রসম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক হোলো, কিন্তু শেষে তর্কের যে রকম মীমাংসা চিরকাল হোয়ে থাকে তাই হোলো অর্থাৎ কোন মীমাংসাই হোলো না; তবে বুঝ্লুম লোকটি প্রকৃতই ধর্ম্মপিপাসু। বেশ আনন্দে রাত্রি কেটে গেল। শেষ রাত্রে জেগে দেখি, গায়ের উপর ঝুপঝাপ কোরে বৃষ্টি পড়ছে, আর খোলা মাঠে শোঁ শোঁ কো'রে বাতাসের শব্দ; কিন্তু তখন আর কি উপায় করা যাবে; কম্বল মুড়ি দেওয়া গেল। এই সমস্ত কষ্ট ও অসুবিধা স্বীকারে প্রস্তুত হয়েই ত এ যাত্রা বাহির হোয়েছি।

৯ই মে, শনিবার—সকালে সম্মুখেই একটা প্রকাণ্ড চড়াই দেখলুম। ক্রমাগত ছ' মাইল উপরে উঠতে হোলো। দিনকতক আগে আধমাইল উপরে উঠতে গেলেই গলদ্‌ঘর্ম্ম হোয়ে পড়তুম, কিন্তু আজ দৃঢ়চিত্তে ছয় মাইল উঠলুম। বেলা প্রায় এগারটার সময় আমাদের চড়াই শেষ হোয়ে গেল। এই ছ' মাইলের মধ্যে একটাও চটি নেই; স্থানে স্থানে পর্ব্বতের গায়ে দু একখানি ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর, দু' এক গৃহস্থ শান্তভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ কোচ্ছে। ছয় মাইল উঠে তার পরে আবার চার মাইল নামতে হোলো। উঠবার সময় মনে হোয়েছিল নামা সহজ; কিন্তু নামবার সময়ও দেখা গেল, কষ্ট বড় কম নয়। যা হোক্, অনেক কষ্টে নেমে একটা চটিতে উপস্থিত হোলুম। একখানা ঘর, আর তাতে সেই

২০০ সাধু। দোকানে যা কিছু খাবার জিনিসপত্র ছিল, তা তারাই আত্মসাৎ কোরেছে। দুপ্রহর রৌদ্রে একটু ছায়া পর্য্যন্তও মিললো না; যে তিন চারটে বড় গাছ ছিল, তার তলাতেও সাধুরা আড্ডা ফেলেছে। রৌদ্রের মধ্যে কিছুক্ষণ কষ্ট পেয়ে শেষে সেখান হোতে বাহির হোলুম। আমরা সংকল্প কল্লুম যে, এ রকম কোরে চোল্‌বো যে, হয় এই সাধুদলের আগে থাক্‌বো, না হয় খানিক প্যাছে থাক্‌বো; সঙ্গে সঙ্গে আর যাচ্ছিনে। এদের সঙ্গে এক চটিতে বাস, আর অনাহার ও রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করা একই কথা। তাই সে দিন কষ্টের পরে রৌদ্রের মধ্যে আবার হাঁটতে লাগলুম। কিন্তু এ দিন যে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম, তা বোল্‌তে পারি নে। অল্প একটু যেতে না যেতেই ভয়ানক মেঘ ও ঝড় উঠ্‌লো। বোধ হোলো পাহাড়ের গা হোতে আমাদের উড়িয়ে ফেলে দেয় আর কি! সৌভাগ্যের বিষয় বৃষ্টি হোলো না। সেই বৃষ্টিহীন ঝড়ের মধ্যে 'মহাদেবচটি'তে এসে উপস্থিত হোলুম। এখানে একজন বৃদ্ধ বাঙ্গালী বোসেছিল; সে বড়ই দরিদ্র। আমরা তাকে পেয়ে যত দূর সুখী না হই, সে আমাদের পেয়ে ততোধিক সুখী হোলো। সমস্ত দিন কষ্টের পর সন্ধ্যার সময় আশ্রয় পাওয়া গেল। আশ্রয় স্থান কেউ মনে কোরবেন না, বেশ চারিদিকে আঁটা সুন্দর ঘর; এ ঘর বটে, কিন্তু গাছের পাতাশুদ্ধ ডাল দিয়ে ছাওয়া, চারিদিকে দেওয়াল কি বেড়া কিছুই নেই। দোকানদার তারই একপাশে যেখানে তার দোকান সাজিয়ে রেখেছে, সেইখানটুক একটু শক্ত কোরে ঘিরে নিয়েছে। দোকানে ১৫।১৬ সের আটা, ৩।৪ সের ঘি, লবণ, লঙ্কা আর কড়াইয়ের ডাল। এমন কি, তার দোকানে খানিকটে গুড় পর্য্যন্ত বিক্রি হয়! কিন্তু এ সমস্ত জিনিস শুধু ১০।১৫ জন সাধুর খোরাক; তবে দোকানদার ভরসা দিলে, শীঘ্রই সে বড় রকম দোকান খুল্‌বে।

যাহোক্‌ দোকানদারের সঙ্গে পরিচয় হোলো; সে আমার একটি

পুত্রের পিতা। আমার পরিচয় পেয়ে সে আমাদের একটু বেশী খাতির কোল্লে, এমন কি তার নিজের খাবার জন্যে সঞ্চিত দইটুকু পর্য্যন্ত এনে আমাদের দিলে! অন্য সময় হোলে আমরা সে দই স্পর্শ কত্তুম কি না সন্দেহ, কিন্তু সে দিন পশ্চিমের প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন অপেক্ষা সেই দইটুকু আমাদের নিকট বহুমূল্য বোলে বোধ হোলো। রাত্রে সেই বৃদ্ধ বাঙ্গালী প্রবাসী মনের আনন্দে গান কোল্লে; বহুদিন পরে বৃদ্ধের মুখে—

"আয় মা সাধন সমরে, দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।"

গান শুনে বড়ই আনন্দ বোধ হোলো; আমিও দুর্ব্বল কণ্ঠে প্রাণ খুলে কবিবর রবীন্দ্রনাথের প্রাণস্পর্শী মহাসঙ্গীত গাইতে লাগলুম—

"মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ, হে বিশ্বপিত!
তোমারি রচিত ছন্দে মহান্ বিশ্বের গীত।
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা হোয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লোয়ে,
আমিও দুয়ারে তব হোয়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শোনাব গীত এসেছি তাহারি লাগি;
গাহে যেথা রবিশশী, সেই সভা মাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত।"

গাইতে গাইতে মনে পড়্‌ল, একদিন বাঙ্গালা দেশে, গৃহে আমার স্ত্রী এই গানটী আমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়েছিলেন। আজ এত দূর দেশে এ রকম ভাবে আবার এই গান গাইব, তা কি সে দিন স্বপ্নেও ভেবেছিলুম? এখন কোথায় তিনি, কোথায় আমি? হঠাৎ অত্যন্ত চিত্তচাঞ্চল্যে মন ভরে উঠ্‌লো। এই হিমালয়, এই নিস্তব্ধতা, এই শান্তি,—সব ব্যর্থ মনে হোলো! অনেক বিলম্বে মনকে আবার সংযত কোরে আনলুম।

দেবপ্রয়াগ-পথে।

১০ই মে রবিবার,—পশ্চিম দেশে থাকতে গেলে অনেকেই একটু আদটু চা খাওয়া অভ্যাস করেন; দুর্ভাগ্য বশতঃ আমারও সে অভ্যাসটা ছিল এবং সব ছেড়ে এসে এখনও সকাল বেলা একটু চা-পানের প্রবৃত্তি বলবতী হোয়ে উঠে! তাই আজ ভোরে এই 'মহাদেব চটি'তে একটু চায়ের যোগাড় করা গিয়েছিল। দোকানদার বেচারা তার ঝুলি ঝেড়ে চা সংগ্রহ কোরে আমাদের জন্যে প্রস্তুত কল্লে—তাতে খানিক বিলম্ব হোয়ে গেল। স্বামীজি ত চটেই লাল! তিনি বোল্লেন, যার এত হাঙ্গামা তার আবার তীর্থভ্রমণে বাহির হওয়ার সখ কেন?—কিন্তু শর্করাসংযুক্ত চায়ের সঙ্গে তাঁর ভৎসনাটা বেশ সহজে পরিপাক কোরে বাহির হওয়া গেল। গত কল্য আমাদের সঙ্গে যে বাঙ্গালী বৃদ্ধটী জুটেছিলেন, তিনি তাঁর সঙ্গীদের জন্যে সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁকে আমাদের সঙ্গে নেবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করা গেল, কিন্তু তিনি তাঁর পূর্ব্ব সঙ্গীদের ছেড়ে আমাদের সঙ্গ নিতে এক দম্ গর রাজী।

আমরা সে বেলা ছয় মাইল হেটে প্রায় এগারটার সময় "কান্তি" চটিতে উপস্থিত হোলুম; কিন্তু যাদের ভয়ে আগে দিন একটু এগিয়ে এসেছিলুম, আজ দেখি তারা সকালে আমাদের পিছনে ফেলে এই চটিতেই এসে আশ্রয় নিয়েছে! এত বেলায় এই রৌদ্রের মধ্যে আর যাই কোথা? সেখানেই কোন রকমে কাটাতে হোলো। কিন্তু রৌদ্রে বড়ই কষ্ট পাওয়া গেল; তার উপর কিছু আহারেরও যোগাড় হোলো না তখন সকালের সেই 'চা' এর লোভের জন্যে মনে বড় অনুতাপ উপস্থিত হোলো; সন্ন্যাসী মহাশয় ভারি খুসী।

এইখানে আর একজন বাঙ্গালী যুবক-সন্ন্যাসী আমাদের সঙ্গী হোলেন এঁর একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। ইনি ঢাকা অঞ্চলের লোক, বৈদিব

ব্রাহ্মণের ছেলে, ইংরাজী জানেন না, কিন্তু বেশ সংস্কৃত জানেন। কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন এবং উপবীত ত্যাগ করেন; তারপর এঁর মাথায় কি একটা খেয়াল চাপে! কলিকাতায় থাকতেই তিন মাসের জন্যে মৌনব্রত অবলম্বন করেন। তখন না কি ইনি শ্লেট হাতে কোরে বেড়াতেন এবং বক্তব্য বিষয় শ্লেটে লিখে দেখাতেন! মনে সব কথাই আসচে, কিন্তু তা মুখ ফুটে না বলার মধ্যে যে কি পুণ্য লুকান আছে, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। বোধ করি এর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে; কিন্তু আমার পক্ষে আমি এইটুকু বোলতে পারি যে, সব রকম শাস্তি সহ্য করা যায়—কিন্তু মুখ বুজে থাকাটা অসহ্য; হাজার হাজার কথা এক সঙ্গে জমা হোয়ে বের হবার জন্যে ক্রমাগত ঠেলাঠেলি কচ্চে কিন্তু বের হোতে না পেরে পেটের ভিতর ভয়ানক একটা অরাজকতা উপস্থিত কোরছে—এ বড়ই মুস্কিলের কথা। যাহোক তিনি সে পরীক্ষা হোতে উত্তীর্ণ হোয়ে কাশীতে আসেন এবং সেখানে এক গুরুর কাছে 'দণ্ড' ধারণ কোরে সন্ন্যাসী হন; কিন্তু এ রকম মানুষের কোনটাই বেশী দিন পোষায় না। দণ্ডীদের অনেক কঠোরতা কোর্ত্তে হয়! তাদের শূদ্রের বাড়ীতে খেতে নেই, তাদের গৃহে ভিক্ষা নিতে নেই, এমন কি তাদের সঙ্গে একত্রে বসাও নিষেধ! ব্রাহ্মণগৃহেও এক বেলার বেশী অতিথি হওয়ার যো নেই। পূজা অর্চ্চনা যথারীতি কোর্ত্তে হয়, তাছাড়া দণ্ডখানি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কাছ-ছাড়া করবার যো নেই। দণ্ডীশ্রেণীতে এমনি কোরে শিক্ষানবিশী শেষ হোলে কয়েক বৎসর পরে গুরুর আদেশে দণ্ড ত্যাগ কোরে পরমহংস শ্রেণীতে প্রবেশ কোর্ত্তে পাওয়া যায়। প্রকৃত "পরমহংস" হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না, কিন্তু সব দণ্ডীই দণ্ডত্যাগ কোরে পরমহংসত্ব লাভ করেন। ব্রাহ্মণ ছাড়া কেহ দণ্ডী হোতে পারেন না। আমাদের দেশে উপবীত গ্রহণ যেমন, দণ্ডগ্রহণও অনেকটা তাই। উপবীতের সময় ব্রাহ্মণসন্তান যেমন তিনদিন ঘরের মধ্যে বোসে ফলমূলের ও গুড়সামগ্রীর

সর্ব্বনাশ কোরে এবং মা-বাপের মহাত্রাস জন্মিয়ে শেষে একেবারে ব্রাহ্মণ্য-তেজে পরিপূর্ণ হোয়ে বাহির হন, এঁরাও তেমনি দণ্ড গ্রহণ কোরে দু'চার মাস বাঁধাবাঁধির মধ্যে বাস করেন, তার পর দণ্ড জলে ভাসিয়ে পরমহংস হন ও অভিমানের বোঝা ভারী করেন।

আমাদের এই নূতন সঙ্গী সন্ন্যাসীও দণ্ড ত্যাগ কোরেছেন, কিন্তু পরমহংসশ্রেণীতে প্রোমসন পাওয়ার আগেই কোন কারণে গুরুর উপর বীতশ্রদ্ধ হোয়ে দণ্ডখানি জলে ফেলে দিয়েছেন; সুতরাং এখন তাঁর অবস্থা "না তাঁতী না বৈষ্ণব।" সন্ন্যাসীর পরিধানে গৈরিক বসন, সঙ্গে একটি কাঠের কমণ্ডলু, আর দু' তিনখানা বেদান্তদর্শন। লোকটা ঘোর বৈদান্তিক। দান্তিকশ্রেণীকে আমার বিশেষ ভয়, কিন্তু এই জঙ্গলে এ বৈদান্তিককে পেয়ে মনে বড়ই আনন্দ হোলো। লোকটা বেশ সরল প্রকৃতির, তবে বেদান্তের দোষেই হোক, কি নিজের অদৃষ্টের দোষেই হোক, তার দয়ামায়া কিছু কম বোলে মনে হোলো। তা না হোলে আর মা বাপ, স্ত্রী সব ছেড়ে এই ভবঘুরে বৃত্তি অবলম্বন কোরেছে? ভগবান জানেন, তার মনে কতটুকু শান্তি আছে, কিন্তু তাকে ত সন্ধ্যা আহ্নিক, পূজা অর্চ্চনা, ঠাকুর দেবতাদের প্রণাম প্রভৃতি কিছুই কোর্ত্তে দেখি নে; উপরন্তু, বোল্‌তে গেলে মহাতর্কজাল বিস্তার কোরে সব 'নস্যাৎ' কোরে দেয়। রাস্তাঘাটে এমন তার্কিক লোক একটা সঙ্গে থাক্‌লে আর কিছু না হোক্, পথশ্রম অনেক কমে আসে। বাবাজীর এখনকার নাম অচ্যুতানন্দ সরস্বতী। বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠে সবই আনন্দ, আর রাস্তা ঘাটের সন্ন্যাসীদের নামেরও অধিকাংশই আনন্দ। নামে আনন্দ আছে বটে, কিন্তু তা কার কতটুকু ভোগে লাগে, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ; শুধু চিনির বলদের মত আনন্দের বোঝা ঘাড়ে বোয়ে বেড়ান মাত্র।

'কান্তি' চটির সম্মুখেই একখানা ছোট গ্রাম। সেই গ্রামে সেদিন একটা বিবাহ। ঢোল বাজ্‌ছিল; আর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ভাল কাপড়

চোপড় পোরে, হাত ধরাধরি কোরে নেচে বেড়াচ্ছিল ; মুখ ভাবনাশূন্য এবং চক্ষু অত্যন্ত উজ্জ্বল ও চঞ্চল। সন্ধ্যার সময় দূরের এক গ্রাম হোতে বর আসবে ; দেখলুম মেয়েমহলে ভারি উৎসাহ লেগে গেছে ; তারা ব্যস্ত সমস্ত হোয়ে নানারকম আয়োজন কোরছে ! চটিতে জায়গা পাওয়া গেল না, দূরে একটা বড় সেওড়া গাছের ছায়ায় বোসে একলা এই দৃশ্য দেখতে লাগলুম। আমার সঙ্গীদ্বয় তখন নিদ্রায় মগ্ন ; আমার চক্ষে আর ঘুম এল না। আমি এই আনন্দের ছবির দিকে চেয়ে থাকলুম। একবার ইচ্ছা হোলো আজ রাত্রে এখানেই থেকে গিয়ে এদের বিবাহের উৎসবটা দেখে যাই, কিন্তু উদাসীন সাধুর দল আজ এখানে থাকবে ! তারা একবেলার বেশী পথ চলে না, সুতরাং এখানে থাকলে আজ রাত্রেও অনাহার ; কাজেই বিকেলে চারটের সময় বের হোয়ে পড়া গেল। খানিক পথ এসেই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হোলো। নিকটে গ্রামও নেই, কোন পর্ব্বতগহ্বরও নেই। আরো কষ্টের কারণ এই হোলো যে, বৃষ্টির সঙ্গে এমন ঝড় বইতে লাগলো যে, প্রতি মুহূর্ত্তেই নীচে পোড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেল। আমরা পর্ব্বতের গায়ে একটা অতি সংকীর্ণ পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম ; আমাদের বাঁয়ে পর্ব্বতের মধ্যে গঙ্গা। আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছিলুম, সেখান হোতে যদি কোন রকমে একবার হাত পা ছেড়ে দেওয়া যায় তো একেবারে পাঁচ ছয়শত ফিট নীচে গঙ্গার জলে দেহখানি,—নয় কখানা ভাঙ্গা হাড় মাত্র পড়তে পারে। হাতে সেই ৪॥ হাত পার্ব্বতীয় লাঠি ; তারি উপরে ভর রেখে বহুকষ্টে কাপড় ও উত্তরীয় কম্বল ভিজোতে ভিজোতে একটা যায়গায় উপস্থিত হলুম। তখনও সমান তেজে বৃষ্টি ও ঝড় হচ্ছে। সেখান হোতে ৫০০ ফিট নীচে নামতে হবে ; রাস্তা এক রকম নেই বল্লেই হয় ; পূর্ব্বের রাস্তাটা ভেঙ্গে গেছে, এখনো মেরামত হয় নি—সামান্য 'পাকদাণ্ডি' আছে মাত্র। রাস্তা সংক্ষেপ করবার জন্যে বলবান পাহাড়ীরা এড়োএড়ি যে সমস্ত ভয়ানক

পথে কখনো বা গাছের ডাল ধোরে, কখনো বা পাথরে পা আট্‌কিয়ে, কখন কখন এক পাথর হোতে লাফ দিয়ে আর একটা সমান পাথরে চোড়ে যাতায়াত করে—তারি নাম 'পাকদাণ্ডি।' একে ঝড় বৃষ্টি, তাতে এই রকমের পথ, তার উপর আবার নীচে নাম্‌তে হবে, বেলাও বেশী নেই; সুতরাং আমরা যে মহাভাবনায় পোড়ে গেলুম তা বলা বাহুল্য মাত্র। তবে এইমাত্র বোল্‌তে পারি যে, সহস্রধারা দেখিতে যাওয়ার সময়ে আমি ও আজকের আমিতে তফাৎ বিস্তর! পাঠকমহাশয় হয় ত আমার এই গর্ব্বাতিশয্যে কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করবেন; কিন্তু বাস্তবিক বোল্‌তে কি, সে সময় পশ্চিমদেশে আমার প্রথম আসা; তাহার পর তিন বৎসর ধোরে পাহাড়ে চলা ফেরা করাতে এখন শক্ত-সমর্থ হয়েছি, নতুবা এই পা দু'খানার উপর কখন এত বিশ্বাসস্থাপন কোর্ত্তে পার্ত্তুম না। দাঁড়িয়ে ভেজার চেয়ে পথ চল্‌তে চল্‌তে ভিজ্‌লে কষ্ট কম হবে, মনে কোরে তিন জনে অতি ধীরে ধীরে, কখন বসে, কখন গাছের গুঁড়ি ধোরে নাম্‌তে লাগলুম এবং এক একবার জোরে বাতাস এসে আমাদের বিষম ব্যতিব্যস্ত কোরে তুল্‌তে লাগ্‌লো।

ধীরে ধীরে নেমে অনেকক্ষণ পরে একটা পুলের ধারে এলুম। এ পুলটা ব্যাস গঙ্গার উপরে; একটী ছোট নদী গঙ্গায় পোড়েছে। এই নদীর নামই ব্যাসগঙ্গা। আমরা বরাবর গঙ্গাকে বাঁয়ে রেখে চলেছি, অর্থাৎ গঙ্গা দক্ষিণ মুখো চলেছে আর আমরা উত্তর মুখো চলেছি। লছমন-ঝোলা হোতে গঙ্গাপার হোয়ে, বরাবর গঙ্গা বাঁয়ে রেখে চল্‌তে চল্‌তে এই নদী আমাদের পথরোধ কোল্লে। ব্যাসগঙ্গাও হিমালয় থেকেই বাহির হোয়ে কতকটা দক্ষিণদিকে এসে শেষে পশ্চিমমুখো হোয়ে গঙ্গায় পড়েছে। এখানে ইংরেজ বাহাদুর একটা ছোট টানা সাঁকো তৈয়ারী কোরে দিয়েছেন; সাঁকোটা ৪০ হাতের বেশী হবে না। সাঁকো খুব ছোট কোর্ত্তে হয়েছে বোলে এত তৈয়ার করান হোয়েছে, এ জন্যে

উপরের রাস্তা হোতে আমাদের প্রায় পচিশ ফিট নীচে নেমে আস্‌তে হোয়েছিল। সাঁকোর প্রায় ১৫০।২০০ হাত সম্মুখে ব্যাসগঙ্গা গঙ্গায় পোড়েছে। এখানে একটা চটি আছে, তাহার নাম "ব্যাসচটি"—এ চটি একেবারে জলের ধারে। নিকটে অনেক দিনের পুরাণো ভগ্নপ্রায় দুটো মন্দির আছে; সেখানকার লোকে বলে, ঐ মন্দিরের সম্মুখে বোসে ব্যাসদেব অনেক দিন তপস্যা কোরেছিলেন। যেখানে বড় মন্দিরটি আছে, সে জায়গাটি বড় সুন্দর। নীচেই নদী, ওপারে ছোট বড় অনেক গাছের সার; গাছগুলো বাতাসে দুল্‌ছে, আর তাদের চঞ্চল ছায়া নদীর নির্ম্মল জলে সর্ব্বদাই কাঁপ্‌চে। কিন্তু গাছের শোভার চেয়ে ময়রের শোভাই বেশী। ওপারের গাছগুলিতে ময়রের পাল। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, এখনও আকাশে বেশ মেঘ আছে। দলে দলে ময়র পুচ্ছ খুলে যে কি সুন্দর নৃত্য আরম্ভ কোরেছে, তার আর কি বোল্‌বো? তাদের ডাকে সেই বনভূমি ও নিস্তব্ধ নদীতীর প্রতিধ্বনিত হচ্চে। একটা দোকানে বোসে এই দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমি মুগ্ধ হোয়ে গেলুম; কবির কথা এখন আমার মনে আস্‌তে লাগ্‌লো—

"সেই কদম্বের মূল যমুনার তীর,
সেই সে শিখীর নৃত্য
এখনও হরিছে চিত্ত,
ফেলিছে বিরহ ছায়া শ্রাবণ তিমির।"

কিন্তু এ যে বৈশাখ!—তা হোলেও বৈশাখের বৈকালে মধ্যে মধ্যে শ্রাবণের ঘনঘটা নজরে পোড়ে যায়।

নদীর ধারে এখানে কয়েকখানা দোকান আছে। অন্যান্য চটির চেয়ে ব্যাসচটিতে দোকানের সংখ্যা কিছু বেশী এবং তাদের অবস্থাও ভাল, কারণ শ্রীনগর হোতে এ দিক দিয়ে ব্যাসগঙ্গার ধারে ধারে নাজিমাবাদের রাস্তা, আর এই রাস্তায় অনেক লোকজন চলে। ভিজে কাপড় কোন

রকমে শুকিয়ে এখানেই রাত্রি কাটান গেল, এবং যতক্ষণ নিদ্রা না এল, অচ্যুতানন্দ বাবাজীর সঙ্গে আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তত্ত্ব নিয়ে অন্যের দুর্ব্বোধ্য বাঙ্গালায় কথাবার্ত্তা কওয়া গেল।

১১ই মে সোমবার—সকালে উঠে তাড়াতাড়ি বের হোলুম, কারণ এখানে যে দুটি মন্দির আছে, কাল সন্ধ্যার সময় তা আর দেখা হয় নাই। মন্দির দুটি পাথরের, দেখ্‌লে অনেক দিনের বোলে বোধ হয়; আর তা এমন জীর্ণ হোয়ে পড়েছে যে, বোধ হয় আর দু তিন দিনের মধ্যেই ভেঙ্গে একেবারে ভূমিসাৎ হবে। এই সমস্ত প্রাচীন মন্দির রক্ষা করার জন্য চেষ্টা হওয়া উচিত। মন্দির দুটির একজন পুরোহিত। মন্দিরের মধ্যে দেখলুম, কতকগুলি সিন্দূর মাখান পাথর, আর দুটি অস্পষ্টাকৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তি। প্রত্যহ পূজা করা দূরে থাক, পূজক ঠাকুর যে প্রত্যহ মন্দিরের দ্বারও খোলেন না, তা মন্দিরের ভিতরের চেহারা দেখ্‌লেই বেশ বোঝা যায়; তবে যাত্রীদল সে পথে যেতে আরম্ভ কোর্‌লে তিনি মন্দির একটু পরিষ্কার রাখেন, আর মন্দিরের বাহিরে এক প্রস্তরখণ্ড ব্যাসের আসন বোলে যাত্রীদের দেখিয়ে তাদের ভক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ অর্থ আকর্ষণ কোরে থাকেন। স্থানটি দেখে যে খুব ভক্তির উদয় হয় তার আর সন্দেহ নেই; কিন্তু প্রতিপদে যদি বিনা বাক্যব্যয়ে এই রকম প্রকারে 'নজর' দিতে হয়, তা হোলে বদরিকাশ্রম পৌঁছিবার বহুপূর্ব্বেই রাস্তা হোতে দেউলে হোয়ে আমাদের দেশে ফির্‌তে হবে।

আজ আমরা দেবপ্রয়াগে পৌঁছিব। আজ অক্ষয়তৃতীয়া; বদরিকাশ্রমে বদরিনারায়ণের মন্দির আজই খোলা হবে। আমাদের ইচ্ছা ছিল, আর দুচার দিন আগে বের হোয়ে অক্ষয়তৃতীয়ার দিন বদরিকাশ্রমে পৌঁছি, কিন্তু তা হয় নি, কাজেই এখন তাড়াতাড়ি পথ চল্‌তে আরম্ভ কোরেছি। আমরা স্থির কোরেছি, যেমন কোরেই হোক আজ দেবপ্রয়াগে পৌঁছিব। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করার জন্য যে শেষে খুব নাকাল হোতে

হবে, তা কে জানতো ? সে কথা পরে বলছি ! অনেক দূর আমার পর তিন চার দল পাণ্ডা এসে আমাদের আক্রমণ কোর্‌লো ; এরা দেবপ্রয়াগ হোতে খানিক রাস্তা এগিয়ে এসে যাত্রী ধরবার জন্য বোসে থাকে। আমাকে নিয়ে মহা পীড়াপীড়ি ! আমি তাদের বুঝিয়ে দিলুম যে, আমার পাণ্ডার কোন দরকার নেই, তবে যদি নিতান্তই দরকার হয়, তা হোলে যে আমাকে প্রথমে বলেছে, তাকেই পাণ্ডা কোরবো। এই কথায় আশ্বাস পেয়ে একজন আমার সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগলো ; যতগুলি পাণ্ডা দেখলুম, তার মধ্যে এর বয়স কম, বেশভূষার পারিপাট্যও বেশী। গলায় সোনার হার, হাতে সোনার তাগা, কাঁকালে সোণার গোট, কানে বীরবৌলী ; তার নাম লছমীনারায়ণ, বয়স ত্রিশ বত্রিশ।

আমরা দেবপ্রয়াগে পৌঁছে বাজারে একটা দোতলার উপর বাসা নিলুম। বাজারে কোঠা বাড়ী আছে, কিন্তু ছাতে পাথর দেওয়া ; অনেকগুলি দোকান ; জিনিস পত্রও মোটামুটি সব পাওয়া যায়। পাণ্ডাদের জ্বালাতন হোতে উদ্ধার হয়ে দোকান ঠিক কোরে স্থির হোয়ে বোসতে আমাদের প্রায় এক ঘণ্টা লাগলো। বাসা করা হোলে আমার সঙ্গী বৃদ্ধ স্বামীজি তাঁর ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিছাতে গিয়ে দেখেন—ব্যাঘ্রচর্ম্ম নেই ! এই ব্যাঘ্রচর্ম্মখানি তিনি ভাল কোরে বেঁধে কোরিয়ার ব্যাগের মত পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে চলাফেরা করেন। তাঁর ব্যাঘ্রচর্ম্মখানি যাওয়াতে তাঁর কিঞ্চিৎ দুঃখ হোলো বটে, কিন্তু আমার একেবারেই চক্ষুস্থির !

দেরাদুন হোতে বের হবার সময় কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে বের হোয়েছিলুম ; রাস্তায় নোট ভাঙ্গানর সুবিধা হবে না, কারণ এখানে খাদ্যদ্রব্যই মেলে না, তা আবার নোটের টাকা ! কাজেকাজেই যা কিছু অর্থ নিয়েছিলুম তা সবই নগদ টাকা। আর সিকি দুয়ানি আধুলী। সঙ্গে ট্রাঙ্ক কি ব্যাগ প্রভৃতি কিছু নেই, এত গুলি টাকা রাখি কোথায় ?—তাই বন্ধুবান্ধবদের

স্বপরামর্শমত মোটা জীনের হাত তিনেক লম্বা ও দু আঙ্গুল কি আড়াই আঙ্গুল চওড়া একটা থলি কিনেছিলুম; তার মধ্যে টাকা কড়ি রেখে সেটা কোমরে জড়িয়ে রাখ্‌তে হয়। যেদিন রওনা হই সেদিন সেই রকমই কোরেছিলুম—কিন্তু চলবার সময় সেটাতে বড় অসুবিধা বোধ হোতে লাগ্‌লো। তাই স্বামীজির পরামর্শমত সেটা তাঁর ব্যাঘ্রচর্ম্মের সঙ্গে জড়িয়ে দুই পাশে মোটা দড়ি দিয়ে শক্ত কোরে বেঁধে দিলুম। ঐ ভাবে গত কয় দিন চোলে এসেছে। আজ খুব শীঘ্র চল্‌তে হবে ঠিক্ কোরে, সকলেই ভারি তাড়াতাড়ি লাগিয়েছিলেন, কিন্তু খানিক রাস্তা তাড়াতাড়ি চল্লেই ক্লান্ত হোয়ে পড়তে হয়; এই জন্যে আমাদের রাস্তায় দু তিন জায়গায় বস্‌তে হোয়েছিল। একটা জায়গায় বোসে স্বামীজি তাঁর স্কন্ধ হোতে ব্যাঘ্রচর্ম্মটা একবার নামিয়েছিলেন—কিন্তু উঠবার সময় তা পুনর্ব্বার স্বস্থানে স্থাপন করার কথা ভুলে গিয়েছিলেন! তার মধ্যে পয়সা কড়ি সব, সঙ্গে কিছু নেই বোল্লেই হয়। স্বামীজি প্রথমে বোল্লেন, তিনি কখনও সেটা রাস্তায় ফেলে আসেন নি; দেবপ্রয়াগে পৌছিবার সময় পাণ্ডা বেটারাই কেউ হাতিয়েছে! তিনি আরো বল্লেন যে, এখানে পাণ্ডাদের যে রকম উপদ্রব, তাতে তারা গলায় ছুরি না দিয়ে যে ব্যাঘ্রচর্ম্ম কেড়ে নিয়েই শান্ত হয়েছে, এই আমাদের ঢের পুণ্যির ফল! আমি হতাশ ভাবে বল্লুম "আর ব্যাঘ্রচর্ম্ম! আপনার শুধু ব্যাঘ্রচর্ম্ম গেছে মনে কোরেই পুণ্যির কথা বলছেন, আমার যে যথাসর্ব্বস্ব গেছে; এর চেয়ে গলায় ছুরি দেওয়া ত অনেক ভাল ছিল!" আমার মন কি রকম খারাপ হোলো, তা আর কহ্‌তব্য নয়। কিন্তু যাকে পাণ্ডা স্থির করবো বোলে আশ্বাস দিয়েছিলুম, সে বল্লে আমরা বাজারের মধ্যে বসি নি, আর পাণ্ডাদের দ্বারাও এ রকম কাজ হয় নি। আমরা নিশ্চয়ই সেটা রাস্তায় কোথাও ফেলে এসেছি। বাদানুবাদে প্রায় পনের মিনিট কেটে গেল। শেষে সেই পাণ্ডা প্রস্তাব কোল্লে যে, রাস্তায় আমরা যেখানে যেখানে বসেছিলুম সেই সমস্ত জায়গা সে

নিজে ও তার সঙ্গে অচ্যুতানন্দ বাবাজী গিয়ে খোঁজ করে আসবে। কিন্তু তাতে যে কিছু ফল হবে, আমি একবারও সে আশা করি নি; মাথায় হাত দিয়ে বোসে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলুম। এই পাহাড়ের মধ্যে বন্ধুহীন দেশে কি রকম কোরে দিন কাটবে? এক উপায় আছে,—ভিক্ষা, কিন্তু তা ত কখনো পারবো না; তবে আর এক রকম সভ্যতাসঙ্গত ভিক্ষা আছে, আতিথ্য স্বীকার করা; এতে কতক অভ্যাস আছে বটে; কিন্তু এ বৎসর দুর্ভিক্ষের প্রকোপ থাকায়—পাহাড়ের মধ্যে যে দুই চারিখানি গ্রাম আছে সেখানকার লোকেই একরকম খেতে পায় না—তা তারা অতিথিকে কি খেতে দেবে? আমি এই সমস্ত কথা চিন্তা কর্ত্তে লাগলুম, স্বামীজি শুয়ে পড়লেন। অচ্যুতানন্দ স্বামী পাণ্ডাঠাকুরের সঙ্গে অসাধ্য সাধন করবার জন্য চোলে গেলেন। রাস্তায় যদি ফেলে এসে থাকি ত তা যে কোথায় তার কিছু ঠিক নেই; আর তারপর প্রায় তিন ঘণ্টা কেটে গেছে; এঁদের খুঁজতে খুঁজতে কোন্ আরও এক ঘণ্টা না লাগবে? এই সময়ের মধ্যে কত যাত্রী, কত বকরিওয়ালা সে পথ দিয়ে যাতায়াত কোরেছে। এত গুলো লোকের মধ্যে সে ব্যাঘ্রচর্ম্ম কারো চোখে কি পড়ে নি? যাহোক তবু তাঁদের পথ চেয়ে বোসে রইলুম! এ দিকেও ভিক্ষা—ওদিকেও ভিক্ষা, দেখা যাক,—তাঁরা ফিরে এলে যা হয় করা যাবে!

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে দেখি তাঁরা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে আসছেন, তাঁরা অনেক নিকটে এলে অচ্যুতানন্দ বাবাজী খুব চেঁচিয়ে বল্লেন, "মিল গিয়া, মিল গিয়া!" আমি অকূল পাথারে কূল পেলুম। তাঁরা একেবারে প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়িয়েছিলেন। লছমীপ্রসাদ পাণ্ডা এসে থলিশুদ্ধ টাকা মাটিতে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বোসে পড়লো। তাঁদের অবস্থা দেখে আর তখন টাকা কিরূপে কোথায় পাওয়া গেল, তা জিজ্ঞাসা কল্লুম না। শেষে তাঁরা শান্ত হোয়ে বোল্লেন যে, রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে যাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, তাদেরই ব্যাঘ্রচর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা

করেছেন ; কিন্তু কেউ কোন কথা বলতে পারেনি। শেষে একজন সন্ন্যাসী বলেছিল যে, প্রায় দেড় মাইল তফাতে একটা ঝরণার পাশে একখণ্ড বড় পাথরের উপর সে একখানা ব্যাঘ্রচর্ম্ম পড়ে থাকতে দেখেছে। তার মনে হয়েছিল, বুঝি কোন সন্ন্যাসী সেখানে আসন রেখে বনের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এই কথা শুনে তাঁদের মনে আশা হলো। তাঁরা দৌড়িতে দৌড়িতে সেখানে গিয়ে দেখেন যে, ব্যাঘ্রচর্ম্মখানি ঠিক সেখানে সেই রকম বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। অচ্যুতানন্দ মহানন্দে তা তুলে নিলে, কিন্তু হাতে কোরেই তাঁর হরিষে বিষাদ উপস্থিত হলো! আসন পাতলা, খুলে দেখেন ভিতরে কিছুই নেই, অথচ উপরে যেমন তেমনি বাঁধা! দুজনেই মাথায় হাত দিয়ে বোসে পড়লেন; কিন্তু একটু পরেই পাণ্ডাঠাকুর উঠে চারিদিক অনুসন্ধান কোরে দেখতে লাগল, কিছুই দেখতে পেলে না। রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নীচে নেমে গেল; আর একটু নীচে গিয়ে দেখে একটা রাখাল বালক কতকগুলি মেষ চরাচ্ছে। তাকে জিজ্ঞাসা কোরে, সেখান দিয়ে কোন লোক নেমে গেছে কি না; পাণ্ডাজীর কেমন বিশ্বাস হোয়েছিল যে, যে টাকা নিয়েছে সে কখন প্রকাশ্য পথ দিয়ে যেতে সাহস করে নি, এদিক ওদিক দিয়ে নেমে গেছে। পশ্চিমে পাণ্ডার এতটা বুদ্ধির পরিচালনা অবশ্য একটু অসাধারণ! যা হোক, প্রথমে রাখাল বালক পাণ্ডাজীকে কোন কথাই বোলতে পারে না; শেষে খানিক ভেবে চিন্তে বল্লে যে, সে যেন সেই পথদিয়ে একজন সন্ন্যাসীকে খানিক আগে যেতে দেখেছে। তাই শুনে পাণ্ডাঠাকুর ঠিক কল্লে, এ টাকা চুরি সেই সন্ন্যাসী ছাড়া আর কাহারও কাজ নয়। রাখাল যে পথ দেখিয়ে দিলে, সে কাঁটাজঙ্গল ভেঙে সেই দিকে দৌড়িতে লাগলো; কাঁটায় সর্ব্ব শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল, ভ্রূক্ষেপ না কোরে দৌড়িতে দৌড়িতে খানিক আগে দেখলে—একজন সন্ন্যাসী উপরের দিকেই উঠচে; পাণ্ডাঠাকুর তার অলক্ষ্যে তার পাছু পাছু যেতে লাগ্‌লো। সন্ন্যাসী বেশ বলবান বোধ হওয়ায় এই

নির্জ্জন প্রদেশে তাকে একেবারে চেপে ধোর্‌তে তার কিছু ভয় হোলো। যা হোক, রাখাল বালকও ব্যাপার কি জানবার জন্য ধীরে ধীরে পাণ্ডাজীর পেছনে পেছনে আসতে লাগলো। অচ্যুতবাবাজীও একটু একটু কোরে অগ্রসর হোচ্ছিলেন। চোর সন্ন্যাসী যখন ধীরে ধীরে নীচে রাস্তার উপরে উঠ্‌বার আয়োজন কচ্ছিলো, তখন পাণ্ডাঠাকুর অদূরে রাস্তার উপর অচ্যুত বাবাজীকে দেখে সাহস পেয়ে একদৌড়ে সিংহবিক্রমে সেই সন্ন্যাসীর ঘাড় চেপে ধোরে একেবারে "শালা চোর, নিকালো রূপেয়া!" বোলে চীৎকার কোরে উঠ্‌লো। এদিকে অচ্যুত বাবাজী "ক্যা হুয়া" বোলে এক লম্ফে সেখানে উপস্থিত। সন্ন্যাসী চোর ত একেবারে থ! তার আর কোন কথা বল্‌বার শক্তি রহিল না। সে নিজেও খুব জোয়ান বটে কিন্তু আগে পাছে দু'জন যণ্ডামার্ক দেখে তার বড় ভয় হোল, এবং সেসব কথা স্বীকার কোরে পাণ্ডাজীর পায় ধোরে কান্নাকাটি আরম্ভ কোল্লে। তারপর তিনজনে মিলে সেই ঝরণার কাছে এসে টাকা খুলে দেখে যে, একটী টাকাও কমে নি। সন্ন্যাসী চোরটা বড়ই নির্লজ্জ; কোথায় চুরি কোরে ধরা পোড়েছে বোলে পালাবার চেষ্টা করবে, না—কিছু ভিক্ষার জন্য তাদের দুজনকে ধোরে বোসলো। টাকা পেয়ে তাদের এতই স্ফূর্ত্তি হোলো, যে, দয়ার্দ্র হোয়ে তারা তাকে এক টাকা বক্‌শিস দিলে, আর সেই রাখালকে ডেকে তাকে চার আনা পুরস্কার দিয়ে এই সংবাদ আমাদের জানাবার জন্যে প্রাণ পণে ছুটে আসছে। আমি পাণ্ডাজীকে ৫৲ টাকা পুরস্কার দিতে গেলুম। সে কিছুতেই তা নিলে না, বোল্লে, "বাবুজী, ইনাম কা ওয়াস্তে ইতনা তক-লিফ লেনেকো আদমী মৈঁই নেহি হুঁ, আপ্‌কো ওয়াস্তে প্রাণ ব্যাকুল হুয়া থা!" তার এই স্বার্থশূন্য কথাগুলি শুনে, আমি যে টাকা দিয়ে তার পরিশ্রমের মূল্য নির্দ্দেশ কোত্তে গিয়েছিলুম এ ভেবে মনে বড় লজ্জার উদয় হলো; কিন্তু তার এই মহৎ ব্যবহারে আমার খুব আনন্দ হলো। এই পর্ব্বতবাসী একজন অশিক্ষিত পাণ্ডা আমার মত অপরিচিতের

জন্যে যে কষ্ট স্বীকার কোল্লে, দেশের কোন পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুও এর চেয়ে বেশী কোর্‌তে পার্ত্তেন না ; এ রকম মহত্ত্বের দৃষ্টান্তও অতি বিরল।

দেবপ্রয়াগ গঙ্গা অলকনন্দার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। গাড়োয়ালের মধ্যে দেবপ্রয়াগ একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার হাট বাজার বেশ ভাল ; বদ্রিনারায়ণের পাণ্ডাদের বাস এখানেই। প্রায় পাঁচশ ঘর পাণ্ডা এখানে বাস করে। এদের অনেকেরই অবস্থা ভাল, ঘর বাড়ী পাকা এবং সকলেই এক জায়গায় থাকে। গঙ্গা ও অলকনন্দা যেখানে সম্মিলিত হোয়েছে তারই ঠিক উপরে একটু সমতল স্থান আছে। সেই টুকুর মধ্যেই এই পাঁচশ ঘর গৃহস্থ কোন রকমে বাস কোচ্ছে। দেবপ্রয়াগে একটা পুরাণো মন্দির আছে, মন্দিরটা পাণ্ডাদের বাড়ীর ঠিক মধ্যখানে। এই মন্দিরে রামসীতার মূর্ত্তি আছে। গাড়োয়ালের রাজা—এখন তাঁকে টিহরীর রাজা বলে,—এ মন্দিরের অধিকারী। মন্দিরের অনেক ধনসম্পত্তি আছে। টিহরী রাজ্যের নিয়ম এই যে, রাজার মৃত্যু হোলে তাঁর নিজ ব্যবহার্য্য সমস্ত জিনিসই এই মন্দিরে পাঠান হয় ; মন্দিরের সমস্ত আয়ব্যয়ের ভার টিহরীর রাজার উপর ; তাঁর নিযুক্ত পুরোহিতের উপর দেবসেবার ভার আছে।

পাণ্ডার সঙ্গে গিয়ে সঙ্গমস্থলে স্নান কোল্লুম ; গঙ্গা ও অলকনন্দার মধ্যে অলকনন্দাকেই বড় বোলে মনে হয়। এখন আমাদের অলকনন্দার ধারে ধারে যেতে হবে। আমাদের যেখানে বাসা সেখান হোতে সঙ্গমস্থলে যেতে হোলে অলকনন্দা পার হোতে হয়। ইংরেজের প্রসাদে এখন আর ঝোলা পার হোতে হয় না। যেখানে যেখানে ঝোলা ছিল সেই সমস্ত জায়গায় এখন এক একটা সুন্দর টানা পুল তৈয়ারি হোয়েছে। ইংরেজেরা যে কয়টী সাঁকো তৈয়ারি কোরেছেন, তার মধ্যে এইটিই সব চেয়ে বড় ও সুন্দর। এর নির্ম্মাণ-প্রণালী কলিকাতার সন্নিহিত

চেতলার পুলের মত। এই সমস্ত ভয়ানক স্থানে বহু অর্থ ব্যয় কোরে পুল তৈয়ারি করিয়ে ইংরেজরাজ বহু প্রতিষ্ঠা ও আশীর্ব্বাদভাজন হোয়েছেন; প্রকৃতপক্ষে বদরিকাশ্রমের পথ ইংরেজের প্রসাদেই অনেক সুগম হোয়েছে।

বিকেলে আমরা মন্দির দেখ্‌তে গেলুম; ঠাকুরের গায়ে স্বর্ণ ও মণি-মুক্তার অনেক অলঙ্কার। আমার পাণ্ডা আমাকে বাঙ্গালীর এক কুকীর্ত্তির কথা শুনিয়ে দিলে; লজ্জায় আমার মুখ চোখ লাল হোয়ে উঠ্‌লো! দেবপ্রয়াগে ভদ্রবেশধারী বাঙ্গালীকে এখন সকলেই সন্দেহের চক্ষে দেখে, এমন কি তার গতিবিধি পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ কোরে থাকে। বাঙ্গালীর পক্ষে এ বড় কম লজ্জার কথা নয়! যাকে বড় বেশী বিশ্বাসী বোলে মনে হয়, সে যদি অবিশ্বাসের কাজ করে, তা হোলে তার পরে কি আর কাউকে তেমন সহজে বিশ্বাস করা যায়? ব্যাপারটা কি, এখানে বলা যাক।

আজ প্রায় পাঁচ বৎসর হোলো একদিন একজন বাঙ্গালী বাবু দেবপ্রয়াগে এসে উপস্থিত হন, তীর্থদর্শনই তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর বাড়ী কলিকাতায়, তবে ঠিক সহরের মধ্যে কি না তা বলা যায় না। তিনি নিজের নাম বোলেছিলেন, সেটা আমার ডাইরীতে লেখা ছিল; কিন্তু পেন্সিলের লেখা মুছে গেছে; আর তাঁর নামটা মুছে যাওয়ায় আমি কিছুমাত্র দুঃখিতও নই। বাঙ্গালী জাতি হোতে যদি তাঁর নামটা মুছে যেত, ত তাঁর কুকীর্ত্তির কথা শুনে আমাকে এত লজ্জিত হোতে হোতো না। দেবপ্রয়াগে এসে তিনি প্রথমে একদিন থাক্‌বেন বোলে বাসা নিয়েছিলেন; কিন্তু স্থানটি অতি মনোরম বোধ হওয়াতে তিনি এখানে বেশী দিন ধোরে বাস কোর্ত্তে লাগ্‌লেন। এখানে একটা ইংরেজের থানা আছে, থানার লোকজনের সঙ্গে বেশ ভাব হোলো; ডাকঘরের বাবুর সঙ্গেও বেশ আলাপ পরিচয় হোলো; বড় বড় পাণ্ডাদের সঙ্গেও

বন্ধুত্ব স্থাপন কোল্লেন, এবং একজন ইংরেজীজানা ধনশালী (পশ্চিমে একটু ফিট ফাট্ থাক্‌লেই সে দেশের লোক ভাবে এ ব্যক্তি একজন রাজা মহারাজা হবে) বাঙ্গালী বাবুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতায় সকলেই আপনাকে একটু কৃতার্থ মনে কোর্ত্তে লাগলো।

বাবু প্রত্যহই রামসীতা দর্শন করতে যান, মহাভক্তির সঙ্গে ঠাকুরের দিকে—কি ঠাকুরদের গহনার দিকে ঠিক বলা যায় না—চেয়ে থাকেন, এবং আর সব দর্শক ও যাত্রী চোলে গেলে তিনি সকলের শেষে মন্দির হোতে বাহির হন। তিনি দেখ্‌লেন বাহিরের দিক হোতে একটা বড় তালা দিয়ে মন্দির বন্ধ করা হয়, সুতরাং মন্দিরের এই তালার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়লো। পোষ্টমাষ্টার বাবুর আফিসের তালাটাও অনেকটা এই রকমের; কিন্তু সে দিকে আর কাহারও দৃষ্টি পড়ে নি; আর পোষ্ট-মাষ্টারকেও বড় একটা আফিস বন্ধ কোর্ত্তে হয় না, কাজেই সে চাবিটা কোলুঙ্গার উপর অযত্নে পোড়ে থাকে। বাঙ্গালী বাবু সেই চাবিটা হস্তগত কোল্লেন এবং তাকে ঘসে সেই মন্দিরের তালায় লাগাবার উপযোগী কোরে নিলেন। শেষে একদিন রাত্রে যখন সকলে নিদ্রিত—সেই সময় তিনি ধীরে ধীরে মন্দিরের দ্বার খুলে মন্দিরে প্র[illegible] কোল্লেন এবং দ্বার বন্ধ না কোরেই ভিতরে চোলে গেলেন। ম[illegible]রের বাহিরে একটা ছোট ঘরে পুরোহিতের একজন লোক শয়ন কোরেছিল; সে কার্য্যবশতঃ উঠে দেখে, মন্দিরের দ্বার খোলা, ভিতর হোতে আলো আস্‌ছে। এত রাত্রে মন্দিরের দ্বার খোলা দেখে তার ভারি সন্দেহ হোলো। চুপে চুপে মন্দিরের কাছে গিয়ে দেখে ভিতরে টুক্‌টাক্ শব্দ হোচ্ছে। সে উচ্চবাচ্য না কোরে প্রথমে মন্দিরের পাশে একটা দুয়ার ছিল (সেটা ভিতর হোতে বন্ধ) সেই দুয়ারটাতে শিকল টেনে দিলে; তার পর নিজের ঘর থেকে সেই বড় দরজার চাবি এনে দুয়োর বন্ধ কোরে চীৎকার আরম্ভ কোল্লে। চোর মহাশয় ইতিমধ্যে মন্দিরে প্রবেশ কোরে সর্ব্বাপেক্ষা মূ[illegible]বান

অলঙ্কারগুলি—কতক বা ঠাকুরদের গা হোতে এবং কতক বাক্স ভেঙ্গে বের কোরে—কাপড়ে রেখেছেন। তিনি বিশ্বস্ত চিত্তে এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত—সহসা মন্দির-দ্বারে জনকোলাহল শুনে তাড়াতাড়ি দুয়োরের কাছে এসে দেখেন দ্বার বন্ধ! দশমিনিটের মধ্যে চারিদিকে পাণ্ডার দল এসে জুটলো; মেয়ে পুরুষে সেই মন্দির-প্রাঙ্গণ পূর্ণ হোয়ে গেল। বাবাজী বিনা চেষ্টাতেই ধরা পড়লেন, কাপড়ে বাঁধা জহরত সমস্তই প্রকাশ হোয়ে পড়লো। টিহরী রাজ্যে ৬' বৎসর মেয়াদ খেটে তার পর ইংরেজের কাছে বিচার হোয়ে তার আর দু বছরের জেল হোলো। জেল থেকে বের হোয়ে সেই পুরুষপুঙ্গব এখন যে কোথায় ঘোরে পড়েছেন তা জানা যায় নি। এখন ভদ্রবেশধারী যুবক দেখলেই মন্দিরের লোক তার দিকে সন্দিগ্ধচিত্তে চেয়ে থাকে এবং বিশেষ সাবধান হয়; আমি যে তাদের সন্দেহ হোতে এড়িয়েছিলুম তা বোধ হয় না, আমার বয়সের লোক যে কোন একটা বিশেষ অভিপ্রায় ছাড়া এত কষ্ট কোরে শুধু তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এতদূর এসেছে, একথা আর তারা সহজে বিশ্বাস কোত্তে রাজী নয়; কেননা তাদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অন্য রকমের। শুধু এই হতভাগাই যে এ দেশে আমাদের নামে কলঙ্ক রেখে গেছে তা নয়, পশ্চিমের আরো অনেক স্থানে অনেক বাঙ্গালীর কুকীর্ত্তির কথা শুনতে পাওয়া যায়; এবং সে সমস্ত কথা শুনে অধোবদন হোতে হয়। কিন্তু আজকাল অনেক ভদ্রলোক পশ্চিমে গিয়ে আমাদের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার কোরেছেন এবং ভরসা আছে, তাঁদের মহত্বে আমরা ভবিষ্যতে এ সব দেশে বাঙ্গালী বোলে পরিচয় দেওয়া বিশেষ গর্ব্বের কথা মনে কোরবো।

— —

দেবপ্রয়াগ

১২ই মে মঙ্গলবার,—আজ দেবপ্রয়াগে অবস্থান। অনেকদিন পরে লোকালয়ে এসেছি; বোধ হোলো এতদিন যেন জীবনের নেপথ্যে নেপথ্যে বেড়াচ্ছিলুম—তার মধ্যে না ছিল জনকোলাহল, না ছিল কিছু; কেবল মুক্ত প্রকৃতি তার সমস্ত সৌন্দর্য্য থরে থরে সাজিয়ে—আমার হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠান কোরেছিল; আজ হঠাৎ মানব-কোলাহলে সে দৃশ্যের পরিবর্ত্তনে একটু নূতনত্ব পাওয়া গেল। বাজারে দোকানদারদের কেনাবেচার গোল, পাণ্ডাদের যাত্রী সম্বন্ধে আলোচনা, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের হাসি গল্প প্রভৃতি শুনে মনে হোলো, এতদিন পরে বুঝি সংসারে ফিরে এলুম। সঙ্গে সঙ্গে একটু আরাম ও সুখভোগের ইচ্ছাটাও বেশ প্রবল হোয়ে উঠ্‌ল। এতদিন ত অবিশ্রান্ত পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম, খানিক বোসে আয়েস করার কথা তখন একবারও মনে হয় নি; কিন্তু আজ পা দুটো একবার ছুটী নেবার জন্যে মহাব্যতিব্যস্ত কোরে তুল্‌লে; আমি ফিলজফাইজ কল্লুম, যতক্ষণ মানুষ কষ্টের মধ্যে থাকে, যতক্ষণ দেখে যে, কষ্ট ছাড়া আর কিছু [illegible]ভের কোন সম্ভাবনা নেই, ততক্ষণ সে তা বেশ ঘাড় হেঁট কোরে সহ্য কোরে যায়, কিন্তু যখনই তার ফাঁক দিয়ে একটু সুখের ছায়া নজরে পড়ে তখনই আবার সব ছেড়ে সেই সুখটুকুর পাছু পাছু ছুটে, আর তা লাভ কোর্ত্তে না পাল্লেই নিজকে মহা দুর্ভাগ্য বোলে মনে করে। আমার আজ আর উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, কিন্তু নগর ত দেখা চাই, কাজেই আলস্য ছেড়ে উঠে নগর ভ্রমণে বাহির হওয়া গেল।

দেবপ্রয়াগের দৃশ্যশোভা বড়ই সুন্দর। পূর্ব্বেই বলেছি এখানে গঙ্গা ও অলকনন্দার সঙ্গম হয়েছে। গঙ্গার মাহাত্ম্য বেশী, তাই লোকে বলে

গঙ্গায় অলকনন্দা মিশেছে, কিন্তু ঠিক কথা বল্‌তে হোলে বলা উচিত অলকনন্দার সঙ্গে গঙ্গা মিশেছে। অলকনন্দা ঘোর রবে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলে যাচ্ছে; তার উচ্ছৃঙ্খল বেশ, তার তরঙ্গ কল্লোল, আর তার উচ্চ তটভূমির বিস্তীর্ণ পাথরের উপর শ্যামল শৈবালের স্নিগ্ধ শোভা দেখে তাকে কবিতার একটা জীবন্ত প্রতিকৃতি বোলে বোধ হয়; সেই ভৈরব দৃশ্যের মধ্যে গঙ্গা কুলকুল রবে তার নির্ম্মল জলরাশি ঢেলে দিচ্ছে। আমাদের বঙ্গের সমতল ক্ষেত্রে দুটো নদীর একটা সঙ্গম বড় বিশেষ ব্যাপার নয়, দৃশ্যতেও তেমন কিছু বৈচিত্র্য থাকে না,—কেবল সঙ্গমস্থলটা খানিকটা প্রশস্ত হয় মাত্র; আর দুটো নদী যে কেমন কোরে মিশে গেল, তার খবরও পাওয়া যায় না, স্বতন্ত্র অস্তিত্বের চিহ্ন ত দূরের কথা! কিন্তু এদেশের পার্ব্বত্য নদী পার্ব্বত্য জাতির মত তেজস্বী; সহজে আত্মবিসর্জ্জন কোর্ত্তে রাজী নয়, যথেষ্ট আয়োজন কোরে তবে আত্ম-বিসর্জ্জন করে।

বদরিকাশ্রমের পথে যে ক'টা যায়গা দেখেছি, তার মধ্যে দেব-প্রয়াগই আমার সব চেয়ে ভাল বোধ হোলো। সে যে ঠিক একখানা ছবি। পর্ব্বতের বিবিধ দৃশ্য, ছোট ছোট ঘর বাড়ী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আঁকা বাঁকা রাস্তা, অনুচ্চ মন্দির, যেন পর্ব্বতের গা খুঁদে বের করা হয়েছে। তার পর বৃক্ষলতা, নানারকম সুন্দর সুন্দর ফুল, স্বচ্ছন্দ-চিত্ত গাড়োয়ালীদের নিঃশঙ্ক পদচারণা ও বেশবিন্যাসশূন্য প্রফুল্ল বালক বালিকার ছুটাছুটি বা শাখাপত্রপ্রচুর দীর্ঘ বৃক্ষমূলে জটলা, এ সব দেখে মনে হয় না যে, এ আমাদের সেই বহু প্রাচীন, জ্ঞানবৃদ্ধ, নিয়মবদ্ধ, এবং দুঃখ ও অশান্তিপূর্ণ পৃথিবীরই একটা অংশ। এখানে এসে বাস্তবিকই—

"শুধু জেগে উঠে প্রেম মঙ্গল মধুর,
বেড়ে যায় জীবনের গতি,

ধূলিধৌত দুঃখ শোক শুভ্রশান্ত বেশে
ধরে যেন আনন্দ মূরতি।
বন্ধন হারায়ে গিয়ে স্বার্থ ব্যাপ্ত হয়
অবারিত জগতের মাঝে,
বিশ্বের নিশ্বাস লাগি জীবন কুহরে
মঙ্গল আনন্দধ্বনি বাজে।”

আমরা এখানে এসে যেখানে বাসা নিয়েছিলুম, সেখান হোতে পাণ্ডাদের যেখানে বাস, সেখানে যেতে হোলে একটা সাঁকো পার হোতে হয়; এ সাঁকোটা অলকনন্দার উপর। দেবপ্রয়াগ আবার দু'ভাগে বিভক্ত, বাজারটা ইংরেজদের, আর বাকি সহরটা তিহরীর রাজার। এই অলকনন্দা বৃটিশ গাড়োয়াল ও স্বাধীন গাড়োয়ালের সীমা।

এখানকার পাণ্ডাদের মধ্যে বেশ লেখাপড়ার চলন আছে, তবে এখানে বড় কেউ ইংরেজী লেখাপড়ার ধার ধারে না, হিন্দী ও সংস্কৃতের চর্চ্চা বেশী। কলিকাতার কোন হিন্দী সাপ্তাহিক কাগজ এখানে তিন চারখান আসে। এখানে আমাদের দেশের কাগজ আসে শুনে মনে বড় আনন্দ হোলো; আমার পাণ্ডা আমাকে ঐ কাগজ একখানা এনে দিলে; তাতে আমাদের দেশে শেয়ালের উপদ্রবের খবর পাওয়া গেল, একটা গ্রামে হরিসংকীর্ত্তন হয়েছিল, তার এক দীর্ঘ বিবরণ, আরো কত কি পড়লুম;—পরনিন্দা, পরকুৎসা, এবং সঙ্গে সঙ্গে হরিসভার সটীক বিবরণ পাঠ করে আমার যথেষ্ট উপকার ও প্রচুর আনন্দ হোলো, কিন্তু এ সকল সংবাদে এই পাহাড়ী জাতির কি লাভ, তা অনুমান করা আমার সাধ্যাতীত। বিকেলে পোষ্টমাষ্টার বাবুর কাছে শুনলুম, এদেশে কারো নামে একখানা খবরের কাগজ আসা বিশেষ গৌরবের বিষয়।

দেবপ্রয়াগে প্রায় ৫০০ ঘর পাণ্ডার বাস, কিন্তু এত লোকের বাসের জন্যে আমাদের দেশে যতখানি প্রশস্ত যায়গার দরকার, ততখানি দূরের কথা, সমস্ত গাড়োয়াল রাজ্যে তার অর্দ্ধেক সমতল ভূমি আছে কিনা সন্দেহ। দেবপ্রয়াগে সমতল ভূমি নেই, পাহাড়ের গায়ে যে ঢালু আছে তারই উপর লোকের বসবাস; একটা যায়গা একটু কম ঢালু—সেই খানে এই পাঁচশ ঘর পাণ্ডা বাস কচ্ছে। একটা বাড়ীর মধ্যে হয়ত দশ পনেরটি গৃহস্থের বাসস্থান। বাড়ী গুলি অপ্রশস্ত, ঘরে জানালার সম্পর্কমাত্র নেই, যেন এক একটা সিন্দুক, আলো ও বাতাসকে যতদূর সম্ভব তাদের ভিতর থেকে নির্ব্বাসিত কোরে দেওয়া হয়েছে; কোন কোন বাড়ী তিন চার তলা। রাস্তার ভাল বন্দোবস্ত নেই, কারো ঘরের বারান্দা দিয়ে, কারো ঘরের ভিতর দিয়ে যাওয়া আসা কর্ত্তে হয়। এই ত বাড়ীর অবস্থা – এরই এক এক ক্ষুদ্র কুটীরে এক বৃহৎ পরিবারের বাস। তার মধ্যেই রান্না ঘর, গোরুর ঘর এবং নিজেদের থাক্‌বার বন্দোবস্ত। পা ছটো যেমন জুতো জোড়াটার ভিতরকার সমস্ত স্থানটা অধিকার ক'রে, জলকাদা থেকে আপনাদের বাঁচিয়ে দিব্য স্বচ্ছন্দে বাস করে, এদের এই সংকীর্ণ ঘরে বাসও অনেকটা সেই রকমের। আলাদীনের প্রদীপের দৈত্য যেমন এক রাত্রির মধ্যে এক সুবৃহৎ অট্টালিকা তৈয়ারী কোরেছিল, সেই রকম একটা দৈত্য এসে যদি এই সব ক্ষুদ্র কুটীর ভেঙ্গে এক রাত্রির মধ্যে বড় বড় ঘর তৈয়ারী কোরে দিয়ে যায়, তবে এই পাণ্ডা বেচারীরা তাদের মধ্যে একদিন বাস কোরেই হাঁপিয়ে উঠে।

পাণ্ডাদের ঘর দ্বারের অবস্থা এরকম হোলেও তারা খুব গরীব নয়। দেবিনারায়ণের অনুগ্রহে প্রতি বৎসর এই সময় তারা বেশ দু দশটাকা রোজগার করে, আর তাতেই তাদের সমস্ত বছরটা চলে যায়। হরিদ্বার, কাশী, গয়া, কি অযোধ্যার পাণ্ডারা যে রকম জোর জবরদস্তী কোরে যাত্রীর কাছ থেকে টাকা আদায় করে, এরা সে রকম নয়; আর এরা অল্পেই—

সন্তুষ্ট। মধ্যে মধ্যে এরা নীচে নামে, অনেকে কাশী পর্য্যন্তও যায়; কিন্তু বাঙ্গলা দেশ পর্য্যন্ত এগোয় না! গ্রীষ্মের ভয়েই তারা বাঙ্গলায় যেতে চায় না; হরিদ্বার, হৃষীকেশ প্রভৃতি যায়গা হোতে তারা যাত্রীদের সঙ্গ নেয়। পাণ্ডারা অতি শুদ্ধাচারী, এদের মধ্যে কর্ণাটী, দ্রাবিড়ী, সৌরাষ্ট্রী ও দক্ষিণী ব্রাহ্মণই বেশী। এদেশে মোটেই মুসলমান নেই। পাণ্ডারা মাছ মাংস স্পর্শও করে না; এদের চলন মিতাক্ষরার মতে।

সঙ্গী সন্ন্যাসী দুজন আজ সমস্ত দিন বিশ্রাম করবেন, ঠিক কোল্লেন; আমি বেচারা দিনটা কেমন কোরে কাটাই, ভেবে না পেয়ে বেরিয়ে পড়লুম। অনেকক্ষণ পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়ান গেল, অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ হোলো। আমি খানিক বেড়াচ্চি, খানিক বা একখানা পাথরের উপর বোসে প্রকৃতির শোভা দেখ্‌চি, অস্তমান সূর্য্যের রশ্মিজাল পর্ব্বতের পাশ দিয়ে শ্যামল প্রকৃতির মধ্যে এসে বিকীর্ণ হোয়ে পড়্‌চে। আমার দৃষ্টি কখন ধূসর পর্ব্বত অঙ্গে, কখন সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত জ্যোতির্ম্ময়ী অলকনন্দার উপর। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কতকগুলি পর্ব্বতবাসিনী রমণী এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়ালো; এই নির্জ্জন প্রদেশে আমাকে একা বোসে থাক্‌তে দেখে তারা যে বিস্মিত, তা তাদের চাহনীতেই বেশ বুঝ্‌তে পারা গেল। ধীরে ধীরে সাহস পেয়ে তারা আমাকে দুই একটা কোরে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোল্লে, কেন দেশ ছেড়ে এসেছি, দেশে আমার আর কে আছে, আবার কবে দেশে ফির্‌বো, এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দেখলুম, আমার প্রতি সহানুভূতিতে তাদের হৃদয় আর্দ্র হোয়ে গেল। তারা প্রকাশ্যে আমায় কিছু না বল্লেও তাহাদের মনের ভাব স্পষ্ট বুঝ্‌তে পেরে আমার বড় আনন্দ হলো। এই দূরদেশে আমার মত প্রবাসীর প্রতি মা, বোনের স্নেহের আভাস ভারি প্রীতিকর!

অলকনন্দা ও গঙ্গার সঙ্গমের একটু উপরে বেশ একটু নির্জ্জন জায়গা আছে। বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যার একটু আগে সেখানে গিয়ে একটা

শিলাখণ্ডে বোসে পড়লুম। নদীর কলতানের সঙ্গে প্রাণ ভেসে যেতে লাগ্‌লো। সন্ধ্যা হোতে আর বেশী বিলম্ব নেই, কিন্তু আমার সে জায়গা ছেড়ে উঠ্‌তে ইচ্ছে হোলো না। নদীর দিক্ হোতে মুখ ফিরিয়ে পেছনে চাইতেই দেখি, একটু দূরে ছুটি মেয়ে, বেশ সুন্দর দেখ্‌তে! অরচিতবেশ, চুলগুলো এলোমেলো হোয়ে এদিকে ওদিকে লতিয়ে পড়েছে, হাতে কতকগুলো সুন্দর লতা পাতা ও ফুল ফল। তারা উপর হোতে নেমে আস্‌ছিল। আমাকে দেখে তারা একটু থম্‌কে দাঁড়াল, ছ'জনে কি বলা-বলি কোল্লে, তারপর যে দিক্ থেকে এসেছিল সেই পথে ফিরে যাবার জোগাড় কোল্লে। আমি তাদের সঙ্গে কথা কইবার প্রলোভন কিছুতেই সংবরণ কোর্ত্তে পাল্লুম না! তাদের ডাক্‌তেই তারা ফিরে এল। মেয়ে ছইটির মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত বড়, সে একটু বেশী লাজুক, সলজ্জভাবে পাশের একটা বড় পাথরে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো; আজন্ম পার্ব্বত্য-প্রকৃতির মধ্যে বর্দ্ধিত হোলেও তার লজ্জাশীলতা দেখলুম আমাদের বঙ্গবালিকাদের মতই প্রবল এবং সেই রকম মধুর। ছোট মেয়েটি আমার কাছে এসে দাঁড়ালো; আমি তাদের বাড়ী কোথা, কে আছে, কয় ভাই, কয় বোন প্রভৃতি প্রশ্নে আলাপ আরম্ভ কল্লুম; প্রথমে তাদের কথা কইতে একটু বাধবাধ ঠেক্‌লো, কিন্তু শীঘ্রই সে সঙ্কোচভাব দূর হয়ে গেল। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হোলো, সব কথা মনে নেই, কিন্তু একটা কথা আমার মনে বড় বেজেছিল, তাই সেটা বেশ মনে আছে। আমি যখন তাকে বল্লুম যে, "আমার বাপ নেই, স্ত্রী নেই, ছেলেও নেই," তখন সে তার করুণ ও আয়ত চক্ষু ছটি আমার মুখের উপর রেখে অতি কোমলস্বরে বোল্লে, "লেড়্‌কি ভি নেহি?" কথাটা আমার প্রাণে তীরের মত বিদ্ধ হোলো! আমার একটি "লেড়কি" ছিল, জানিনে কোন্ অপরাধে তাকে তিন বৎসর হারিয়েছি। আজ এই বালিকার একটি কোমল প্রশ্নে সেই সুপ্ত স্মৃতি জেগে উঠ্‌লো, আমার চোখে জল দেখে বালিকার মুখখানি

বিবাদ ! সে যায়গাটুকু যে আপাততঃ সাপ, ব্যাং ইঁদুর বিড়াল ও আবর্জ্জনা ছাড়া আর কারো কোনও কাজে আস্‌তে পারে, এমন সম্ভাবনা আমার একবারও মনে উদয় হয় নি ; কিন্তু তাদের অভিপ্রায় অন্যরকম ! দু'জনেই বলে যে, চিরদিন কিছু এমন অবস্থা থাকবে না, কিছুকাল পরে যদি এই কোঠা ভেঙ্গে নূতন কোঠা তৈয়ের কোর্ত্তে হয়, তবে ঐ যায়গাটায় খুব কাজ দেখবে ; এ দিকে দুই ভাই মিলে যে মোকদ্দমা ফাঁদিয়াছে, তাতে যা কিছু আছে তাও যে যাবে—সে বিষয়ে তাদের বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত নেই। আমরা ছোট ভাইটিকে সেখানে ডাকালুম, দুজনকেই অনেক বোঝান গেল, কিন্তু কেউ বুঝ্‌তে চাইলে না,—আমাদের দেশের শিক্ষিত ভায়েরাই বোঝে না, ত এরা ত অশিক্ষিত পাহাড়ী ! দুই ভায়ের পক্ষেই অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী জুটেছেন ; বড়র পক্ষীয়েরা সাক্ষ্য দেবেন, বাপ মৃত্যুকালে এ জমীটুকু বড় ভাইকেই দিয়ে গেছেন, কারণ বড় ভায়ের পোষ্য অনেক ; ছোটোর পক্ষ হোতে প্রমাণ হবে, এটা মিথ্যে কথা। আমি ভাবলুম এরা ধার্ম্মিক, হয় ত ধর্ম্ম কথায় এদের মন নরম হবে, সুতরাং "যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী" ও "নলিনীদলগত জলবৎ তরলং" প্রভৃতি বড় বড় বাঁধি শ্লোক আউড়ে তাদের মন নরম করবার চেষ্টা কল্লুম, কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী ! —এ বৈষয়িক ব্যাপারে আধ্যাত্মিকতা কিছুতেই খাটিল না। শেষে উভয়ে আমাকে অনুরোধ কল্লে যে, টিহরীর রাজদরবারে বিচার হবে ; যদি কাউন্সিলের কোন মেম্বরের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকে ত তাঁর কাছে একখানা অনুরোধ পত্র দিতে হবে, যেন পুনঃপুনঃ দিন ফিরিয়ে তাদের হয়রাণ করা না হয়, এবং বিচারটা যেন ন্যায়সঙ্গত হয়। আমার দুর্ভাগ্য-ক্রমে টিহরীর রাজদরবারের দুই একজন মেম্বরের সঙ্গে অল্প পরিচয় ছিল, আমি একটা অনুরোধ পত্র লিখে দিলুম যে, যেন এসম্বন্ধে একটু বিশেষ অনুসন্ধান হয়।

১৩ মে বুধবার—আজ খুব ভোরে পাঁচটার আগে উঠে দেবপ্রয়াগ

ছেড়ে চল্লুম। এখন হোতে আমরা বরাবর অলকনন্দার ধার দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লুম। ন'মাইল চলে 'রাণী বাড়ী' চটিতে এসে পৌছান গেল। এ জায়গাটা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বল্‌বার নেই; আমরা বৈকালে রওনা হওয়ার যোগাড় কর্‌লুম, কিন্তু দেখ্‌তে দেখ্‌তে চারিদিক ঘোর করে বেশ মেঘ হয়ে এলো, ঝড় বৃষ্টির মধ্যে যে কষ্ট পাওয়া গিয়েছিল তা বেশ মনে আছে, সেই জন্য আর মেঘ মাথায় কোরে বের হওয়া কারো ভাল বোলে মনে হলো না। এখানে রাত্রিটাও কাটান গেল, রাত্রে বৃষ্টি দেখে মনে হলো, না বেরিয়ে ভালই হয়েছে।

১৪ মে বৃহস্পতিবার—প্রাতে যাত্রা। সাত মাইল চোলে এসে একটা ঝরণার ধারে উপস্থিত হোলুম। ঝরণার উপরে একটা প্রকাণ্ড শিবমন্দির, শিবের নাম "বিল্বকেশ্বর।" আমার সঙ্গী সন্ন্যাসীদ্বয় মন্দিরের মধ্যে শিব দেখে এলেন। সেখানে কিন্তু আমার "প্রবেশ নিষেধ", কারণ সন্ন্যাসীদের পয়সা দিয়ে শিবদর্শন কোর্ত্তে হয় না বটে, কিন্তু গৃহীর পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। ঠিক সে সময় আমার হাতে পয়সা ছিল না, সেও এক কারণ বটে! আর এক বিশেষ কারণ এই যে, এই রকম পয়সা দিয়ে ক্রমাগত ঠাকুর দেখার প্রবৃত্তি আমার বলবতী ছিল না; এই দুই কারণে আমার শিবদর্শন ঘট্‌লো না। ঝরণার জলপানে তৃপ্ত হয়ে আমি এদিক্ ওদিক্ ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লুম। খানিক পরে স্বামীজী শিব দেখে ফিরে এলেন। তাঁর মুখে শুন্‌লুম সেই মন্দিরের মধ্যে পাথরের উপর খুব বড় পায়ের চিহ্ন আছে, পাণ্ডারা তা অর্জ্জুনের পদচিহ্ন বোলে ব্যাখ্যা করে থাকে। শুন্‌লুম, সেই অসাধারণ পদচিহ্নের মধ্যে আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রাণীর তিনখানি পা বেশ পাশাপাশি শুয়ে থাকতে পারে। অর্জ্জুন অত বড় বীর, তাঁর পা আমাদের পায়ের মত হোলে আর তাঁর পদগৌরব থাকে কোথায়? সুতরাং তাঁর পায়ের চিহ্ন খুব জাঁকাল হওয়াই যুক্তিসঙ্গত! এ সব বিষয়ে আমাদের আর্য্যজাতির

খুব বাহাদুরী আছে ; হনুমান বেচারাকে খুব প্রকাণ্ড কোরে আঁকতে হবে, অতএব সূর্য্যকে তার কুক্ষিগত করানো হোলো ; বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সূর্য্যের আকার বিস্তৃততর হয়েছে, সুতরাং হনুমানজীর মহিমার তাতে বৃদ্ধি বই হ্রাস হয়নি। এই রকম কুম্ভকর্ণের নাসারন্ধ্র খুব বড় দেখানো দরকার—অতএব তার এক এক নিশ্বাসে বিশ পঁচিশটে রাক্ষস বানর উদরে প্রবেশ কোরছে, আর বের হোচ্ছে ! কিন্তু তারপর যখন যুক্তি ও তর্কের কাল আসে, তখন এই সমস্ত গাঁজাখুরী গল্পের এক একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রস্তুতের অত্যন্ত দরকার হয়ে পড়ে। তাতে দিনকত চারিদিকে খুব বাহবা পোড়ে যায় বটে, কিন্তু শেষ ফল এই হয় যে, এই সমস্ত গল্পের সেই প্রাচীন স্নিগ্ধ ভাবগুলিও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় এবং তা হোতে একটা নূতন সত্য আবিষ্কারের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে পড়ে। এই সমস্ত কথা চিন্তা করতে করতে আরো দু'মাইল চ'লে এসে গাড়োয়ালের রাজধানী শ্রীনগরে প্রবেশ করা গেল।

শ্রীনগর

১৪ই মে, বৃহস্পতিবার। বেলা প্রায় এগারটার সময় গাড়োয়ালের প্রধান নগর শ্রীনগরে উপস্থিত হওয়া গেল। ভারতবর্ষের উত্তরে দুই শ্রীনগর আছে ; এক হচ্ছে ভূস্বর্গ, কবিতা ও কল্পনার চিরলীলানিকেতন, সমগ্র হিমালয় প্রদেশের রম্য কুঞ্জকানন কাশ্মীররাজধানী, আর অন্যটি এই গাড়োয়ালের প্রধান নগর। কাশ্মীর রাজধানীর তুলনায় এ শ্রীনগর অবশ্য অনেকটা হীন, কারণ এখানে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যই আছে, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য বেশী কোরে ফুটিয়ে তোলার জন্যে কোন আয়োজন এখানে হয় নি, কিংবা মানবের রুচি এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার জন্যে কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে নি। কিন্তু তবু এ সৌন্দর্য্যের

মধ্যে একটা মহান গম্ভীর ভাব আছে, তা শুধু প্রাণ দিয়েই অনুভব করা যায়। চারিদিকে হিমালয়ের অসমান শৃঙ্গ আকাশ স্পর্শ করার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে, মধ্যে গঙ্গা ও অলকনন্দা নির্ম্মল জলপ্রবাহে উপলখণ্ড ধুয়ে চলে যাচ্ছে; দুই একটা জায়গায় বড় বড় প্রস্তরস্তূপ পোড়ে, তাদের গতি ব্যাহত করবার চেষ্টা কোরছে। সেখানে তাদের বেগ বড়ই ভয়ানক; নির্ম্মল তরল প্রবাহ বটে, কিন্তু তাদের গতি কে রোধ করতে পারে? নদীর পাড়ে এবং অসমতল পর্ব্বত উপত্যকায় নানা রকমের গাছ। ফুলের গাছ যে কত, তার সংখ্যা নেই; কোথাও রাশি রাশি ইট ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হোয়ে রয়েছে, একরাশ সতেজ লতা তাদের জড়িয়ে ধরে—বেশীর ভাগ জায়গা সবুজ পাতায় ঢেকে—আশপাশের দু'পাচটা গাছকে তাদের "ললিত লতার বাঁধনে" বাঁধবার চেষ্টা কোচ্ছে। তার অল্প দূরেই শ্রীনগরের পূর্ব্ব গৌরবের লুপ্ত চিহ্ন পুরাণো রাজবাড়ীর ভগ্নাবিশেষ, আর স্থানে স্থানে নানা শিল্পকার্য্যবিশিষ্ট প্রাচীন দেবালয়। শ্রীনগরের দৃশ্য-শোভার মধ্যে মোটেই বিলাসের ভাব নেই। এখানে আমি এমন একটা জায়গা দেখেছি বোলে মনে হয় না, যেখানে নদীতীরে, জ্যোৎস্নাপুলকিত, কুসুমসুরভিপ্লাবিত রাত্রে নৈশবায়ুহিল্লোলিত লতাকুঞ্জে নায়ক নায়িকা পরস্পরের হৃদয়াবেগ ঢেলে দিয়ে তৃপ্তি অনুভব করতে পারেন। সমস্ত স্থানটা যেন যোগীঋষির তপ যপের পক্ষেই একান্ত উপযোগী। হৃদয়ে শান্তি আনে, প্রেমের চাঞ্চল্য জাগায় না।

আমরা শ্রীনগরে প্রবেশ কোরে একটা ছোট পরিচ্ছন্ন দোতালা ঘরে বাসা নিলুম। হরিদ্বার ছেড়ে অবধি যত জায়গা দেখেছি তার মধ্যে শ্রীনগরকেই সহর বলা যায়। পর্ব্বতের মধ্যে এতদূর বিস্তৃত সমভূমি আর কোথাও দেখি নি। অন্য যে সমস্ত নগর দেখেছি, তার কোনটা পর্ব্বতের গায়ে, কোনটা বা তিনচার বিঘে সমভূমির উপর, কিন্তু শ্রীনগর ষোল বিঘে কি তার চেয়ে বেশী সমতল জায়গা দখল কোরে আছে। বাজারের

সমস্ত দোকানই প্রায় কোটাঘর। দোকান বিস্তর, আর সে সকল দোকানে নানা রকম জিনিস পাওয়া যায়; এমন কি নিকটে আর কোন জায়গায় যে সকল জিনিস দেখা যায় না, এখানে তাও পাওয়া যায়। আর এই জন্যই সমস্ত গাড়োয়ালের লোক এখান থেকে দরকারী জিনিস কিনে নিয়ে যায়। তবে এদেশের লোকের দরকারী জিনিসের সংখ্যা নিতান্ত কম—লবণ, লঙ্কা, আটা ও কাপড় হোলেই সকলের বেশ চলে যায়; এগুলি ছাড়া আর সমস্ত জিনিসই বিলাসের উপকরণ বোলে সাধারণের বিশ্বাস। বাজারে যে পঞ্চাশ যাটখানা দোকান আছে, তার প্রায় সকলগুলিই হিন্দুর—দুই একখানামাত্র মুসলমানের দোকান। শ্রীনগরের এই দুই একঘর মুসলমান দোকানদার ছাড়া সমস্ত গাড়োয়ালে আর মুসলমান অধিবাসী নেই।

শ্রীনগরে পৌঁছে বাসাভাড়া করার পর সেখানে পরিচিত যে দুই এক জন লোক ছিলেন, তাঁদের কাছে আমাদের শুভাগমন সংবাদ পাঠান গেল। তাঁরা অবিলম্বে আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত হোলেন এবং আমাদিগকে তাঁদের বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে যথোচিত পীড়াপীড়ি আরম্ভ কল্লেন; কিন্তু আমি তাঁদের বল্লুম এখানে আমরা এক রাত্রি মাত্র থাক্‌বো, বাসাতেই আহারাদির আয়োজন করেছি; অতএব এখন আর কোথাও নড়াচড়া না কোরে বদরীনারায়ণ হোতে ফেরবার সময় এদিক দিয়ে যাব; এই কথায় বন্ধুবর্গকে তখন বুঝাইয়া স্থির করা গেল। আহার বিশ্রামের পর বিকেলে সহর দেখ্‌তে বের হোনুম। শ্রীনগরে দর্শন-যোগ্য স্থানের বিবরণের আগে, উপক্রমণিকায় তার একটু ইতিহাস দেওয়া দরকার, কারণ ইতিহাসের সঙ্গে তার একটু সম্বন্ধ আছে।

অনেকদিন আগে একবার নেপালের রাজা গাড়োয়ালরাজ্য আক্রমণ করেন। গাড়োয়ালের রাজা যুদ্ধে পরাস্ত হন এবং পর্ব্বতে পলায়ন করেন। এই সময় হোতে গাড়োয়াল নেপালেরই অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু এই

সময়ে এখানে কি রকম শাসনপ্রণালী অবলম্বন করা হোয়েছিল, তার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে রাজপ্রাসাদ ও দুর্গে নেপালীদের অত্যাচারের চিহ্ন আজও বেশ দেখা যায়! যাহোক, গাড়োয়ালরাজ উপায়ান্তর না দেখে ইংরেজের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন কল্লেন এবং তাঁদের সাহায্যে গাড়োয়াল স্বাধীন হোলো; কিন্তু এই স্বাধীনতা প্রায় অর্দ্ধেক গাড়োয়ালের পরিবর্ত্তে ক্রীত হ'য়েছিল, কারণ যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ গাড়োয়ালের অনেকখানি অংশ ইংরেজরাজ গ্রহণ করেন;—এই অংশের নামই বৃটিশ গাড়োয়াল, আর অবশিষ্ট অংশের নাম স্বাধীন গাড়োয়াল; তবে নেপাল বা ভোটের মত স্বাধীন নয়। যাঁরা অনুগ্রহ কোরে পরের হাত থেকে রাজ্য জয় করে দিলেন—আবশ্যক হলে যে তাঁরা তা কেড়ে নিতেও পারেন, একথা বলাই বাহুল্য। তবে এ রকম অবস্থায় যতখানি স্বাধীনতা থাকার সম্ভাবনা, গাড়োয়ালের তা যথেষ্ট আছে। আর স্বাধীন গাড়োয়ালের আর একটু ভরসা এই যে, তাতে প্রলোভনের এমন কিছুই নেই, যে জন্যে এদেশে দেশীয় পাগড়ীর পরিবর্ত্তে রাতারাতিই ইংরেজের টুপী ও চুড়ির আমদানী হোতে পারে; বরং প্রলোভনের যে টুকু ছিল, সে টুকুর আপদ্ অনেক আগেই চুকে গেছে। নেপালের কবল থেকে গাড়োয়াল উদ্ধার কোরে ইংরেজ গাড়োয়ালের উৎকৃষ্ট অংশটুকুই অধিকার কোরেছেন।

অলকনন্দার পূর্ব্ব পার ইংরেজের অধিকার, পশ্চিম পার গাড়োয়াল রাজ্য বা টিহরীর রাজার সীমানা। দেবপ্রয়াগে অলকনন্দা গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে; সুতরাং গঙ্গার পূর্ব্ব পার ইংরেজের, পশ্চিম অংশ টিহরীর রাজার। হরিদ্বার ও হৃষীকেশ যদিও গঙ্গার পশ্চিম পারে, কিন্তু তা ইংরেজের অধিকারে; ওদিকে মসুরী ও ল্যাণ্ডর সহরও ইংরেজের। ল্যাণ্ডরের পূর্ব্বপ্রান্তের একটা রাস্তা হোতেই টিহরীর সীমানা আরম্ভ। মসুরী ও ল্যাণ্ডর আগে টিহরীর রাজারই ছিল, পরে গবর্ণমেণ্ট তা

কিনে নিয়েছেন। টিহ্‌রীর রাজা মাটীর দরে পর্ব্বতের যে জঙ্গলময় অংশ বেচেছিলেন, কে জান্‌তো যে কয়েক বছর পরে সেখানে মহাসমৃদ্ধ দু'টি নগর স্থাপিত হবে এবং তা ভারতের শ্রেষ্ঠ বিলাসীদের জন্যে গ্রীষ্মকালের বিরামকুঞ্জে পরিণত হবে ?

নেপালরাজ গাড়োয়াল আক্রমণ করবার পর—গাড়োয়ালরাজ রাজ্য ত্যাগ করে পলায়ন কোল্লেন। নেপালীরা অরক্ষিত প্রাসাদ ও সুরমা রাজপুরী সম্পূর্ণরূপে শ্রীভ্রষ্ট করে ফেলেছিল। পরে ইংরেজের সহায়তায় যখন গাড়োয়াল পুনর্বিজিত হোলো, তখন গাড়োয়ালের রাজা আর শ্রীনগরে ফিরে এলেন না; তিনি শ্রীনগর হোতে বত্রিশ মাইল উত্তরপশ্চিমে অলকনন্দার অপর পারে টিহ্‌রীতে পলায়ন কোরেছিলেন;—সেই যায়গাটা সুন্দর ও সুরক্ষিত দেখে সেইখানেই তিনি বাস কোর্ত্তে লাগ্‌লেন। শ্রীনগর ইংরেজরাজ্যের অধিকার ভুক্ত হোয়ে বৃটিশ গাড়োয়ালের প্রধান নগর রূপে পরিণত হোলো। তা হোলো বটে, কিন্তু ইংরেজের কাছারী সেখানে রৈল না; শ্রীনগর হতে ৬ মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে "পাউড়ি"তে কমিশনর সাহেবের পীঠস্থান হোলো; একটা রেজিমেণ্টের আড্ডা পড়লো, এবং আফিস আদালত সমস্তই সেখানে স্থাপিত হোলো; কেবল ডাক্তার খানা শ্রীনগরে। "পাউড়ী"র কাছারী বাড়ী ও সাহেবদের বাড়ী তৈয়ারীর জন্যে গাড়োয়াল রাজের বহুমূল্য সুন্দর প্রাসাদের অনেক ভগ্নাবশেষ সেখানে চালান হোয়েছে। "পাউড়ী"তে একবার যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে যাওয়া হয় নি।

আমার বন্ধু পণ্ডিত হরিকিষণ অপরাহ্নে আমাদের সঙ্গে নিয়ে প্রথমেই ডাক্তারখানায় গেলেন। ডাক্তারখানায় অনেকগুলি রোগী দেখা গেল। ডাক্তারবাবু বাঙ্গালী কায়স্থ, বাড়ী কলিকাতার বাগবাজারে। তিনি এখানে সপরিবারে বাস কচ্চেন্। এই পর্ব্বতের মধ্যে একঘর বাঙ্গালী ভদ্রলোক গৃহস্থ দেখে ভারি প্রীতি হোলো। তাঁর সুন্দর, প্রফুল্ল ছেলে মেয়ে

গুলি দেখে বোধ হোল, আমরা আবার যেন বাঙ্গালা দেশে ফিরে এসেছি। ডাক্তার বাবু আমাদের যথেষ্ট যত্ন কোল্লেন, এবং তাঁর বাসাতেই থাকবার জন্য বিশেষ অনুরোধ কল্লেন। তাঁর যত্ন ও আগ্রহে আমরা খুব সন্তুষ্ট হোয়ে ডাক্তারখানা পরিদর্শন কোর্ত্তে বের হলুম। গবর্ণমেণ্টের সাধারণ ডাক্তারখানায় রোগী সম্বন্ধে সচরাচর যে রকম বন্দোবস্ত হয়ে থাকে, এখানেও সেই চিরাগত নিয়মের কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না; সুতরাং সেখানে আর বেশী সময় না কাটিয়ে পুরাতন রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখ্‌তে গেলুম। গিয়ে দেখি সে এক লঙ্কাদগ্ধের ব্যাপার! রাশি রাশি ইট আর পাথর স্তূপাকারে পড়ে আছে,—আর যদি দুই এক বছর পরে কোন পর্য্যটক এখানে আসে, ত এই স্তূপাকৃত ইট পাথরকে সুশ্যামল শৈবাল সজ্জিত দেখে একটা ছোট খাট গিরিশৃঙ্গ বলে মনে কোর্‌বে। সেই নীরস, অনাবৃত পাহাড়ের বুকে ভগ্ন প্রাসাদের বড় বড় দেয়াল গুলো হাঁ কোরে রয়েছে; তার খানিকটে তফাতে একটা পাথরের প্রকাণ্ড সিংহদ্বার—বহুকাল হোতে এমনি অসহায় অবস্থায় ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে যুদ্ধ করে কাৎ হোয়ে পড়েছে এবং এই অবস্থাতেই আরো কয়েক বছর ঝড়বৃষ্টির প্রকোপ সহ্য করার দুঃসাহস প্রকাশ কোচ্চে। এক ধারে একটা ভাঙ্গা মন্দির, বহুদিন আগে তার দরজা জোড়া একদল ধর্ম্মধ্বজী নেপালী এসে তুলে নিয়ে গিয়েছে; বোধ করি তা দিয়ে পশুপতিনাথের কোন মন্দিরের সিঁড়ী তৈয়ারী হয়েছে; আমরা সেই পুরাণো রাজবাড়ী ঘুরে ফিরে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। অনেক দূরে একটা বড় মন্দির; পাথরে নানা রকম দেবদেবী মূর্ত্তি; সমস্ত হিন্দুদেবমূর্ত্তি কিনা ঠিক বুঝ্‌তে পাল্লুম না,—বুঝ্‌বার জন্যে তেমন চেষ্টাও করি নি। একটা যায়গায় দেখ্‌লুম শ্রীযুৎ গজানন মহাশয়—তিনিই দেবতাকুলে সব চেয়ে নিরীহ—হস্তচতুষ্টয়ে গদা ও তীরধনুক নিয়ে মহাতেজে অগ্রসর হচ্ছেন।—এই নিরীহ কেরাণী দেবতাটীর এই যুদ্ধ সাজ বড়ই অমানান দেখাচ্ছিল; মহাভারতে

ত কোথাও গণেশের এতটা বীর পরাক্রম প্রকাশের কারণ উল্লেখ দেখা যায় না, তবে যদি অন্য কোন পুরাণে এ সম্বন্ধে কিছু থাকে, তা হোলে একটা কথা বটে। কতকগুলি দেবতার চেহারা চক্ষে একটু নূতন ঠেকলো; তেত্রিশকোটির মধ্য হতে তাঁদের চিনে নেওয়া আমার মত লোকের পক্ষে বিলক্ষণ কঠিন ব্যাপার! তবে এটা মনে হোলো যে, যদি সেগুলি হিন্দু দেবমূর্ত্তি না হয়, তবে নিশ্চয়ই বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তি হবে, কারণ নেপালীরা যখন এখানে ছিল, তখন তারা যে দুই এক জায়গায় নিজেদের ভাস্কর বিদ্যা প্রকাশ করে নি, এ কখন সম্ভব নয়। একটা চক এখনো বর্ত্তমান আছে, শুনলুম তার ভিতরে সাপ, বাঘ ও ভালুকের চিরস্থায়ী আড্ডা হোয়েছে। দেখ্‌লুম, তার ফকোরের মধ্যে রাজ্যের পাখী বাসা কোরেছে; তার ভিতরে দুই একটা ফাটল দিয়ে বড় বড় অশ্বত্থ গাছ মাথা তুলেছে। এইসমস্ত দেখে শুনে চকের মধ্যে আর প্রবেশ কোর্‌তে সাহস হোলো না।

চকের সম্মুখেই নহবতখানা। এটা এখনো ঠিক আছে, কোন দিক্ আজও ভেঙ্গে পড়ে নি! আমাদের সঙ্গী একটা ছোকরা ভিতরে গিয়ে কোন দিক্ দিয়ে একেবারে নহবতের চূড়ায় উঠে বোসলো। শুনা গেল উপরে উঠবার রাস্তা সহজে চিনে নেবার যো নেই। যারা সে রাস্তা বেশ চেনে তারাই সহজে উপরে উঠ্‌তে পারে। আবার তার ভিতরে হারানও নাকি খুব সহজ, কিন্তু তাতেও আমরা উপরে উঠ্‌বার ঝোঁক ছাড়ি নি, শেষ যখন শুনলুম, তার ভিতর বহুজাতীয় সর্পবংশের নির্ব্বিবাদ বংশবৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হচ্ছে, তখন আমাদের প্রবল ঝোঁক অবিলম্বে ছেড়ে গেল। বেলা যায়; সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণ এসে প্রাসাদের ছাদহীন উন্মুক্ত প্রাচীরের গায়ে হেলে পড়েছে; —চোখে বড় খট্‌কা লাগ্‌লো। এই অতীত কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ ও মনুষ্য গৌরবের অসারতার চিহ্নের উপর অমানিশার গাঢ় অন্ধকার যবনিকাই সম্পূর্ণ উপযোগী।

এখান হোতে আমরা কেদারনাথ মহাদেব দেখ্‌তে গেলুম। কাশীর বিশ্বেশ্বরের আকার ও কেদারনাথের আকার অনেকটা এক রকম; একটির অনুকরণে যেন আর একটী তৈয়ারী হয়েছে, কিন্তু কোন্‌টি "ওরিজিনাল" তা স্থির করা বড় কঠিন। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মাথায় কলসী বা ঘটী কোরে জল ঢাল্‌তে হয়, কিন্তু এখানে কেদারনাথের মাথায় হিমালয় একটি ঝরণা উৎসর্গ কোরে দিয়েছেন; তা হোতে অবিরাম অবিশ্রাম জল পোড়ে কেদারনাথের মাথা ঠাণ্ডা হচ্ছে। কেদারনাথের মন্দির অলকনন্দার ঠিক উপরে; মন্দিরের কোন রকম জাঁকজমক নেই। কাছেই একঘর সেবাইতের বাড়ী, তার অবস্থা দেখেই দেবতার আর্থিক অবস্থা বেশ অনুমান কোরে নিলুম। উভয়েই দেখলুম কোন উপায়ে দুর্ভিক্ষের হাত হোতে আত্মরক্ষা কোরে আপনাদের সম্মান ঘোষিত কোচ্ছেন। এখান হোতে ফিরে বাজারে এলুম; দেখ্‌লুম ভিন্ন ভিন্ন দোকানে নানারকম জিনিস খরিদ বিক্রী হচ্ছে। আমরা সন্ন্যাসী বটে, কিন্তু তাই বোলে ভাল জিনিসের প্রলোভন ত্যাগ করার সংযম কিছুই শিখি নি; কাজেই আমাদের খানিকটা সময় জিনিসপত্রের দরদাম কোর্তেই কেটে গেলো। বৈরাগ্য ধর্ম্ম অবলম্বন কোরে সন্ন্যাসী হোয়ে বেরিয়েছি, তখনো দর কচ্ছি "না বাপু তিন পয়সা হবে না, দুপয়সা পারে, দাও"—এবং দুপয়সায় যখন তা পাওয়া গেল, তখন যেই একজন বল্লে, "ওটার এক পয়সা দাম হওয়াই উচিত ছিল"—অমনি এক পয়সা ঠকিচি মনে কোরে আমাদের দীর্ঘকালের এত আদরের সন্ন্যাস এক পয়সার চিন্তাকে জড়িয়ে তার পুনরুদ্ধারের পথ খুঁজ্‌তে ব্যগ্র হোয়ে উঠ্‌লো। সুধু আমরা নই, এরকম সন্ন্যাসী বিস্তর। আমার মনে পড়ে, অনেক দাম দিয়ে আমরা এখানে তিনটে গোল বেগুণ কিনেছিলুম। বাজারে একবার পানের অনুসন্ধান করা গেল, কিন্তু তা পাওয়া গেল না; শীতকালে মধ্যে মধ্যে এখানে পানের আমদানী হয়, কিন্তু বছরের অন্য কোন সময়ে তা পাওয়া কঠিন।

এখানকার বাজারের রাস্তাগুলি সমস্তই বাঁধান। সব রাস্তা পরিসরে তেমন বড় নয়, তবে একটা ... চওড়া আছে। বাজারের মধ্যে দিয়ে যেতে স্কুল দেখ্‌লুম। স্কুলটিতে মাইনর পর্য্যন্ত পড়ান হয়। এটা খৃষ্টান মিসনরীদের স্কুল; স্কুলের লাগাও হেড্‌মাষ্টারের বাসা। হেড্‌-মাষ্টারের বাড়ী এই দেশেই; আগে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, এখন খৃষ্টান হোয়েছেন। "ইয়ং বেঙ্গল"দের যে সকল গুণ সচরাচর দেখা যায়, এ লোকটীতে তার কিছুরই অভাব দেখ্‌লুম না। বেশ মিষ্টভাষী, সদালাপী। তিনি খৃষ্টান বটে, কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মে তাঁর যে কিছু আস্থা আছে, তা বোধ হোলো না। ধর্ম্ম একটা থাক্‌লেই হোলো, এই রকম যেন তাঁর মনের ভাব; তবু যে কেন তিনি খৃষ্টান হোয়েছেন, তা আমি বুঝ্‌তে পারলুম না। যদি পূর্ব্ব ধর্ম্ম বদলিয়ে নূতন কোন ধর্ম্ম অবলম্বন কোর্ত্তে হয় ত আমাদের এই নবাবলম্বিত ধর্ম্মের উপর প্রবল আগ্রহ থাকা উচিত যার বলে আমরা পাপ ও অন্যায়ের খানিকটে উপরে উঠ্‌তে পারি। তা না কোরে যদি "যথাপূর্ব্ব তথাপর" রকমেই কাল কাটাই, তবে ধর্ম্ম-বদলানও যা, না বদলানও তাই। অনেক কথাবার্ত্তার পর মাষ্টারজির নিকট হোতে বিদায় নিয়ে আমরা সকলে বাসায় ফিরে এলুম।

তখন সন্ধ্যা হোয়ে এসেছে। আমার সঙ্গী সন্ন্যাসীদ্বয় আর "পাদমেকং ন গচ্ছামি" বোলে বোসে পড়্‌লেন। চারিদিকে এত সুন্দর দৃশ্য, আর চাঁদের উজ্জ্বল শুভ্র আলোকে তা এমন মধুর দেখাচ্ছিল যে, এমন চুপ কোরে ঘরে পড়ে থাকা আমার কিন্তু কিছুতেই পুষিয়ে উঠ্‌লো না। পণ্ডিত হরিকিষণের সঙ্গে আবার বের হোয়ে পোড়্‌লুম। পণ্ডিতজির সঙ্গে আমার এই নূতন পরিচয় নয়,—কিছুদিন আগে তাঁর সঙ্গে প্রায় এক বৎসর কাটিয়েছি। তাঁর পূরো নাম শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিকৃষ্ণ দুর্গাদত্ত রুরোলা। তাঁর পাণ্ডিত্য অসাধারণ; কিন্তু পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তাঁর কবিত্ব-শক্তি অনেক বেশী ছিল। তিনি তাঁর প্রণীত একখানা কবিতাপুস্তক

[মো]ক্ষমূলরকে উপহার পাঠিয়েছিলেন। মোক্ষমূলর প্রত্যুত্তরে লিখেছিলেন, "আমি যদি মৃত্যুর পূর্ব্বে এই প্রকার কবিতার একটি লাইনও লিখিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে জন্ম সফল মনে করিব।"—অবশ্য এতে অধ্যাপকবরের যথেষ্ট বিনয় প্রকাশ হয়েছে; কিন্তু যাঁর কবিতা পোড়ে তিনি এ রকম একটা মন্তব্য প্রকাশ কোরেছেন, তাঁর প্রতিভাও প্রশংসনীয়। আজ নির্জ্জন পথে এই জ্যোৎস্না রাত্রে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক দিনের অনেক পুরাণো কথা উঠ্‌লো। পশ্চিমদেশে দুই ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছে,—এক দল হিন্দু, আর এক দল আর্য্য। হিন্দুর দল আমাদের দেশের মত; তাঁদেরও 'হরিসভা' আছে, তবে সে সভার নাম 'ধর্ম্মসভা'। ধর্ম্মসভা অর্থ "হিন্দুধর্ম্মসভা," কিন্তু আমাদের দেশের হরিসভার অপেক্ষা এই ধর্ম্মসভার আলোচনার প্রসর একটু বিস্তৃততর। আমাদের দেশের হরিসভায় হরি-নাম কীর্ত্তন, পুরাণাদি পাঠ ইত্যাদিই হোয়ে থাকে; বড় জোর বাৎসরিক উৎসবের সময় কোন কোন সনাতন-ধর্ম্মপ্রচারক বক্তৃতা উপলক্ষে সেই পবিত্র সভায় দাঁড়িয়ে অন্য ধর্ম্মের বাপান্ত করেন। কিন্তু পশ্চিমের ধর্ম্ম-সভায় এ সমস্ত ছাড়াও অনেক বিষয়ের আলোচনা হয়। 'ধর্ম্মসভার' প্রতিদ্বন্দ্বী সভার নাম 'আর্য্যসমাজ'—এই সমাজ দয়ানন্দস্বামীর প্রতিষ্ঠিত। আর্য্যসমাজিগণ শুদ্ধ বেদের অনুমোদন কোরে চলেন এবং বেদ অভ্রান্ত বোলে মনে করেন। তাঁদের মধ্যে জাতিভেদ নেই, পৌত্তলিক ক্রিয়া কর্ম্মও তাঁরা মানেন না। ইংরেজী লেখাপড়া জানা এবং উদার মতাবলম্বী প্রায় অধিকাংশ লোকেই আর্য্য। আর্য্যদের সঙ্গেই আমাদের কিছু বেশী মেশামিশি ছিল; তবে পণ্ডিত হরিকিষণ ধর্ম্মসভার সম্পাদক ও একজন দিগ্বিজয়ী বক্তা হোলেও তাঁর সঙ্গেও আমার বেশ বন্ধুতা হয়েছিল। যখন দেরাদূনে ছিলুম, তখন এই দুই দলের তর্ক বিতর্ক ও বক্তৃতার জ্বালায় তিষ্ঠান ভার হোত। সে সমস্ত বক্তৃতায় শাস্ত্র কথা থাক্ না থাক্, প্রতিপক্ষের উপর তীব্র বাক্যবাণ বর্ষণ কোর্‌তে উভয়

দলই সমান মজবুদ্। একবার আমি আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ এই রকম একটা সভায় গিয়ে পড়েছিলুম। সেদিন আমাদের পণ্ডিতজি বক্তৃতা কোরবেন -অপর পক্ষে আর্য্য সমাজের একজন প্রচারক বল্‌বেন। সভায় উপস্থিত হোয়ে দেখি কুরুপাণ্ডবের মত দুদল দুদিকে সার দিয়ে বসে গিয়েছেন; আমরা কোন্ দিকে বসি প্রথমে ত এই ভাবনাতেই অস্থির—শেষে কিছু ঠিক কোর্ত্তে না পেরে বক্তার টেবিলের সুমুখে বোসে পড়লুম। বক্তৃতা হিন্দীতে নয়, বিশুদ্ধ সংস্কৃতে; বেদ বা ধর্ম্মশাস্ত্র নিয়ে যাঁরা তর্ক করবার স্পর্দ্ধা রাখেন, সংস্কৃতে তাঁদের বেশী দখল থাকাই কর্ত্তব্য, তবে আমাদের বাঙ্গালী প্রচারক মহাশয়েরা সেটা অনাবশ্যক মনে করেন। সভায় প্রথমে একজন কোরে বক্তৃতা কোল্লেন, শেষে বোসে বোসে উভয়পক্ষে ঘোর তর্ক আরম্ভ হোলো; সুর পঞ্চম ছেড়ে সপ্তমে উঠ্‌ল, তার পরেই হাতাহাতির জোগাড়। বেগতিক দেখে আমি পলায়নের পথ খুঁজ্‌তে লাগলুম। কিন্তু এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব কারণে হঠাৎ সভা ভেঙ্গে গেল। তর্ক কোর্ত্তে কোর্ত্তে আর্য্যসমাজের একজন বক্তা তাঁর বক্তৃতার মধ্যে একটা ব্যাকরণ অশুদ্ধ কথা প্রয়োগ করেছিলেন,—তাই শুনে হিন্দুসভার দল হো হো কোরে চীৎকার কোরে উঠ্‌ল—এবং হাত তালি দিয়ে "ব্যাকরণ নেহি জান্তা, বেদবিচার করনেকো আয়া" বোলে সভা ভেঙ্গে দিলে। এই রকম হঠাৎ সভাভঙ্গ না হোলে সেদিনকার প্রচারকার্য্য হয়ত শ্রীঘর পর্য্যন্ত পৌঁছিত। এরকম ঘটনা আমাদের দেশেও খুব বিরল নয়। অনেকদিন পরে পণ্ডিত হরিকিষণের সঙ্গে দেখা হওয়াতে দুই সমাজ কি রকম কাজ কোরছেন, এ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা কল্লুম। কথাবার্ত্তায় অনেক সময় কেটে গেল, আমরাও এক পা দু পা কোরে কমলেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত হোলুম।

কমলেশ্বর শ্রীনগরের খুব নিকটে, এমন কি এক মাইলের মধ্যে কমলেশ্বরের নাম আগেই শুনেছিলুম; ভেবেছিলুম,—হয় ত পাহাড়ের

পার একটা শিবমন্দির ছাড়া এখানে আর কিছু নেই; কিন্তু কাছে এসে বুঝ্‌লুম, এ শুধু মন্দির নয়, একটি ছোটখাট রাজবাড়ী। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত সিংহদ্বার। দ্বারে "ভীষণ মুরতি" দ্বারবান; তাদের মুখে বিনয়ের অভাব এবং ঔদ্ধত্যের ভাব দেখে স্বতঃই মনে হয় এরা দেবমন্দিরের সংস্পর্শে আসবারও সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। চারিদিকের ব্যাপার দেখে বুঝ্‌লুম, এটা কখন সন্ন্যাসীর আশ্রম নয়। মঠধারী যদিও সন্ন্যাসী, কিন্তু ত্রিসীমানায় সন্ন্যাসের কিছুই নজরে পড়ে না; সুতরাং তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথের মহান্ত মহারাজাদের কথা আমার মনে হোলো; তাঁরাও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, এবং যদিও তাঁরা সন্ন্যাসী, তবু যে রকম বিলাস-লালসা ও প্রলোভনের মধ্যে তাঁরা চিরজীবন ডুবে থাকেন, তাতে তাঁদের সন্ন্যাসধর্ম্মের বর্ণপরিচয়টুকুও হয় কি না সন্দেহ। এই কমলেশ্বরের মহান্ত সম্বন্ধেও আমার এই রকম একটা বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেল; কিন্তু ভিতরের ব্যাপার জানবার জন্যে আমার বিশেষ কৌতূহলও হোলো। আমরা সিংহদ্বার পার হোয়ে প্রকাণ্ড একটা দ্বিতল চকের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হোলুম; সেই প্রাঙ্গণের এক পাশে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত লোহার গরাদে দেওয়া এক অনতিদীর্ঘ শিবমন্দির. মন্দিরের মধ্যে মহাদেব লিঙ্গমূর্ত্তিতে বিরাজমান। মন্দিরের বাইরে একটা প্রকাণ্ডকায় পিতলের ষাঁড়। প্রাঙ্গণটী পাথরে বাঁধান; পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, অতিথি, অভ্যাগত ও যাত্রী-দলে সেই প্রাঙ্গণ এবং টানা বারান্দাগুলি পরিপূর্ণ। আমরা গিয়ে শুন্‌লুম, আরতির সময় হয়েছে, তাই এত জনতা; অন্যান্য দর্শকের মত আমরাও একপাশে দাঁড়ালুম; অবিলম্বে ঠাকুরের আরতি আরম্ভ হোলো।

হঠাৎ চারিদিকে "তফাৎ তফাৎ" শব্দ পড়ে গেল। বুঝ্‌লুম, মহান্ত বাবাজী আস্‌ছেন। তাঁর আগে তিনচারজন চাকর উগ্রমূর্ত্তিতে দর্শকদের তফাৎ কোর্‌ত্তে লাগলো। একজন বৃদ্ধা একটী ছোট ছেলের হাত ধোরে আরতি দেখ্‌তে এসেছিল, মহান্ত বাবাজীর পরিচারকদের ধাক্কায় ছেলেটি

দর্শকগণের পায়ের তলায় পোড়ে গেল। বৃদ্ধা ভয়ে চীৎকার কোরে উঠ্‌ল, সেই ছেলেটীই তার অন্ধের নয়ন, বার্দ্ধক্যের যষ্টি। পরিচারকদিগের এই নিষ্ঠুর আচরণ দেখে, মহান্ত বাবাজী যে কিছু অসন্তুষ্ট বা দুঃখিত হোলেন, তা বোধ হোলো না। তিনি কমলেশ্বরের সেবাইত; তাঁর পথের সম্মুখে দাঁড়ালে, এ রকম দু পাঁচটা খুন জখম হওয়া যেন নিতান্তই স্বাভাবিক। মহান্তের এ রকম ভাব দেখে মনটা, বড়ই অপ্রসন্ন হয়ে উঠ্‌লো। পুরোহিত রঘুপতির আস্ফালন ও স্পর্দ্ধায় নিরাশ-ক্ষুব্ধ গোবিন্দমাণিক্যের মত আমারো মনে হোলো—

"এ সংসারে বিনয় কোথায়? মহাদেবী,
যারা করে বিচরণ তোমার চরণ-
তলে, তারাও শেখে নি কত ক্ষুদ্র তারা!
তোমার মহিমা হরণ করিয়ে লয়ে
আপনার দেহে বহে, এত অহঙ্কার!"

যা হোক যখন এসেছি, তখন শেষ পর্য্যন্ত দেখে যাওয়াই ঠিক কোরে দাঁড়িয়ে রইলুম। মহান্ত প্রথমে কমলেশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম কোল্লেন, তারপর যতক্ষণ আরতি হোলো ততক্ষণ ধোরে মন্দির প্রদক্ষিণ কোল্লেন, অন্যান্য অনেক দর্শকও দূরে থেকে মন্দির প্রদক্ষিণ কোর্ত্তে লাগ্‌লো। আরতি শেষ হোলে মহান্ত ভিতরে প্রবেশ কল্লেন। পণ্ডিতজি বোল্লেন, মহান্ত এখন বৈঠকখানায় যাবেন—সেখানে আমাদের যাওয়ার কোন আপত্তি নেই; সুতরাং আমরাও তাঁর বৈঠকখানায় উপস্থিত হলুম। দেখলুম একটা প্রকাণ্ড ফরাশ বিছানা আছে; একপাশে একটা উঁচু গদি ও তাকিয়া খুব কারুকার্য্য খচিত এবং বেশ সুকোমল। বুঝ্‌লুম মহান্ত মহাশয়ের সেইটিই আসন.—সন্ন্যাসীর উপযুক্ত আসনই বটে!

আমরা যে সময় বৈঠকখানায় গেলুম, তখন মহান্ত মহাশয় হাত মুখ

্তে বারান্দায় গিয়েছিলেন; আমরা বোসে বোসে ভিতরের দিকে ার একটা খুব জমকালো চক দেখলুম; সেটা মহান্তের অন্তঃপুর। ই অন্দরে অবশ্য পরিবারাদি কেউ নেই; সেখানে তাঁর শয়নকক্ষ, বশ্রামকক্ষ ইত্যাদি আছে। অন্যান্য অনেক মহান্তের ন্যায় কমলেশ্বরের হান্তেরাও চিরকুমার থাকেন, মৃত্যুকালে চেলাদের মধ্যে কাকেও ত্তরাধিকারী কোরে যান। বর্ত্তমান মহান্তের বয়স পঁয়ত্রিশ ও চল্লিশের ধ্যে বোলে বোধ হোলো; দেখ্‌তে বেশ হৃষ্টপুষ্ট। কোন মঠের মহান্ত-কই ত এ পর্য্যন্ত কাহিল দেখলুম না; মহাদেব সেবাইত ও ষণ্ড উভয়েই চরকাল দিব্য সুগোল-দেহ। কথাবার্ত্তায় মহান্তজি মন্দ নন। আমাকে ই একটা কথা জিজ্ঞাসা কল্লেন, বাঙ্গলা দেশ ভাল কি এদেশ ভাল এ ম্বন্ধে আমার মতামত জানতে চাইলেন। তিনি একবার তীর্থভ্রমণোপ-ক্ষে কাশীজি গিয়েছিলেন, সেখানে বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর দেখা হোয়েছিল, সে কথাও বোল্লেন। তারপর তিনি নানা রকমের গল্প মারম্ভ কোল্লেন—খোসামুদেরাও খুব প্রতিধ্বনি কোর্ত্তে লাগ্‌লো। দেখ-ুম, বাবাজীর আধ্যাত্মিকতা ও ভগবদ্ভক্তি আমাদের চেয়ে বড় জেয়াদা নয়, অন্ততঃ কথাবার্ত্তায় ত এই রকমই বোধ হোলো। যিনি সব ছেড়ে শুধু শ্মশান ও ভস্ম মাত্র সার করেছিলেন, তাঁর সেবাইতের এ রকম বিলাসপ্রিয়তা, এ রকম মোসাহেবের দল এবং এই প্রকার রাজভোগ কতটা ন্যায়সঙ্গত, সে বিষয়ের বিচার বাহুল্য। অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থেকে মনটা খাঁটী ও নির্লিপ্ত রাখায় বাহাদুরী আছে বটে, কিন্তু মানুষের দুর্ব্বল হৃদয়ের পক্ষে সে কাজটা বোধ হয় বিশেষ শক্ত। চারিদিকের অগণ্য স্তুতিবাদ ও দেশবিদেশ হোতে প্রেরিত বহুমূল্য উপহার সামগ্রীর যথেচ্ছব্যবহার, যথার্থ বৈরাগ্যাবলম্বী সন্ন্যাসীর কখনই প্রীতিকর নয়। কমলেশ্বরের মহান্তকে দেখে, তাঁর সম্বন্ধে এই সমস্ত সমালোচনা আমার মাথায় আস্‌ছিল। তিনি কি জানতেন যে, চারিদিক্ হোতে যখন তাঁর

কথার প্রতিধ্বনি উঠ্‌ছে, তাঁর অনুচরগণ শতমুখে তাঁর মহিমাকীর্ত্তন কচ্ছে, সেই সময়ে তাঁরই গৃহপ্রান্তে বোসে একজন প্রবাসী অতি রূঢ়-ভাবে তাঁর বিষয় আলোচনা কচ্ছিলো ? —আমিও জানতুম না যে, আমার সেই অসংযত সমালোচনা পুঁথিগত হোয়ে অনেকের সম্মুখে উপস্থিত হবে।

যাহোক মহান্ত বাবাজীর সেই সমস্ত বাজে গল্প ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক শোনা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হোয়ে উঠ্‌লো। আমি পণ্ডিত-জিকে ইসারা কোরে উঠ্‌বার জন্যে বল্লুম। আমাদের উঠ্‌বার উপক্রম দেখে মহান্তজি প্রসাদ পাবার জন্যে অনুরোধ কল্লেন ; কিন্তু আমার সঙ্গে আরো লোক আছেন, তাঁরা হয় ত খাবার প্রস্তুত কোরে আমার জন্যে অপেক্ষা কোচ্ছেন, এই রকম একটা কথা বোলে তাড়াতাড়ি উঠে এলুম ; বাস্তবিক সেখানে প্রসাদ পাবার তেমন কিছু প্রলোভন ছিল না, কারণ পণ্ডিতজি অপরাহ্নে এমন এক সিধে পাঠিয়েছিলেন যে, তাতে আমাদের পাঁচ দিন বেশ সমারোহ কোরে চল্‌তে পারে। এর উপরে আবার আমাদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবগণ দেখা কোর্ত্তে এসে যথেষ্ট মিষ্টান্ন উপহার দিয়ে গিয়েছেন। আমার সঙ্গী বৈদান্তিক ভায়া পৃথিবীটা মায়াময় বোলে নস্যাৎ কোর্ত্তে সম্পূর্ণ রাজী, কিন্তু প্রত্যক্ষ বিদ্যমান মিষ্টান্নগুলি মায়াময় বোলে ত্যাগ কোর্ত্তে কিছুতেই রাজী হন নি। বৈদান্তিকের দন্তের ক্রিয়া দেখে আমিও অবাক্‌ ! আমার ভয় হোয়েছিল সন্দেশগুলা বৈদান্তিকের যথেষ্ট মুখরোচক হোলেও তাঁর পাকযন্ত্র সেগুলা হয় ত খুব সমাদরে গ্রহণ কোর্‌বে না।

কমলেশ্বর মন্দির হোতে যখন বাসায় ফিরলুম, তখন অনেক রাত হোয়েছে। বাসায় এসে দেখি সেখানে দলে দলে লোক জমে গিয়েছে, আর পূজনীয় স্বামীজি সেখানে তুলসিদাসের পদ ব্যাখ্যা কোচ্চেন। পাউড়ী হোতে একজন বন্ধুর আসবার কথা ছিল তিনি তখনও এসে

পৌঁছেন নি, সুতরাং পরদিন তাঁর জন্যে শ্রীনগরে অপেক্ষা করবো কি না, এই ভাব্‌তে লাগলুম এবং শেষে আর একদিন শ্রীনগরে থাকাই স্থির কোল্লুম!

১৫ই মে শুক্রবার।—আজ শ্রীনগরে অবস্থিতি। সকালে কি দুপরে কোথাও বের হই নি; বিকেলে নদী পার হোয়ে অপর পারে পাহাড়ে বেড়িয়ে এলুম। দর্শনযোগ্য বিশেষ কিছু নেই, দু তিনটে ভগ্নপ্রায় শিব-মন্দির দেখা গেল। পাহাড়ের উপরেই মন্দির—খুব প্রাচীন; পাহাড়ের নাম ইন্দ্রাকিল পাহাড়। শ্রীনগরের গায়ে যে পাহাড় তার নাম অষ্টাবক্র পর্ব্বত। স্থানীয় লোকের মুখে শুনলুম, অষ্টাবক্র মুনি এই পর্ব্বতে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন। তপস্যার উপযুক্ত স্থান তার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু কোথায় অষ্টাবক্র ঠাকুরের আশ্রম বা তপোবন ছিল তা বিশেষ চেষ্টা কোরে জান্‌তে পারি নি। কারও কারও মত এই যে, যেখানে ইংরাজেরা 'পাউরী' নগর স্থাপিত করেছেন, সেখানেই অষ্টাবক্র মুনির গুহা ছিল। এখানকার রাজকার্য্য করিবার জন্য একজন "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট" আছেন; আমাদের দেশে মাজিষ্ট্রেট কালেক্টার এবং পুলিসের যে কাজ, তা এই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হাতে! এতদ্ভিন্ন এখানে চারজন ডেপুটী ও চারজন তহসিলদার অর্থাৎ সবডেপুটী আছেন। এ ছাড়া কাজ বেশী পড়্‌লে সময় সময় বাহিরের লোকও নেওয়া হয়। অন্যান্য আফিসের মত পাউড়ীতে একটা টেলিগ্রাফ আফিসও আছে; এক কথায় এই সুদূর এবং দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে ইংরেজ তাঁদের সুখস্বচ্ছন্দতা ও আরাম বিরামের প্রয়োজন মত যতটুকু দরকার, সব ঠিকঠাক কোরে নিয়ে বেশ নিরুদ্বেগে দিনগুলা কাটিয়ে দিচ্ছেন।

রুদ্র প্রয়াগ

১৫ই মে শুক্রবার। আজ শ্রীনগরে আছি। বিকেলে নদী পার হোয়ে অপর পারে পাহাড় দেখ্‌তে গিয়েছিলুম, সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরে আসা গেল। খানিক পরে পাহাড়ের পাশ দিয়ে চাঁদ উঠে সন্ধ্যার অন্ধকার দূর কোরে দিলে। তখনও আলো তত উজ্জ্বল হয় নি, সেই অস্পষ্ট আলোকে বহু-দূরে সমুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি যেন আকাশের পটে আঁকা ছবির মত বোধ হোতে লাগ্‌লো। অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াতে শরীর একটু পরিশ্রান্ত হোয়েছিল, কিন্তু সে জন্যে চুপ কোরে পোড়ে থাক্‌বার লোক আমি নই। খুব উৎসাহের সঙ্গে গল্প আরম্ভ কল্লুম, এই নির্জ্জন পাহাড়ের কোলে বোসে আমাদের দেশের ও সমাজের কথা চল্‌তে লাগ্‌লো। জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্য, আশা ও আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে যখন কথোপকথন হোলো, তখন দেখি উৎসাহ ও আনন্দে সেই বৃদ্ধের গম্ভীর এবং অচঞ্চল মুখকান্তি মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল হোয়ে উঠ্‌চে। মহাসমিতিতে একটা শুধু রাজনৈতিক জীবনের প্রতিষ্ঠা দেখি, এবং নিদ্রামগ্ন জাতি যে [illegible]কালের জড়তা ত্যাগ কোরে নিজের নিজের একটা অধিকার লাভের চেষ্টা কর্‌ছে, এই ভেবে বিশেষ আনন্দ অনুভব করি; কিন্তু স্বামিজি এর মধ্যে স্বধু প্রাণের নয়, প্রেমের প্রতিষ্ঠা দেখেচেন; সেই প্রেমের মূল্য সমস্ত রাজনৈতিক অধিকারের মূল্যের চেয়ে বেশী। স্বামীজির সঙ্গে কথা কইতে কইতে—অচ্যুত বাবাজি এসে পাশে বস্‌লেন, এবং একটা সামান্য কথা ধোরে বেদান্তের তর্ক পাড়লেন। তর্কে আমি পশ্চাৎপদ নই, আর ইংরেজী পোড়ে অনধিকারচর্চ্চা করবার ঝোঁকটাও আমাদের ইয়ং বেঙ্গলদের খুব বেশী প্রবল। তার একটু কারণও আছে। স্কুলে কালেজে যে সব কেতাব পড়া হয়, তাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জিনিসই

কিছু কিছু আছে; তার উপর আজকাল স্বাধীনচিন্তার দিন; সুতরাং আমাদের ক্ষুদ্র মত গুলিকে তর্কজালে গগনস্পর্শী করিয়া বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানসিদ্ধ পূজনীয় ব্যক্তির উপর বর্ষণ কর্ত্তে আমাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় না। এ অবস্থায় যে বৈদান্তিকের সঙ্গে তর্কক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবো, তার আর আশ্চর্য্য কি? আমাদের তর্কের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখে স্বামীজি কম্বল মুড়ি দিয়ে শয়ন কোল্লেন। তিনি তর্কসমুদ্র পার হোয়ে এখন বিশ্বাসের তীরে এসে দাঁড়িয়েছেন; তাঁর এ সব ভাল লাগ্‌বে কেন? তাই যখন আমরা নিষ্কর্ম্মা দুটি লোক ক্রমাগত বাক্যবর্ষণ কোরে পৃথিবীর সৃষ্টিস্থিতিলয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হলুম, তখন তিনি নিদ্রার উদ্‌যোগ কোল্লেন; কিন্তু কাণের গোড়ায় এ রকম কলরব হোলে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরও নিদ্রা-কর্ষণের পক্ষে বাধা জন্মে, সুতরাং তিনি কম্বল ছেড়ে উঠে একটা গান জুড়ে দিলেন; তার সবটা মনে নেই, ৺টো লাইন এই:—

"গোলেমালে মাল মিশে আছে;
ওরে, গোল ছেড়ে মাল লওরে বেছে।"

আমাদের তর্ক বিতর্কের এর চাইতে আর কি ভাল মীমাংসা হবে। রাত্রি অধিক হোলো দেখে সে দিনের মত বেদব্যাসের বিশ্রাম দেওয়া গেল।

শ্রীনগরের সব ভাল; মন্দের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র জীব, নাম বৃশ্চিক। এখানে বৃশ্চিকের ভয় অত্যন্ত বেশী, বিশেষ তার দংশন জ্বালা আজও বেশ মনে আছে; সুতরাং যখন শয়ন কল্লুম, তখন মনে বড় ভয় হোতে লাগলো। সমস্ত রাত্রি এই ভয়ে পাশ পর্য্যন্ত ফিরিনি। ঘুমও ভাল হয় নি; স্বপ্নে সমস্ত রাত্রি বৃশ্চিক দেখেছি, আর বৈদান্তিকের তর্ক শুনেছি।

১৬ই মে, শনিবার। আজ প্রাতে শ্রীনগর ত্যাগ কোরে মাইল রাস্তা চোলে 'ধাড়ী' চটিতে এলুম। চটিতে এসে দেখি জনমানবের সম্পর্কশূন্য

অর্গলবদ্ধ দুতিনখানা পত্রকুটীর পোড়ে আছে। এখানে খাওয়া দাওয়া হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, ক্ষুধারও কিছুমাত্র অপ্রতুল নেই। গত দুদিন শ্রীনগরে যে সুখে ছিলুম, আজ তার প্রতিশোধ হোলো। নিকটে এমন কোন গ্রাম নেই, যেখান হোতে খাবার যোগাড় কোরে আনি, সুতরাং এ অবস্থায় সকলে যা করে আমরাও তাই কল্লুম; বেশ পরিপূর্ণ রকম উপবাস করা গেল। ঘরে বসে উপবাস করার মধ্যে গুরুত্ব বিশেষ কিছু নেই; কিন্তু এই পাহাড়ের মধ্যে ৯ মাইল "চড়াই ও উৎরাই" শূন্য পাকস্থলীতে পার হোলে শরীরের যে কি দুর্দ্দশা হয়, তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কারো অনুভব করবার শক্তি আছে বোলে বোধ হয় না। আমি যত না কাতর হই—আমার বোধ হোলো আমার সঙ্গিদ্বয় একটু বেশী কাতর হোয়েছেন। স্বামীজি বৃদ্ধ, তার উপর অল্পাহার; দীর্ঘকাল অনাহারে তাঁর কাতর হওয়া অবশ্যই সম্ভব; কিন্তু বৈদান্তিক ভায়া আমার অপেক্ষাও জোয়ান, তবু তাঁর এরকম কাতরতার কারণ বোঝা গেল না; বোধ করি, তাঁর পরিপাকশক্তি ভোজনশক্তিরই অনুরূপ। ধর্ম্ম-কর্ম্মের কোনই ধার ধারেন না, কেবল এক পেট আহার ও খানিকটে শুষ্ক নীরস তর্ক পেলেই তিনি খুব পরিতৃপ্ত হন। আমাদের মত ডাল রুটি খাওয়ার পরিবর্ত্তে যদি তিনি যোগী ঋষির মত আমলা ও হর্ত্তুকী খাওয়া অভ্যাস কোর্ত্তেন, তা হোলে কটা গাছ ফলশূন্য কোর্ত্তে পার্ত্তেন তা আমি অনুমান কোরে উঠ্‌তে পারিনে। অনাহারে ভায়ার মেজাজ বড় খিট্‌খিটে হোয়ে উঠলো; আজ আমার উপর তাঁর রাগটা কিছু বেশী, অবশ্য তার কারণও ছিল। শ্রীনগর হোতে বের হবার সময় ভায়া আমাকে পুনঃ পুনঃ বোলেছিলেন যে, রাস্তায় আর এমন সহর নেই; এখান হোতেই কিছু খাবার সংগ্রহ কোরে যাওয়া উচিত, বিশেষ পথে আজও চটি বসে নি, সুতরাং অনাহারে বড়ই কষ্ট পেতে হবে। সে সময় উদর পূর্ণ বোলেই হোক—কি পুঁটুলি বেঁধে খাবার ঘাড়ে কোরে চলাটা

ক্ষুধার সময় ছাড়া অন্য সময়ে প্রীতিকর নয় বোলেই হোক—বৈদান্তিক ভায়ার সে প্রস্তাবে আমি কর্ণপাত করি নাই ; সেই জন্য আজ ভায়া আমার উপর গরম ; এই সময়ে এই ক্ষুৎপীড়িত বৈদান্তিকপ্রবরের জঠরানলে কিঞ্চিৎ তর্কাহুতি প্রদানের ইচ্ছা আমার বিলক্ষণ প্রবল হোয়ে উঠ্‌লো, কিন্তু স্বামীজির ইঙ্গিত অনুসারে আমি নিরস্ত হোলুম। উপায়ান্তর না দেখে একটা গাছ তলায় পোড়ে নিতান্ত নিরুপায় ভাবে সেই দুপুরের রৌদ্র ভোগ করা গেল।

বেলা দুটো বাজ্‌তে না বাজ্‌তেই এখান হোতে রওনা হবার জন্যে বৈদান্তিক ব্যতিব্যস্ত কোরে তুল্লে ; এত রৌদ্রে বের হোতে কারো ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু পাছে রাত্রেও অনাহারে আশ্রয়হীন হয়ে কাটাতে হয়, এই ভয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। কিন্তু অদৃষ্টে কষ্ট থাকলে কে খণ্ডাতে পারে ? আজ কি শুভক্ষণেই পা বাড়ান গিয়েছিল, তা বল্‌তে পারি নি। একটু যেতে না যেতেই এই বৈশাখ মাসের প্রবল রৌদ্র কোথায় চলে গেল এবং তার বদলে ভয়ানক ঝড় জল আরম্ভ হোলো। কিন্তু এ রকম বিপদ্‌ আমাদের পক্ষে নূতন নয়। কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে সেই বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে চার মাইল তফাতে একটা চটিতে উঠ্‌লুম ; এ চটিটার নাম আমার ডাইরী থেকে মুছে গিয়েছে। এখানে একটা পাথরের কোঠা আছে, শুনলুম সেটা গবর্ণমেণ্টের ধরমশালা। ছোট একটা কোঠা আর একটা ছোট বারান্দা। সেখানেই আড্ডা নেওয়া গেল। এখান হোতে রাস্তায় মধ্যে মধ্যে এ রকম ধরমশালা নাকি অনেক আছে। যাহোক এখানেই সে রাত্রিবাসের আয়োজন কোল্লুম ; ভিজে কাপড় ও ভিজে কম্বলে কোন রকমে রাত্রি কেটে গেল।

১৭ই মে রবিবার। খুব ভোরে রওনা হয়ে ১১ মাইল পথ চলে রুদ্রপ্রয়াগে উপস্থিত হওয়া গেল। আমাদের দেশের লোক একটা প্রয়াগেরই

নাম জানেন। তা ছাড়াও অনেক প্রয়াগ আছে। যারা বদরিকাশ্রম কি কেদারনাথ দর্শন কর্ত্তে গিয়েছেন, তাঁরা অবশ্য এ সকল দেখেছেন; কিন্তু সব ছাপার কাগজে বড় একটা উঠে না, এ সব শুধু পুণ্যপ্রয়াসী তীর্থযাত্রীর মনে তীর্থের সুপবিত্র মহিমার সঙ্গে দীর্ঘ পথের স্মৃতি জড়িয়ে ভক্তির একটা অটল সিংহাসন প্রস্তুত কোরে রাখে। সেই জন্যে সকল প্রয়াগের নাম সাধারণের জানার ততটা সম্ভাবনা নেই; কিন্তু কেদারখণ্ড নামক গ্র[illegible] পাঁচটি প্রয়াগের উল্লেখ আছে। এলাহাবাদে বটপ্রয়াগ, কারণ সেখানে অক্ষয়বট আজও সশরীরে বর্ত্তমান, তবে ক্রমাগত তেল সিঁদুরের বর্ষণে বটপ্রবর এমন চেহারা বের করেছেন যে, তিনি উদ্ভিদ কি আর কিছু তা সহজে ঠাহর করা যায় না; বোধ হয় প্রলয়কালে বিষ্ণু বিশ্রাম কামনায় পত্রের অনুসন্ধানে এসে গুঁড়ি পর্য্যন্ত চিনতে পারবেন না। বটপ্রয়াগের পর দেব-প্রয়াগ, সে কথা আগেই বলেছি; ক্রমে রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ এবং নন্দপ্রয়াগ। ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত এই পাঁচটি প্রয়াগই ছিল; কিন্তু আরও একটি প্রয়াগের বৃদ্ধি হয়েছে, তার নাম বিষ্ণুপ্রয়াগ। ধীরে ধীরে সকল গুলির কথাই বল্‌বার ইচ্ছা আছে। পুরাণাদি গ্রন্থে এই অঞ্চলের নাম 'উত্তরা খণ্ড'; ঐ সকল গ্রন্থে উত্তরাখণ্ডের অনে[illegible] মহিমার কথা সন্নিবদ্ধ আছে। 'উত্তরাখণ্ডে' বাস কল্লে মহাপুণ্য সঞ্চ[illegible] হয়।

রুদ্রপ্রয়াগে এসে আমরা বড়ই বিপদে পড়লুম। স্বামীজি জ্বরে পড়্‌লেন; তবে সৌভাগ্য এই যে, গবর্ণমেণ্ট নির্ম্মিত ধর্ম্মশালায় আমাদের মাথা রাখবার একটু জায়গা হোল। এ চটিতে দুটো ছোট কুঠুরী আর একটা বারান্দা, এখানে অলকনন্দার পাড় অত্যন্ত উঁচু। জলের ধারে যাওয়া অসম্ভব। এখান হোতে মন্দাকিনী ও অলকনন্দার সঙ্গম অতি সুন্দর দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এখানে একটা ছোট বাজার আছে, কিন্তু তা পাহাড়ের এমন জায়গায় যে, যদি একদিন নদীতে ভাঙ্গন ধরে ত সব এমন ভেঙ্গে পড়্‌বে যে, আর কাহারও কোন চিহ্নমাত্রও থাক্‌বে না। আমার এ অনুমানটা হাতেহাতেই

জলে গিয়েছে। বদরিকাশ্রম হোতে ফেরবার সময় দেখি, সত্যসত্যই এখানকার বাজার নদীগর্ভে নেমে গিয়েছে। শুধু বাজার নয়, বাজার হোতে তিন মাইল বদরিনারায়ণের রাস্তা পর্য্যন্ত অদৃশ্য হয়েছে। সে কথা ফেরবার সময় বোলবো। আমরা যে পারে ছিলুম, সঙ্গমস্থল তার অপর পারে। পার হবার জন্য দেবপ্রয়াগের মত এখানেও একটা টানা সাঁকো আছে, সেই সাঁকো পার হোয়ে সঙ্গমস্থলে আসতে হয়।

দেবপ্রয়াগে একটু সহরের গন্ধ আছে; এখানে তা কিছুই নেই। এমন কি পাণ্ডার গোলযোগ পর্য্যন্তও নেই। গ্রামে তিন চার ঘর গৃহস্থ; দোকানগুলি অতি যৎসামান্য; অনেক চেষ্টা কোরেও একটু চিনি যোগাড় কোর্ত্তে পাল্লুম না; স্বামীজির জ্বর ক্রমেই বাড়তে লাগলো। এই দূর দেশে তাঁর সঙ্গেই এসেছি, তাঁকে এ রকম অসুস্থ দেখে মনটা ভারি দমে গেল। তিনি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী; সব ত্যাগ করেছেন, কিন্তু মায়া ত্যাগ কোর্ত্তে পারেন নি; কম্বল ছাড়া সম্বল নেই, অথচ তারমধ্যে মায়া। ইহা মোহের নামান্তর নয়; ইহা আসক্তিশূন্য, উদার, সর্ব্বত্র প্রসারিত। কিন্তু তার মাত্রাটা আমারই উপর একটু বেশী হোয়ে উঠেছে। এ কয়দিন বোধ হয় তিনি তাঁর ধ্যান ধারণা হোতে খানিকটে সময় বের কোরে নিয়ে, এই জঙ্গলে, পর্ব্বতের মধ্যে আমার যতটুকু সুখ বা আরাম লাভ হোতে পারে, তারি জন্যে তা নিযুক্ত কোরেছেন। একদিকে জ্বরে কাঁপ্‌চেন, শীতে দাঁতে দাঁতে বেধে যাচ্ছে, অথচ তারি মধ্যে বলা হোচ্চে; "দেখদেখি দোকানে দুটো চাল পাওয়া যায় কি না? একটু দুধ যোগাড় কোরে খাও।" এই পর্ব্বতের মধ্যে রোগ-শয্যাশায়ী সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রাণের আগ্রহ দেখে হৃদয় বিগলিত হোলো এবং বাল্যের পিতামাতার স্নেহ ও আদরের কথা মনে পড়লো। সমস্ত দিন স্বামীজির রোগশয্যার পাশে বোসে থাকলুম; সন্ধ্যার খানিক আগে অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণময় কিরণে যখন সঙ্গমস্থল অনুপম শোভা ধারণ কোল্লে, তখন এক একবার ইচ্ছে হোতে লাগলো

যে, ছুটে গিয়ে এই মুক্ত প্রকৃতির সুন্দর শোভার মধ্যে এই চিন্তাক্লিষ্ট, বিষণ্ণ মনটাকে খানিক প্রফুল্ল কোরে নিয়ে আসি। কিন্তু স্বামীজি অত্যন্ত কাতর, তাঁকে ছেড়ে কোথাও যেতে পাল্লুম না; তবু যে তাঁর সেবা কোর্ত্তে পাল্লুম, এই একটা আনন্দের কারণ হলো। কোন রকমে সন্ধ্যাটা কেটে গেল, কিন্তু রাত্রে বিপদের উপর বিপদ উপস্থিত, আমার অত্যন্ত জ্বর ও রক্তামাশয় হোলো। রাত্রি যত শেষ হোতে লাগলো রোগও তত বাড়্তে লাগল ক্রমে আমি উত্থানশক্তি-রহিত হয়ে পড়লুম; সমস্ত পথশ্রমের কষ্ট আমার বলহীন, নিস্তেজ দেহটা আক্রমণ কোল্লে; হাত পা নাড়বারও ক্ষমতা রইল না! শরীরের অবস্থা এ রকম হোলেও আমার চিন্তাশক্তি তখন বেশ তীব্র ছিল; আমার মনে হলো উষার আলোকে চরাচর সুরঞ্জিত হবার আগেই হয়তো হিমালয়ের এই নির্জ্জনউপত্যকায় আমার ইহজীবনের ভ্রমণ পর্য্যবসিত হোচ্চে। সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে মনে বড় অহঙ্কার হোয়েছিল যে, যখন মায়াজাল ছিন্ন করা এত সহজ, তখন লোকে তা পারে না কেন? এই ত আমি পেরেছি; কিন্তু মৃত্যু যখন জীবনের পাশে এসে দাঁড়ালো, মৃত্যুর সেই উচ্চ অনাবৃত তটপ্রান্তে দাঁড়িয়ে যখন প্রতি মুহূর্ত্তে সেই বিস্মৃতিপূর্ণ, গভীর অতলে আমার পদস্খলন হবার সম্ভাবনা দেখ্লুম, তখন সংসারের সমস্ত মায়া মোহ এসে আচ্ছন্ন কোল্লে। মনে হোলো যাদের ফেলে এসেছি, সন্ন্যাসী বোলেই যে তাদের ছেড়ে আসতে পেরেছি তা নয়; তাদের একবার দেখ্বার আশা আছে বোলেই তাদের ফেলে আস্তে পেরেছিলুম. বাঁধন ছিঁড়তে পারি নি! যখন এই সকল গম্ভীর চিন্তা আমার মনে উদয় হোয়েছিলো, তখন স্বামীজি তাঁর রোগশয্যা ছেড়ে বহুকষ্টে একবার উঠে আমার ম্লানমুখ ও ক্লান্তচক্ষুর দিকে অত্যন্ত ব্যাকুল স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্ছিলেন। সন্ন্যাসজীবন আরম্ভ কোরে, যে সব অনিয়ম ও অত্যাচার কোরেছি, তাতে কোরেই আজ এই বন্ধুহীন দেশে পর্ব্বতের মধ্যে এমন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছি বোলে স্বামীজি অত্যন্ত কাতর হোয়ে পোড়লেন। তাঁর কাতরতা

দেখে তাঁকে একবার বোল্‌তে ইচ্ছা হোলো "হে বৈরাগ্যাবলম্বী পুরুষপ্রবর বৃথা তোমার বৈরাগ্য, এখনো তোমার মনে দুঃখ শোক স্থান পায়, এখনও তুমি বন্ধনের দাস!" কিন্তু তখনই মনে হোলো, এ কাতরতা তাঁর নিজের জন্যে নয়, পরের জন্যে; তাঁর এ অশ্রু—নিজের দুঃখে নয়, পরের কষ্টে। পৃথিবীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ কোরেও যিনি সকলের প্রতি স্নেহবান, তারই যথার্থ বৈরাগ্য; নতুবা জনমানবের সাড়া-শব্দশূন্য জঙ্গলে বোসে বিশ্বব্রহ্মা গুকে অলীক বোলে নাসাগ্রে দৃষ্টিবদ্ধ কোরে কাল কাটানতে বিশেষ কিছু যে মহত্ত্ব আছে তা আমার বোধ হয় না। বৈদান্তিক ভায়ার অবস্থা দেখে আমার একটু হাসি এল, তিনি কম্বল মুড়ি দিয়ে কাত হোয়ে ঘরের এক কোণে পড়েছিলেন এবং এক একবার উদাস ও অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে আমার মুখপানে মিটমিট কোরে চাচ্ছিলেন। সেই দীপালোকে তাঁর অপ্রসন্ন মুখের দিকে চেয়ে কিছুতেই মনে হয় না যে, সেই বৈদান্তিক আমাদের এই বিপদ্‌কালে তাঁর theoryর উপর নির্ভর কোরে নিশ্চিন্ত হোলেন।

১৮ই মে, সোমবার। রাত্রি প্রভাত হোলো। সকালের আলো ও বাতাসে আমার শরীর অনেকটা ভাল হোতে লাগলো; পীড়ার বেগও অনেকটা কমে এল। স্বামীজির অবস্থাও অনেকটা ভাল। দুই প্রহরের সময় স্বামীজি আমাকে একটু জল খেতে দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় স্বামীজির একটু আধটু তন্ত্রমন্ত্র ছিল, তাঁর মত লোকের ওসবের কি আবশ্যক, তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ঠিক কোরে উঠতে পাত্তুম না; কিন্তু আজ দেখলুম, তাঁর তন্ত্রমন্ত্রের মধ্যেও খানিকটে সত্য আছে। তিনি তাঁর কমণ্ডলু হোতে খানিক জল নিয়ে তার দিকে একদৃষ্টে একমনে চেয়ে থাক্‌লেন, তার পর সেই জলের মধ্যে জোরে একটা ফুঁ দিয়ে আমাকে খেতে দিলেন। আমাদের দেশে শুনেছি সে কালে জলপড়া খেয়ে লোকের ব্যারাম সারতো, মধ্যে ইয়ংবেঙ্গলদের আমোলে কিছু দিন সারতো না, এখন সেই জলপড়া বিলাত হোতে মেসমেরি-

জম্ নাম নিয়ে এদেশে এসেছে, এখন আবার তাতে অসুখ সারছে! প্রাচীন যোগতত্ত্বের জায়গায় পাশ্চাত্য সাইকিক ফোর্স বাসা বেঁধে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতীত ও ভবিষ্যতের খবর দিচ্ছে। শুনেছি, এ সকল থিয়সফির কথা; এসব তত্ত্ব জানিও নে বুঝিও নে। তবে এইটুকু দেখ্‌লুম যে, স্বামীজির জল খেয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমার শরীর বিশেষ সুস্থ বোধ হোলো; অসুখ একটু নরম পড়তেই আমার ভয়ানক ক্ষিদে পেলে। সে রকম ক্ষিদে বোধ হয়, আমার জীবনে আর কখন পায় নি। একটা অসুখ কতকটা সেরেছে বটে, কিন্তু জ্বর তখনও পূর্ণ মাত্রায়। ক্ষিদের জ্বালায় ছটফট কল্লেও সে অবস্থায় কিছু খাওয়া উচিত নয়, কিন্তু আমি আর থাকতে পাল্লুম না। সঙ্গে একজন লোক ছিল, সেই রান্নার যোগাড় কোরে দিলে, তার কৃপায় ডাল-রুটি খাওয়া হোলো। সে ডাল-রুটির যে কি চেহারা! তা যদি আমাদের ডাক্তার মহাশয়েরা দেখ্‌তেন,—বিশেষ, আমার একটি অতিসতর্ক, বয়ঃকনিষ্ঠ, কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধ ডাক্তার বন্ধু আছেন—আমার এইরূপ পথ্য তাঁদের কারো চোখে পোড়্‌লে তাঁরা নিঃসন্দেহে আমার মৃত্যু নিশ্চয় বোলে সিদ্ধান্ত কোর্ত্তেন। স্বামীজিও আমার পথ্যের পোষকতা করেন নি; কিন্তু আহারের পর আমি অনেকটা বল পেলুম, জ্বরটা তখনও বেশ প্রবল; স্বামীজি বল্লেন, রাত্রে ঘুমালেই জ্বরটা যাবে।

আজ বৈকালে বেড়াবার লোভ সংবরণ করা আমার পক্ষে একেবারে দুঃসাধ্য হয়ে উঠ্‌লো। সঙ্গমস্থলের কাছে গিয়ে সেখানকার শোভা দেখবার জন্যে মনে অত্যন্ত আগ্রহ হোতে লাগ্‌লো। কিন্তু এই অসুখের উপর ঘুরে বেড়ানতে স্বামীজি যদি অসন্তুষ্ট হন, এই ভয়ে অনেকক্ষণ চুপ কোরে থাকলুম; পরে যেই দেখলুম, স্বামীজি ধর্ম্মশালার ঘরে ঈষৎ তন্দ্রাভিভূত হয়েছেন, অমনি আমি বেরিয়ে পড়্‌লুম। বাজারের ভিতর দিয়ে টানা

াঁকো পার হোয়ে ঘুরতে ঘুরতে সঙ্গমস্থলে গিয়ে হাজির হওয়া গেল। একটু পথশ্রমে শরীর বড় কাতর ও অবসন্ন হয়ে পড়্‌লো। জলের ধারে বোসে আমি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। চারিদিকে সর-ল সমুন্নত পর্ব্বত; সম্মুখে অলকনন্দা ও মন্দাকিনীর খর প্রবাহ পরস্পরে মিশে গিয়েছে; সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত পর্ব্বতের কনক-কিরীট নদীজলে প্রতি-ফলিত হোচ্ছে; রক্তরঞ্জিত মেঘের ছায়া ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছে; জলের ধারে কত রকমের সুন্দর পাথর পোড়ে আছে, বোলে শেষ করা যায় না; আমি বোসে বোসে সেই সমস্ত উপলখণ্ড সংগ্রহ কোর্ত্তে লাগ্‌লুম। দেবপ্রয়াগে কতকগুলি সুন্দর পাথরের নুড়ি সঞ্চয় করেছিলুম, কিন্তু স্বামীজি তা ফেলে দিয়েছিলেন এবং বোলেছিলেন যে, যদি ভাল পাথর দেখ্‌লেই কুড়িয়ে নিয়ে যেতে হয়, তা হলে আমাদের সঙ্গে দশ শটে হাতী আনা উচিত ছিল। দেবপ্রয়াগে সেগুলি ফেলে দিয়েছিলুম, কিন্তু এখানকারগুলি সব ফেল্‌তে পাল্লুম না; এমন সুন্দর পাথর কি ফেলা যায়? কেমন উজ্জ্বল, মসৃণ, বহুবিধ বর্ণ এবং আকারবিশিষ্ট। কোনটা ঘোর লাল, কোনটা দুগ্ধফেনবৎ শ্বেত, কয়েকটা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ—আবলুস-কাঠের মত, কতকগুলি নয়নস্নিগ্ধকর হরিৎ, দু পাঁচটা বা কমলালেবুর রং। কতকগুলির এক দিক্ এক রকম বর্ণ, অন্যদিকে অন্য রকম; উভয় বর্ণ পরস্পরের মধ্যে মিশে গিয়েছে অথচ সেই মিশ্রণের মধ্যে এমন একটা সুন্দর রেখা আছে, যা মানবচিত্রকরের তুলিতে কিছুতেই অঙ্কিত হতে পারে না, অথচ তা কত স্বাভাবিক দেখাচ্ছে; যেন তার মধ্যে কিছুমাত্র অসাধারণত্ব নেই। আবার সেই সমস্ত প্রস্তরখণ্ড যে কত আকারের, তা সংখ্যা করা যায় না। গোল, চেপ্‌টা, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ; আকার যত রকম হতে পারে, বোধ হয়, তার সকল রকমই আছে। এই সকল প্রস্তরখণ্ড নদীর ধারে প্রচুর পরিমাণে বিক্ষিপ্ত; বোধ হোতে লাগ্‌লো, এ সব যেন সুরনদী মন্দাকিনীর সৈকতে প্রস্ফুটিত প্রবাল-পুষ্প।

আমি এক একবার কতকগুলি সুন্দর মুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে খানিকটে উপরে পাথরের উপর বসি ; বোসে থেকে তার মধ্যে হোতে সব-ভাল দু তিনটে বেছে রেখে, বাকিগুলো জলে ছুড়ে ফেলে দিই ; আবার কতকগুলি নিয়ে আসি, এবং তা হোতে দু একটি বেছে নিই। এই রকম কোর্ত্তে কোর্ত্তে ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলো, অথচ সে দিকে আমার খেয়াল নেই ; হঠাৎ উপর হতে স্বামীজির কণ্ঠস্বর শুনে আমার চৈতন্য হোলো। চেয়ে দেখি, তিনি অপর পারের পাহাড় বেয়ে যেটুকু নীচে নামা যায়, ততটুকু এসে একখানা পাথরের উপর বোসে আমায় ডাক্‌চেন। আমি তাড়াতাড়ি উঠে রাস্তা ঘুরে ধরমশালায় যেতে বেশ অন্ধকার হোয়ে এলো। স্বামীজি ততক্ষণ বাসায় পৌঁছেছিলেন। আমি বাসায় প্রবেশ করবামাত্র তিনি আমার উপর স্নেহপূর্ণ তিরস্কার বর্ষণ কোর্ত্তে লাগ্‌লেন ; তার মর্ম্ম এই যে, যদি আমি পথে ঘাটে যেখানে সেখানে এ রকম নিবিষ্টচিত্ত হোয়ে বোসে থাকি ত, আমাকে বাঘে ভালুকে ফলাহার কোর্ত্তে পারে, কিংবা আমি পাথর চাপা পড়েও মরতে পারি। বিশেষতঃ আজ আমার রুগ্নদেহে এতটা উঠা নামা করা ভাল হয় নি। বৈদান্তিক ভায়ার মুখে শুনলুম, স্বামীজিও আর বৈদান্তিক আমায় বাসায় না দেখে, এখানে এসে প্রায় এক ঘণ্টা ধোরে ঐ পাথরের উপর বোসে আমার ছেলে খেলা দেখছিলেন। অচ্যুত বাবাজী আমাকে ডাক্‌তে চাচ্ছিলেন, কিন্তু স্বামীজি ডাক্‌তে দেন নি। আমার রকম দেখে তাঁর মনে অন্য এক প্রকার ভাবের উদয় হোয়েছিল ; তাই ভাবে গদ্গদ হোয়ে বোলেছিলেন, "প্রকৃতি মায়ের কোলে এমনি কোরে সকলেই বালক হোয়ে যায়।" রাত্রিটা আমরা এক রকমে কাটিয়ে দিলুম ; কিন্তু সঙ্গের লোকটার বড় জ্বর এলো।

১৯এ মে, মঙ্গলবার। আমাদের শরীর যদিচ অনেকটা দুর্ব্বল ছিল তবুও আজই এখান হোতে রওনা হব, এ রকম সঙ্কল্প করেছিলুম কিন্তু সঙ্গের লোকটার জ্বর হওয়ায় আজও এখানে থাকৃতে হোলো। আগে

মনে করা গেল, আজকের দিনটা বিশ্রাম কোরে শরীর আর একটু সুস্থ কোরে নেওয়া যাক্। বৈদান্তিকের আর এক দণ্ড এখানে থাকতে ইচ্ছে নেই, তিনি বেরিয়ে পড়্‌লেই বাঁচেন; কিন্তু কি বোলে আমাদের ফেলে যান? কাজেই তাঁকেও চক্ষুলজ্জায় থাকতে হোলো। এখান হোতে দুটো রাস্তা বের হোয়েছে; যে টানা সাঁকো পার হোয়ে আমি সঙ্গমস্থলে গিয়েছিলুম, সেই সঙ্গমস্থানের উপর দিয়ে মন্দাকিনীর ধারে ধারে কেদারনাথ যাওয়া যায়; আর একটা রাস্তা—আমরা যে পারে আছি, সেই পার দিয়ে বরাবর অলকনন্দার ধারে ধারে বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত গিয়েছে। অনেকেই এখান হোতে অপর পারের পথ ধোরে, প্রথমে কেদারনাথ দর্শন কোরে, পরে ঐ দিক্ দিয়েই যে রাস্তা আছে, সেই রাস্তায় এসে খানিক উপর দিয়ে বদরিকাশ্রমে যে রাস্তা গিয়েছে, সেই রাস্তায় উপস্থিত হন। আমরা প্রথমেই বদরিকাশ্রম যাব, এই রকম স্থির ছিল। পূর্ব্বেই বলেছি, আমরা যে পারে আছি, এই পার দিয়েই—অলকনন্দার ধারে ধারে বদরিকাশ্রমের রাস্তা; কিন্তু রুদ্রপ্রয়াগ থেকে পিপলচটী পর্য্যন্ত রাস্তাটা বড়ই ভয়ানক এবং দুর্গম। এখান হোতে পাহাড় একেবারে সোজা, তারি গায়ে একটা সংকীর্ণ দুর্গম পথ। পাহাড়ের যে অংশে রাস্তা, সে অংশটা মধ্যে ভেঙ্গে পড়ে, সুতরাং খানিকটে ঘুরে আবার একটা রাস্তা পড়ে। একবার একদিন এই রাস্তায় কতকগুলি যাত্রী যাচ্ছিলো, তখন একটু একটু বৃষ্টিও হোচ্ছিল, ঝড়ও ছিল; এই সময় তাদের মাথার উপর পাহাড়ের ধস নামে, তার পর একটি যাত্রীরও চিহ্নমাত্র দেখ্‌তে পাওয়া যায় নি। এই ঘটনার পর গবর্ণমেণ্ট টানা সাঁকোর উপর দিয়ে পিপলচটী পর্য্যন্ত একটা রাস্তা তৈয়েরী কোরে দিয়েছেন। আবার পিপলচটীতে একটা টানা সাঁকো তৈয়েরী কোরে এ পারের রাস্তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে পিপলচটী পনর মাইল। ও পারের নূতন রাস্তা ভাল বটে, কিন্তু এই পনর মাইলের মধ্যে কোন চটী নেই; এক টানেই এই পনর মাইল

রাস্তা চলা কষ্টকর বোলে, সকলেই এ পারের সঙ্কীর্ণ পথে চলে; কারণ, এখান হোতে সাত মাইল তফাতে 'শিবানন্দী চটী।' সরকারী লোকজন দু পথেই চলে। এক জায়গায় আজ তিন দিন বোসে থেকে মনটা বড় ভাল নেই। বিকেলে স্বামীজি বোল্লেন, এখন হোতে রাস্তা ক্রমেই খারাপ হবে, শুধু পায়ে তার উপর দিয়ে চোল্‌তে গেলে পা দুখানাকে কিছুতেই আস্ত রাখা যাবে না; বিশেষতঃ এই দুর্গম রাস্তার মধ্যে এক জায়গায় যদি পা জখম হোয়ে পড়ে ত চক্ষু স্থির! সুতরাং এখান হোতে এক এক জোড়া পাহাড়ী জুতে কিনে নেওয়া যাক্। আমিই বাজারে জুতো কিন্‌তে গেলুম; দেখি জুতোর দোকান নেই, একজন মুচি একটা যায়গায় বোসে জুতে মেরামত কোচ্ছে, আর তার পাশে দেবকন্যার মত সুন্দরী একটি মেয়ে বোসে আছে; এমন সুন্দর চেহারা সর্ব্বদা আমাদের নজরে পড়ে না। তার যেমন রং, তেমনি সর্ব্বাঙ্গের পূর্ণ সৌষ্ঠব। মেয়েটির বয়স পনর ষোল বছর সতেজ, উন্নতদেহ, তার উপর যৌবনের লাবণ্যে সে সেই জায়গাটা যেন আলো কোরে বোসেছিল। আমি বিহ্বলনেত্রে তার দিকে চেয়ে রইলুম; এ রকম জায়গায় আমি এ রকম সুন্দরীকে দেখ্‌বার প্রত্যাশা করি নি বোলেই বোধ করি, আমার এত বিস্ময়। তার পর যখন শুনলুম সে মুচীর কন্যা, তখন আর আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। আমি ভাবলুম, মুচির মেয়ে যেখানে এমন, ভদ্রলোকের মেয়েরা সেখানে না জানি, কত সুন্দরী!

যা হোক এই মুচিকে জুতোর কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বোল্লে, জুতো তৈয়েরী নেই, তবে আমি যদি খানিক অপেক্ষা করি ত সে জুতো তৈয়েরী কোরে দিতে পারে। খানিক বোসে থাক্‌লে তিন চার জোড় জুতো তৈয়েরী হবে, শুনে আমি অবাক্। একটা দোকানে বোসে তার কাণ্ডকারখানা দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। সে আর তার মেয়েতে মিলে

জুতো তৈয়েরী কোর্ত্তে লাগ্‌লো,—সেই সুন্দরীর ফুলের মত সুন্দর সুকোমল হাতে কঠিন চামড়া নাড়াচাড়া বড়ই অমানান দেখাচ্ছিল।

শীঘ্রই জুতো তৈয়েরী হোয়ে গেল;—জুতো তো ভারি; পায়ের সমান কোরে কাটা এক এক খানা মোটা চামড়া, তার উপর পায়ের এপাশ ওপাশ দিয়ে বাঁধ্‌বার জন্যে গোটাকত চামড়ার ফিতে। জুতো তৈয়েরী হোলে, মেয়েটি তা হাতে কোরে আমার আগে আগে ধরমশালা পর্য্যন্ত পয়সা নিতে এলো; মনে হোলো, যেন কোন বনদেবী ছল কোরে এই নির্জ্জন পার্ব্বত্য প্রদেশে আমার পথপ্রদর্শিকা হোলেন।

আজ রাত্রে সঙ্গের লোকটার অবস্থা অনেক ভাল। প্রত্যূষে রুদ্রপ্রয়াগ ত্যাগ কোরবো—এই রকম স্থির করা গেল।

কর্ণপ্রয়াগ-পথে।

২০এ মে, বুধবার। আজ খুব সকালে রুদ্রপ্রয়াগ ছেড়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হোতে লাগ্‌লুম। আমরা যে কয়জন এক সঙ্গে যাচ্ছি, এক বৈদান্তিক বাদে তাদের আর সকলেরই শরীর অসুস্থ; স্বামীজি ও ভৃত্যটি অত্যন্ত কাতর; আমার শরীরও বড় ভাল ছিল না, কিন্তু সে ভাব গোপন কোরে বিশেষ স্ফূর্ত্তির সঙ্গে চল্‌তে লাগ্‌লাম। আমার একটা অভ্যাস আছে, কোন স্থানে যেতে হোলে গন্তব্য জায়গায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমি কিছুতেই পথের মধ্যে বিশ্রাম করি নে; একবার বিশ্রাম কোর্‌তে বোস্‌লে আমি বড় অবসন্ন হোয়ে পড়ি, আর পথ চলা হয় না; এই জন্যে আমি সর্ব্বদাই সঙ্গীদের আগে আগে চলতুম। কখন কখন আমার সঙ্গীগণ আমার অনেক পিছনে পোড়ে থাক্‌তেন। আজ শরীর খুব দুর্ব্বল থাক্‌লেও

সকলের আগে আগে হেঁটে বেলা আটটার সময় ৭ মাইল দূরে 'শিবানন্দী' চটীতে পৌঁছিলুম। এইটুকু পথ চোলে এত সকালে এখানে এসে আজ সমস্ত দিন এখানে অপেক্ষা করবার কিছুমাত্র ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু আট মাইলের মধ্যে আর কোন চটী নেই, আর এই পার্ব্বত্য পথ ভেঙ্গে সাত মাইল আসতেও পরিশ্রম কিছু কম হয়নি; বিশেষ আমার পীড়িত সঙ্গীগণ এখন পর্যান্ত এ চটীতে এসে পৌঁছুতে পারেন নি; হয় ত তাঁদের আরো দু তিন ঘণ্টা দেরী হবে মনে কোরে, শিবানন্দী চটীতেই আশ্রয় নিলুম। বেলা বেশী হয় নি; কিন্তু রৌদ্রের তেজ খুব প্রখর। পর্ব্বতের ধূসর দেহ উদ্ভাসিত কোরে সূর্য্যদেব পূর্ব্ব গগনের অনেক উর্দ্ধে উঠেছেন এবং তাঁহার উজ্জ্বল প্রভায় সমুচ্চ বৃক্ষরাজি হোতে পথপ্রান্তস্থ নিতান্ত ক্ষুদ্র গুল্ম পর্য্যন্ত যেন খুব একটা সজীবতা অনুভব কোচ্ছে। আমি পথে একটা গাছের ছায়ায় বোসে চারিদিক্ চেয়ে দেখ্তে লাগ্লুম। আমি যেন এ রাজ্যে একটি মাত্র প্রাণী, আর কোথাও জীবজন্তুর সম্পর্ক নেই; যেন এই নির্জ্জন প্রদেশে দিনের পর দিনগুলি অলসভাবে নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন অবস্থায় কেটে যাচ্ছে। এখানে এসে মনে হয়, এ জায়গাগুলি পৃথিবীর নিতান্তই বিজন নেপথ্য; মনুষ্যজীবনের দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা, বিপুল চেষ্টার সঙ্গে এদের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই। ব্যর্থ-মনোরথ হোয়ে কেউ যে এখানকার পথপ্রান্তে আপনার অবসন্ন জীবনের শেষ সীমায় পৌঁছিয়েছে, কি প্রবলবিক্রমে এই দুর্ভেদ্য শিলাতলে আপনার গৌরব-পতাকা প্রোথিত কোরেছে, এখানে বোসে তা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। তবু শিবানন্দী চটীতে মানুষের ক্ষুদ্র হস্তের অনেক কাজ এখনো দৃষ্টিগোচর হয়; আর এই জন্যেই বোধ হয়, সকল চটী অপেক্ষা শিবানন্দী চটী বেশী মনোরম বোধ হোয়েছিল। যে সময়ে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী অহল্যাবাই হরিদ্বার হোতে বদরিকাশ্রমের এই রাস্তা অনেক অর্থ-ব্যয়ে তৈয়েরী কোরে দেন, সেই সময় তিনি এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যে

মোহিত হোয়ে এখানে এক শিব প্রতিষ্ঠা করেন এবং অনেকগুলি কোঠাঘর প্রস্তুত করিয়া এই দুর্গম স্থানটিকে পথশ্রান্ত পথিকের যথেষ্ট বাসোপযোগী কোরে দেন। সেই হোতে এখানকার নাম শিবানন্দী হোয়েছে। এখনো অসংখ্য ধর্ম্ম-পিপাসু যাত্রী এই পথে যেতে যেতে রাণী অহল্যাবাইয়ের পবিত্র নামে জয়ধ্বনি করে, তার আত্মার মঙ্গলোদ্দেশে আশীর্ব্বাদ করে। তিনি কত দিন স্বর্গে চলে গিয়েছেন, কিন্তু এমন দিন নেই, যে দিন এখানে তাঁর নাম ভক্তির সঙ্গে উচ্চারিত না হয়।

সে অনেক কালের কথা—যখন শিবানন্দী চটী প্রতিষ্ঠিত হোয়েছিল। জনশূন্য পর্ব্বতের একটি জনশূন্য সংকীর্ণ উপত্যকায় একটি পবিত্র তুষার-ধবল দেবমন্দির, আর আশে পাশে ভক্ত যাত্রীদের জন্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্রামকক্ষ। কত দীর্ঘকাল ধোরে কত পর্য্যটক এই পান্থ-নিবাসে আপনাদের পথশ্রম অপনীত কোরেছে, তাদের সুখ-দুঃখময়, সন্দেহ ও ভক্তিমিশ্রিত ক্ষুদ্র জীবনের অতীত কাহিনী এই সমস্ত অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে আচ্ছন্ন কোরে রেখেছে। যে ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে তারা এই দুর্গম পর্ব্বতে সুদূর তীর্থযাত্রায় অগ্রসর হোয়েছিল, জানি না, তাতে তাদের মনে কতখানি শান্তি প্রদান কোরেছিল।

সেই প্রাচীন শিবানন্দী চটী এখনো আছে, কিন্তু পূর্ব্বের সেই গৌরব এবং শোভা-সমৃদ্ধি আর নেই। অট্টালিকার অনেকগুলিই ভেঙ্গে গিয়েছে; যেগুলি এখনো একটু ভাল আছে, তাও বাসোপযোগী নয়; তবে নিরুপায় যাত্রীর দল কোন রকমে এখানে এক রাত্রি কি দুই রাত্রি বাস কোরে, এবং রান্নাবান্না কোরে খায়; কিন্তু চটী ত্যাগ কর্‌বার সময় আর তা পরিষ্কার কোরে যাওয়া দরকার মনে করে না। এইজন্যে সংকীর্ণ ঘরগুলি ক্রমেই বেশী অপরিষ্কার হোচ্ছে; এই অপরিষ্কার ঘরে আর একদল যাত্রী এসে খাওয়ার আয়োজন কোর্ত্তে গেলে, তারা যে কতখানি বিরক্তি বোধ করে, তা বলাই বাহুল্য; তারাও উপায়ান্তর

না দেখে একটুখানি জায়গা পরিষ্কার কোরে নেয় এবং খাওয়া-দাওয়ার পর তা পরিষ্কার না কোরেই চোলে যায়; সুতরাং আবর্জ্জনার উপর আবর্জ্জনা স্তূপাকার হোয়ে উঠে।

শিবানন্দী চটীর সম্মুখে পাথরে বাঁধান বটগাছের তলে বোসে এই সকল কথা ভাব্‌ছি; পায়ের কাছ দিয়ে অলকনন্দা ললিত-তরল-গতিতে কুলকুল কোরে বোয়ে যাচ্ছে এবং নদীজলে উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হোয়ে পাষাণময় উচ্চ উপকূলকে মনোরম কোরে তুলেছে। এমন সময় শিবানন্দীর শিবের পূজারি ঠাকুর আমার কাছে উপস্থিত হোলেন। শিব এবং পূজারী উভয়ের দুরবস্থাই সমান। শিবের এখন প্রত্যহ দুই বেলা দূরের কথা, এক বেলা পূজা জোটে কি না সন্দেহ! আমাদের দেশের দুর্গোৎসবের সময় ব্রাহ্মণেরা যদি চণ্ডীপাঠ কোর্ত্তে কোর্ত্তে একেবারে দুই তিন পৃষ্ঠা উল্‌টোতে পারেন, তবে এ নির্জ্জন প্রদেশে শিব যে সপ্তাহান্তে একবার পূজা পাবেন, তার আর আশ্চর্য্য কি? পূজারীর সঙ্গে আলাপ কোরে জান্‌লুম, এখানে তিনি সপরিবারেই আছেন। অনেকগুলি ছেলে মেয়ে এবং সংসার এক রকম অচল; তাই তাঁকে পৌরোহিত্য ছাড়াও নানা রকমে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা কোর্ত্তে হয়। মন্দিরের কাছে যে অল্প জমী আছে তাতে মোটেই কিছু জন্মায় না, অন্য যে একটু আধটু জমী আছে, তাতে অল্প কয়েক কাঠা গম হয়; কিন্তু তাতে সংসার চালান দুষ্কর হয়; তাই সে অনেকগুলি ব্যবসা অবলম্বন কোরেছে। শিবানন্দীতে দোকান খুলেছে; যে কয়মাস যাত্রী চলে, সে কয়মাস কিছু কিছু উপায় হয়। দূরবর্ত্তী গ্রাম হোতে গম এনে ময়দা ও আটা প্রস্তুত কোরে, রুদ্রপ্রয়াগ কি কর্ণপ্রয়াগে বেচে আসে; ছাগল পোষে, তাও বিক্রী করে; কিন্তু কিছুতেই বেচারীর কুলিয়ে উঠে না! এতগুলি কাজ যার হাতে, তাকে দিয়ে নিত্য নিয়মিত শিবপূজার আশা দুরাশা মাত্র। আমাদের দেশে অনেক ঠাকুরবাটীর পূজারী রাঁধুনী

বামুন, তারা তাড়াতাড়ি পূজা শেষ কোরেই রাঁধ্‌তে যায়, সুতরাং পূজা কর্‌বার সময় পূজার মন্ত্রের কথা তাদের মনে হয় কি তরকারীর কথা মনে হয়, তা অনুমান-সাধ্য। সুতরাং পর্ব্বতবাসী এই দরিদ্র পুরোহিত যদি পূজার্চ্চনায় অবহেলা প্রকাশ করে ত সে অপরাধ মার্জ্জনীয়।

প্রায় দুঘণ্টা পরে সঙ্গীরা এসে জুটলেন। কোন্ ঘরে চাটি খাওয়া দাওয়া করা এবং একটু মাথা রাখ্‌বার জায়গা হোতে পারে, তাই অনুসন্ধান কোর্ত্তে লাগ্‌লুম। বহু অনুসন্ধানে ঠিক নদীর উপরে একটা দ্বিতল কোঠা আবিষ্কার করা গেল, অন্যান্য ঘরগুলি অপেক্ষা এইটি একটু প্রশস্ত এবং পরিষ্কার। আমরা সেখানেই আড্ডা ফেল্লুম। আজ সকালে সঙ্গী ভৃত্যটিকে বলেছিলুম যে, যদি তার শরীর অসুস্থ বোধ হয় ত আজও আমরা রুদ্রপ্রয়াগে থাকি; কিন্তু সে বোধ হয়, আমাদের অসুবিধা ভেবে নিজের প্রকৃত অবস্থা গোপন কোরে চল্‌তে চেয়েছিল। এই সাত মাইল রাস্তা এসে সে একেবারে হাঁপিয়ে পোড়লো, না পারে উঠ্‌তে, না পারে বোস্‌তে। রুদ্রপ্রয়াগে অনেক বিলম্ব হোয়ে গেল, এখানেও ভৃত্যটির এই রকম অবস্থা; এখানেই বা আর কয় দিন বিলম্ব হবে ভেবে বৈদান্তিক ভায়া বড়ই বিরক্ত হোলেন। হায় মায়াবাদী বৈদান্তিক! তোমার এই মায়াবাদ কি স্বার্থপরতার নামান্তর মাত্র! তুমি দুঃখ-দারিদ্র্য পদদলিত কোরে তীর্থস্থানে যেতে চাও, দরিদ্র প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন কোরে কাশীতে দেবালয় প্রতিষ্ঠা কোর্ত্তে চাও, ভগবানের অজস্র করুণা ও চির-গুনের মঙ্গলেচ্ছাকে ত্যাগ কোরে, বৈরাগ্যের হৃদয়হীনতাকেই সার পদার্থ বলে মনে কর? সকলে তোমার মত হোলে পৃথিবী এত দিন শ্মশান হোতো। অথবা তোমারই বা দোষ কি, আমাদের দেশের অনেক সাধু পুরুষের বৈরাগ্যই তোমার মত। তোমরা পিতা-মাতার গভীর স্নেহ উপেক্ষা কর, পত্নীর ব্যাকুল প্রেম-বন্ধন ছিন্ন কর, সে অতি কঠিন কাজ সন্দেহ নেই; কিন্তু তোমাদের এই ব্রত সার্থক

হোতো, যদি তোমরা তোমাদের এই ক্ষুদ্র প্রেম প্রসারিত কোর্ত্তে পারতে; পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ছেড়ে যদি পৃথিবীর লোককে আপনার করতে পারতে। কিন্তু তাও পারলে না এবং যা অল্প প্রেম তোমাদের ঐ রুদ্ধ নয়ন আলো কোরে ছিল, তা চির দিনের জন্যে নিবিয়ে ফেল্লে।—আমার মনের কথা মনেই রাখ্‌লুম, বৈদান্তিককে বলা আর আবশ্যক বোধ করলুম না; শুধু বললুম, বদরিনারায়ণ যাওয়া হোক্‌ আর নাই হোক্‌, এই রোগীর পাশে অনাহারে মরি, তাহাতেও আপত্তি নেই, কিন্তু এরকম হৃদয়হীনতা দেখিয়ে চোলে যেতে পারবো না। স্বামীজিও অবশ্যই আমার মতে মত দিলেন।

বৈদান্তিক ভায়া অবশেষে বিরক্ত হোয়ে আমাদের ছেড়ে যাবার উদ্যোগ কোল্লেন। আমি তাঁকে পথ-খরচের জন্য চার পাঁচ টাকা দিতে চাইলুম, কিন্তু তিনি তা নিলেন না। আমি তাঁকে অনেক বুঝুলুম,—বল্লুম, এ ভয়ানক পথে বিনা সম্বলে চল্‌তে নেই; চারিদিকে দুর্ভিক্ষ। এদিকে আস্‌তে প্রায় সকলেই সঙ্গে কিছু অর্থ নিয়ে আসে। যারা বিনা সম্বলে আসে, তারা হরিদ্বারে হৃষীকেশে বোসে থাকে। কোন ধনী শ্রেষ্ঠী বদরিনারায়ণ দর্শন কোর্ত্তে এলে, তিনি এই রকম সম্বলহীন একশ দুইশ—এমন কি, তিনশ পর্য্যন্ত সাধুকে নিজ ব্যয়ে নারায়ণ দর্শন করান। প্রতি বৎসরই পশ্চিম দেশ হোতে দশ পনের জন শ্রেষ্ঠী এই রকম তীর্থযাত্রা করেন। বৈদান্তিক আমাদের উপর বিরক্ত হোয়ে চোলে গেলেন। যাওয়ার সময় সঙ্গে নিলেন একটা কল্‌কে; কিন্তু শুধু কল্‌কে ত আর কারো কাজে লাগে না, কাজেই তাঁর কিছু তামাকের দরকার; তাঁর কাছেও তামাক ছিল না, লজ্জায় আমাকেও সে কথা বোল্‌তে পাচ্ছিলেন না, কিন্তু আমি তাঁর বিপদ্‌ বুঝে একটা দোকান হোতে এক সের মাখা তামাক কিনে দিলুম। যাওয়ার সময় বোধ হয়, আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন বোলে তাঁর একটু লজ্জা হোয়েছিল; তাই বেশী কিছু বল্‌তে পাল্লেন না। লোকটা নিতান্ত যখন চোলে

যাচ্চে, আমার তার প্রতি একটু মায়া হোলো—এতদিন এক সঙ্গে থাকা গিয়েছিল ;—আমি তাঁর হাত ধোরে বল্লুম, "কত সময় কত অন্যায় কথা বলেছি, আমার জন্যে কত কষ্ট সহ্য করেছেন, সে জন্যে কিছু মনে কোর্‌বেন না; আবার কত কালে দেখা হবে ; কখনো দেখা হবে কি না, কে জানে ?" তিনি চোলে যাওয়াতে আমার বড়ই কষ্ট হোতে লাগলো, কয়দিন এক সঙ্গে দুজনে বেশ সুখে ছিলুম। পথশ্রমের পর অনেকে হাত-পা ছড়িয়ে নিদ্রা দিয়ে সুখ ও আরাম পান, কিন্তু আমি এই বৈদান্তিকের সঙ্গে আজগুবি তর্ক কোরে পথশ্রম দূর কোর্ত্তুম।

বৈদান্তিক চোলে গেলে আমরা সেখানেই থাক্‌লুম। সন্ধ্যার সময় আমাদের চাকরটির জ্বর ছাড়্‌লো এবং সে বেশ স্বচ্ছন্দভাবে উঠে বেড়াতে লাগ্‌লো। আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় বেশ বুঝ্‌তে পাল্লুম যে, পর্ব্বতবাসীরা রোগে বিশেষ কাতর হয় না, তবে তাদের জ্বর যে রকম ভয়ানক হয়, তাতে তারা কাতর না হোলেও আমরা কাতর হই। রাত্রে সে খুব আহার কোর্‌লে।

২১ এ মে, বৃহস্পতিবার।—সকালে উঠে দেখি,চাকরটি যাত্রার জন্যে তৈয়েরী হোয়ে বোসে আছে। আমি তাকে বল্লুম, তার অসুখ একটু ভাল কোরে না সার্‌লে, পথশ্রমে সে মারা পড়বে ; কিন্তু বোধ হয়, তার মনে হোয়েছিল, তারই জন্যে বৈদান্তিক আমাদের ছেড়ে গেলেন, তাই সে যাওয়ার জন্যে কৃতসংকল্প হোলো। অনেকখানি বেলা হোলে আমরা সেখান হোতে রওনা হোলুম। রাস্তা অপেক্ষাকৃত ভাল, কিন্তু আট মাইলের মধ্যে আর চটী নেই, কাজেই আমরা তাড়াতাড়ি কোরে চল্‌তে লাগ্‌লুম এবং দুপুরের সময় পিপলচটীতে উপস্থিত হোলুম। একটা বটগাছ আছে, তারই নাম অনুসারে চটীর নাম 'পিপলচটী।'

এখানে একটা গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্মশালা আছে; কিন্তু পিপলচটীর মত কদর্য্য স্থান আর দেখি নি। আমরা এখানে এসে দেখ্‌লুম, এখানে

অনেক যাত্রী জড় হয়েছে, আমরাও কয়টি প্রাণী তাদের সঙ্গে মিশে যাত্রী-সংখ্যার বৃদ্ধি কোল্লুম।

একটা কথা বল্‌তে ভুল হোয়ে গিয়েছে। আমরা যখন পিপলচটীর কাছাকাছি এসেছি, সেই সময় দেখি বৈদান্তিক ভায়া শিবানন্দীর দিকে ফিরে যাচ্ছেন। তাঁকে দেখে আমার এমনি আনন্দ হোলো, আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধোল্লুম। তিনি বল্লেন "ভাই, তোমাদের ছেড়ে গিয়ে আমি কাজ ভাল করি নি—তোমাদের মনে ত কষ্ট দিয়েছিই, তা ছাড়া নিজে যে কষ্ট ভোগ করেছি, তার আর কি বোল্‌বো; শুন্‌লে তোমাদের ছেড়ে যাওয়ার জন্যে আমার অপরাধ মাপ কোর্‌বে।' আমরা পিপলচটীতে উপস্থিত হোয়ে তাঁর কথা শুন্‌তে লাগ্‌লুম। তিনি বল্লেন যে, রাত্রে তাঁর কিছু খাওয়া হয় নি; চার পাঁচ দল যাত্রী পিপলচটীতে রাত্রি বাস কোরেছিল বটে, কিন্তু কেউ তাঁকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করে নি। সমস্ত রাত্রি অনাহার,তার পর রাত্রে মাছির উৎপাতে অনিদ্রা। রাত্রে নাকি দশ বার হাজার মাছি তাঁকে অস্থির কোরে তুলেছিল। সকালে উঠে ক্ষুধার প্রকোপটা আরো খানিক বৃদ্ধি হয়েছিল এবং উপায়ান্তর না দেখে, তিনি দুই একজনের কাছে ভিক্ষেও চেয়েছি[illegible]লেন, কিন্তু এ বড় কঠিন পথ। সকলেই প্রায় ভিক্ষুক, তাঁকে কে [illegible] দেবে? তখন অনন্যগতি হোয়ে তাঁর সঙ্গে যে তামাক ছিল, তাই একটা দোকানে দিয়ে তার বদলে অল্প চানা ভাজা ও একটা পাকা 'কাঁচকলা' নিয়ে জঠরানল যৎকিঞ্চিৎ নিবৃত্তি কোরেছিলেন। কিন্তু ক্রমে যতই বেলা বাড়্‌তে লাগ্‌লো, ততই তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণায় অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌লেন; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাছে ফিরে যাবার ইচ্ছে তাঁর প্রবল হোয়ে উঠ্‌লো, এবং আমরা হয় তো আজ শিবানন্দীচটীতেই থাক্‌বো মনে কোরে তিনি আমাদের কাছে ফিরে যাচ্ছিলেন; পথে আমাদের সঙ্গে দেখা। তাঁর দুঃখের কষ্টের কথা শুনে আমার বড়ই দুঃখ হোলো।

বৈদান্তিক বলেছিলেন, রাত্রে দশবারো হাজার মাছি তাঁকে অস্থির কোরে তুলেছিল। পিপলচটীতে এসে মাছির আতিশয্য ও উৎপাত দেখে আমার এ কথাটা অসম্ভব বোলে মনে হোলো না। এত মাছি আর কোথাও দেখি নি; উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অনেক জায়গায় মাছির বংশবৃদ্ধির খুব পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এত বেশী নয়। এরা মানুষকে একেবারে পাগল কোরে তোলে। মাছির জ্বালায় আমাদের ধর্ম্মশালায় বসা অসম্ভব হোয়ে উঠ্‌লো। কোন রকমে এখানে দু তিন ঘণ্টা কাটান গেল।

রুদ্রপ্রয়াগ হোতে অলকনন্দার অপর পার দিয়ে যে নূতন রাস্তা বের হয়েছে, তা এখানে শেষ হোলো। এখানে একটা টানা সাঁকো দিয়ে রাস্তাটাকে এ পারের রাস্তার সঙ্গে যোগ কোরে দেওয়া হোয়েছে।

বৃদ্ধ স্বামীজি খানিক বিশ্রাম করবার আশায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পোড়েছিলেন, কিন্তু তাতেও মাছির হাত হোতে পরিত্রাণ নেই। কম্বলের যে এক আধটু ফাঁক ছিল, তারি মধ্য দিয়ে গিয়ে তারা তাঁকে আক্রমণ কোর্ত্তে লাগ্‌লো। এই দারুণ পথশ্রমের পর কোথায় একটু আরাম কোর্‌বো, না মাছির জ্বালায় অস্থির হোয়ে পোড়্‌লুম; শেষে যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় বেলা তিনটে না বাজতেই পিপলচটী হোতে বের হওয়া গেল।

কিছুদূর যেতে না যেতেই, আকাশে অল্প অল্প মেঘ দেখা গেল; আমরা প্রথমে সে দিকে বড় লক্ষ্য কল্লুম না, কিন্তু মেঘ ক্রমে সমস্ত আকাশ ঢেকে ফেল্লে, চারিদিক খুব অন্ধকার হোয়ে এলো এবং পরেই বেশ বাতাস উঠ্‌লো। ঝড়-জলে রাস্তায় বিপদে পড়া অসম্ভব নয় ভেবে, স্বামীজি নিকটস্থ একটা গহ্বরে আশ্রয় নিতে বোল্লেন, কিন্তু বৈদান্তিক ভায়ার সব উল্‌টো। যা কিছু ভাল যুক্তি, তিনি তার মধ্যে নেই। তাঁর পন্থা সকল কালেই স্বতন্ত্র, এমন কি, বিপদের সময়ও। তিনি বল্লেন, যখন বাতাস উঠেছে, তখন মেঘ এখনি উড়ে যাবে। এমন সামান্য সামান্য কারণে পথ চলা বন্ধ করা কোন কাজের কথা নয়।

কাজেই আমরা অগ্রসর হোলুম। রাস্তায় জনমানবের সাড়া-শব্দ নেই; আকাশের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হোতে লাগ্‌লো; কিন্তু নিকটে আর আশ্রয় মিল্‌বার উপায় নেই। যেই দুই একটা গুহায় আশ্রয় নেওয়া যেতে পার্‌তো, তা পিছনে ফেলে এসেছি। বড় গাছও নেই; আমরা যে পাহাড়ের উপর দিয়ে যাচ্ছি, তার গাছগুলি ছোট ছোট, কোন দিকে একটাও বড় গাছ নজরে পড়ে না।

ক্রমেই বাতাস বেশী হোতে লাগ্‌লো, শেষে রীতিমত ঝড় আরম্ভ হোলো। প্রতি মুহূর্তেই মনে হয়, পর্ব্বতশৃঙ্গ বুঝি মাথার উপর ভেঙ্গে পড়ে। অন্ধকার আকাশ, আর শন্ শন্ শব্দ; আমরা চারিটি প্রাণী সেই প্রলয় কাণ্ডের ভিতর দিয়ে চলচি, পদস্খলিত হোয়ে নীচে পড়্‌বার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। খানিক পরেই অল্প বৃষ্টি পোড়্‌তে লাগ্‌লো, আমরাও প্রাণের দায়ে যতদূর সাধ্য দ্রুতপদে আশ্রয়ের সন্ধানে চোল্‌তে লাগ্‌লুম। কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি বন্ধ হোয়ে মুষলধারে শিলাপাত আরম্ভ হোলো; তখন আমরা হতাশ হোয়ে পোড়লুম। এই পার্ব্বত্য দেশে যে রকম বড় বড় শিলা বর্ষণ হয়, আমাদের সমতল প্রদেশের অনভিজ্ঞ লোকদের তা বুঝিয়ে উঠা যায় না। এক একটা শিলা এক একটা বেলের মত, সুতরাং তা মাথায় পড়া দূরের কথা, শরীরে পোড়্‌লে শরীরের কি রকম দুর্দ্দশা হোতে পারে, তা কল্পনায় উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়। আমরা উপায়ান্তর না দেখে তাড়াতাড়ি পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিলুম, কিন্তু তাতে মাথা বাঁচান কঠিন দেখে কম্বলখানায় কয়েক ভাঁজ দিয়ে পুরু কোরে তা দিয়ে মাথা ও মুখ ঢেকে রাখ্‌লুম। গায়ের উপর দুই একটা শিল পোড়্‌তে লাগ্‌লো, এবং তাতে আমাদের অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত কোরে তুল্‌লে; কিন্তু উপায়ান্তর নেই, তবু আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, মাথাটা কোন রকমে রক্ষা হোলো, কিন্তু বোধ হতে লাগ্‌লো, শীতে বুঝি বুকের রক্ত জমে যায়।

শিলাবৃষ্টি ছেড়ে গেলে আমরা আবার উঠ্‌লুম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আকাশ বেশ পরিষ্কার হোয়ে গেল, এমন কি, শেষে রোদও উঠ্‌লো। সেই সান্ধ্যতপনের কনককিরণসিক্ত পার্ব্বত্য প্রকৃতি এক আশ্চর্য্য শোভা ধারণ কোরেছিল। ছোট ছোট গাছগুলি হোতে টোপে টোপে বৃষ্টি পোড়্‌ছে; পাহাড়ের গা বোয়ে নানা জায়গা হোতে নালা বের হোয়ে হু হু শব্দে নীচের দিকে যাচ্ছে; আর আকাশ পরিষ্কার দেখে পাখীর দল আনন্দের সঙ্গে কলরব কচ্ছে এবং ভিজে পাখা ঝেড়ে ফেল্‌ছে—এ দৃশ্য অতি সুন্দর। কিন্তু ভিজে কম্বল সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে এক গা বেদনা নিয়ে পথ চোল্‌তে চোল্‌তে আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্‌বার অবসর হয় নি। পাহাড়ে চোল্‌তে চোল্‌তে আমরা এই পাহাড়ী প্রদেশের একটা বৈচিত্র্য বেশ লক্ষ্য কর্‌ছি; কোথাও কিছু নেই, দেখ্‌তে দেখ্‌তে আকাশ মেঘে ঢেকে গেল, চারিদিক্ অন্ধকার কোরে তুমুল ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হোলো, তার পরেই দশ মিনিটের মধ্যে সব পরিষ্কার! এই বৃষ্টি, এই রোদ! আমাদের দেশের প্রকৃতির এমনতর চাঞ্চল্য প্রায়ই দেখা যায় না!

পিপলচটী হোতে কর্ণপ্রয়াগ পর্য্যন্ত রাস্তা সবে তিন মাইল মাত্র, কিন্তু এই তিন মাইল আস্‌তেই একেবারে আমাদের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ! একে ঝড়বৃষ্টি, শিলাপাত, তার উপর রাস্তা আগাগোড়া চড়াই; সে চড়াইও এক এক জায়গায় ঠিক সোজা। একে ত সহজ অবস্থাতেই তা বোয়ে উপরে উঠা কঠিন, তার পর বৃষ্টি হোয়ে পাথর ভিজে গিয়েছে; অত্যন্ত সাবধানে ধীরে ধীরে পা ফেলে আমাদের চোল্‌তে হোলো। বেলা প্রায় তিনটের সময় পিপলচটী হোতে বের হোয়ে এই তিন মাইল পথ অতিক্রম কোরে শীতে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে যখন কর্ণপ্রয়াগে উপস্থিত হোলুম, তখন বোধ হয় বেলা ৬টা। একটা মাদির কোঠার দ্বিতলে বাসা নেওয়া গেল।

———

কর্ণপ্রয়াগ

২২এ মে, শুক্রবার—কোন দুই নদীর সঙ্গম না হোলে প্রয়াগ হয় না। কর্ণপ্রয়াগে দুই নদীর সঙ্গম হোয়েছে, একটি অলকনন্দা অপরটি কর্ণ-গঙ্গা। কর্ণগঙ্গাকে ঠিক নদী বলা যায় না, এ একটা বড় রকমের বেগ-বতী ঝরণামাত্র। এখানে নদীর মত স্রোত বোয়ে জল আসে না; নদীর পরিসর দেড়শ হাত, কি কিছু বেশী হবে; কিন্তু তার অনেক জায়গাই শুকিয়ে গিয়েছে। যেখানে সাঁকো তৈয়েরী হয়েছে, তারই নীচে বড় বড় জলধারা! পাহাড়ে খুব বৃষ্টি হোলে হু হু শব্দে জল নেমে সমস্ত ডুবে যায়। এই নদীর নাম কর্ণগঙ্গা কেন হোলো, তার একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ এখানকার পাণ্ডাদের মুখে শুনতে পাও়া যায়। মহাবীর কর্ণ কিছুকাল এখানে তপস্যা করেন; মধ্যে একদিন তার অব-গাহনেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হোয়ে উঠে, এবং কিরূপে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয়, সেই চিন্তাতেই তিনি কিছু ব্যস্ত হয়ে পড়েন; কিন্তু তপোবলে তিনি দেবতাদের এত বাধ্য কোরে রেখেছিলেন যে, প্রয়াগে স্নান করবার জন্যে তাঁকে আর কোথাও যেতে হোলো না। পতিতপাবনী গঙ্গা সেখানেই এসে অলকনন্দার সঙ্গে মিশ্‌লেন। কর্ণের ক্ষুদ্র কুটীরদ্বারে প্রয়াগ হোলো; কর্ণজী সেই সঙ্গমস্থলে স্নান কোরে দেহ শীতল ও পবিত্র কোল্লেন। সেই হোতে এ নদীর নাম কর্ণগঙ্গা হোয়েছে। পর্ব্বতবাসী সরলচেতা বিশ্বস্তহৃদয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যখন এই পুরাণ কাহিনী গভীর বিশ্বা

সের সঙ্গে আমার কাছে বিবৃত কোরে, তখন এমন একটা ভক্তি ও নির্ভরের ভাবে তার উদার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হোয়ে উঠ্‌ল যে, তা দেখে আমার মনেও খুব আনন্দ হলো। শেষে গল্পের উপসংহার কালে যখন বোল্লে, "বাবুজি এইসা কাম ভগবান ভকৃত কি ওয়াস্তে হর ওয়াকাৎ কর্‌ হে"—এবং সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোল্লে, তখন বোধ হোলো ব্রাহ্মণ একালের অভক্তি ও বিশ্বাসহীনতা মনে কোরেই খানিকটে হতাশ হোয়ে পোড়েছে। বাস্তবিকই "এইসা কাম ভগবান্ ভকৃত কি ওয়াস্তে হর ওয়াকাৎ করতে হেঁ"—এটা তার প্রাণের কথা; যুক্তি তর্কের জঞ্জাল হোতে অনেকদূরে থেকে, এই রকম একটা কথার উপর নির্ভর কোরে এরা কত শান্তি ও সান্ত্বনা উপভোগ করে! আমাদের সরল বিশ্বাসটুকু অন্তর্হিত হোয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা মনের শান্তিটুকুও হারিয়েছি!

আজ কর্ণপ্রয়াগে অবস্থান করা যাবে স্থির করা গেল। বাজারের মধ্যে একটা দোকান ঘরের উপরতলায় আমরা বাসা নিলুম। বাজারে দোকান খুব বেশী নয়; তবে মোটামুটি জিনিস এখানে প্রায় সবই পাওয়া যায়, এমন কি একখানা দোকানে ছানার মুড়কিও পাওয়া গেল! দোকানগুলি সমস্তই পাহাড়ের গায়ে। আমরা যে দোকানে বাসা নিয়েছিলুম, তার ভিতরের দিক থেকে উর্দ্ধে পাহাড়ের গায়ে একটা সুন্দর কাঠাবাড়ী দেখলুম, বাড়ীটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমার প্রথমে মনে হোয়েছিল এ বুঝি কোনও ইংরেজের বাসস্থান, কিন্তু পরে জানতে পারলুম এটি "দাতব্য-চিকিৎসালয়"। এই দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে রোগীর চিকিৎসা ও সেবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এই ডাক্তারখানা তৈয়ারী কোরে দিয়েছেন, এতে যে কত যাত্রীর উপকার হয় তার সংখ্যা নেই। ডাক্তারখানা বারমাসই খোলা থাকে, কিন্তু বছরের সকল সময় এখানে রোগী দেখা যায় না। তীর্থভ্রমণোপলক্ষে এই সময়ই কিছু বেশী রোগীর আমদানী হয়। একবার ডাক্তারখানাটা দেখতে যাব ইচ্ছে কোল্লুম কিন্তু সকালে

আর ঘটে উঠ্‌ল না ; চাকরটাকে চিকিৎসার জন্যে পাঠিয়ে দিলুম, খানিক পরে সে কয়েকটা কুইনাইনের বড়ি নিয়ে ফিরে এলো।

আমাদের দেশ হোতে বদরিকাশ্রম যেতে হোলে হরিদ্বারের পথে কেউ চলে না। বাঙ্গালা, বিহার কি উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার লোক এখন অন্য একটা ভাল রাস্তা পেয়েছে। হাওড়া থেকে যে গাড়ী দিল্লী যায়, সেই গাড়ীতে চোড়ে কাশীর যাত্রীদের আগে মোগলসরাই নাম্‌তে হোতো। সেখান হোতে গঙ্গাপার হোলেই কাশী। এখন আর মোগলসরাই নেমে নৌকায় গঙ্গাপার হোয়ে কাশী দর্শন কোরতে হয় না; অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে মোগলসরাই থেকে বের হোয়েছে, এবং কাশীর নীচেই প্রকাণ্ড পুল হোয়েছে, তাই পার হোয়ে রাজঘাট ষ্টেশন নেমে গাড়ী বা নৌকায় লোকে কাশী যায়। কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির সেখান হোতে প্রায় এক মাইল হবে। তার পরেই "বেনারস সিটী ষ্টেশন।" আফিস আদালত সাহেবপাড়া সমস্তই সিকরোলের কাছে; এই সিকরোলের ভিতর দিয়ে অযোধ্যা রোহিলখণ্ড রেলওয়ে বরাবর চোলে গিয়েছে এবং অযোধ্যা পার হোয়ে লক্ষ্ণৌ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে একেবারে সাহারাণপুরে গিয়ে উত্তর-পশ্চিম রেলওয়ের সঙ্গে মিশেছে। এই অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলওয়েতে বেরেলীর একটা শাখা রেলওয়ে আছে। কাঠ-গুদাম পর্য্যন্ত সোজা উত্তরেও একটা শাখা রেলওয়ে আছে। কাঠগুদামে নেমে আল্‌মোড়ার মধ্যে দিয়ে একটা হাঁটা পথ পাওয়া যায়, এ পথটাও মন্দ নয়। এই পথ দিয়ে চোলে এসে কর্ণপ্রয়াগে বদরিনারায়ণের রাস্তায় পোড়তে হয়। এখান হতে যারা পরিক্রমণ কোর্‌বে অর্থাৎ প্রথমে কেদার-নাথ দর্শন কোরে তার পর বদরিকাশ্রমে যাবে, তারা কর্ণপ্রয়াগ হোতে নীচে নেমে রুদ্রপ্রয়াগ পর্য্যন্ত যায় এবং সেখান হোতে কেদারের পথে চোলে যায়; কেদার দর্শন কোরে আর সে পথে ফেরে না। সেই জায়গা হোতে আর একটা পথ এসে লালসাঙ্গা নামক একটা জায়গায়

বদরিকাশ্রমের রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। যারা এ পথ ধোরে যায়, তাদের শ্রীনগর কি দেবপ্রয়াগ দেখা হয় না।

আমরা কর্ণপ্রয়াগের সাঁকো পার হোয়ে অপর পারে সঙ্গম স্থানে স্নান কোল্লুম। শীতের ভয়ে রাস্তায় আমি স্নানকে যতদূর সম্ভব পরিহার কোরেছিলুম, কিন্তু এখানে এসে যদি নিদেন একটা ডুবও না দিয়ে এ জায়গাটা ছেড়ে যাই, তা হোলে কাজটা বড়ই খারাপ দেখাবে; আর যাই হোক, যমের কাছে ন্যায়সঙ্গত কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারবো না। অতএব অনেক আয়োজনের পর স্নান করা গেল। জল দারুণ ঠাণ্ডা, তবু এখন জ্যৈষ্ঠমাস! শীতকালে কি অবস্থা হয়, তা কল্পনাতেও ঠাহর হয় না।

সঙ্গমস্থলের উপরেই কর্ণবীরের এক প্রকাণ্ড জীর্ণ মন্দির; মহাবীর কর্ণ দ্বাপরের লোক, অন্ততঃ তাঁর ক্রিয়া কাণ্ড দ্বাপর ও কলির সন্ধিস্থলেই ঘটেছিল, কিন্তু এ মন্দিরটী দ্বাপরযুগের চেয়ে আধুনিক বোলে বোধ হোল না। এ পর্যান্ত যে সকল পতনোন্মুখ জীর্ণ মন্দির দেখিছি, তাদের যে কেউ সংস্কার করাবে, সে আশা কিছুমাত্র নেই, সুতরাং সে সমস্ত মন্দিরের অধিকাংশই দু'পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভূমিসাৎ হবে, এমন সম্ভাবনা দেখা যায়; এই কর্ণের মন্দিরেরও সে সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। মন্দিরের পুরোহিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কিন্তু এর স্থায়িত্বের প্রতি অগাধ বিশ্বাস; তিনি বোল্লেন যে, তাঁর বাল্যকাল হোতে মন্দিরের এই অবস্থা দেখে আস্‌চেন, কিন্তু যেখানে যতটুকু ফাটা ছিল, এই দীর্ঘকালে তার আধ ইঞ্চিও বেশী বাড়ে নি। মন্দিরটি পাথরের, চৌকাটও পাথরের, দ্বার লোহার। মন্দিরের মধ্যে প্রচণ্ড একটা ঘণ্টা ঝুলান আছে, সেই ঘণ্টাটি নেড়ে যাত্রীদের মন্দিরে প্রবেশ কোরতে হয়। ঘণ্টা নাড়া যদি অবশ্য কর্ত্তব্য হয়, তা হোলে আমি আমার ম্যালেরিয়া-গ্রস্তযকৃৎপ্লীহাধারী বঙ্গীয় ভ্রাতাদের সাবধান কোরছি, তাঁরা যেন

এখানে এই মন্দিরে প্রবেশ করবার দুঃসাহস প্রকাশ না করেন। যা হোক আমি বহুকষ্টে মন্দিরে প্রবেশ কোর্‌তে সমর্থ হোয়েছিলুম; তার মধ্যে মহাবীর কর্ণ ও তাঁর মহিষীর মূর্ত্তি বর্ত্তমান। মূর্ত্তি প্রস্তরনির্ম্মিত, খুব পুরাণ; তাতে কিন্তু শিল্পীর ভাস্করবিদ্যার যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। বহুমূল্য অলঙ্কারাদি কিছুই নেই; শুনা গেল, পূর্ব্বে ছিল, নেপাল যুদ্ধের সময় তা অপহৃত হোয়েছে। বীরবরের অবস্থা বড় শোচনীয়; যাত্রীদের কাছে থেকে যা কিছু পাওয়া যায়, তারই উপর তাঁকে ও তাঁর পুরোহিতকে নির্ভর কোরতে হয়। যাত্রীরা অনেকে সঙ্গমস্থলে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করে, তাতে পুরোহিত ঠাকুরের অল্প বিস্তর লাভ হয়।

কর্ণপ্রয়াগে অধিবাসীর সংখ্যা বেশী নয়। সকলেই বড় গরীব, অতি কষ্টে দিনপাত করে। আমাদের দেশের আউট পোষ্টের মত এখানে একটা ছোট থানা আছে। থানায় হেড কনেষ্টবল ও চার পাঁচজন কনেষ্টবল আছে, কনেষ্টবলেরা রাত্রে চৌকী দেয়। আমাদের দেশের কনেষ্টবল ও এখানকার কনেষ্টবলে কিছুই তফাৎ দেখলুম না; আমাদের দেশের প্রভুদের মত এরাও শিষ্টের দমন ও দুষ্টের পালন কোরে থাকে, এবং দু'পয়সা লাভের আশায় একজন নিরীহ ব্যক্তির সর্ব্বনাশ কোর্‌তে কিছুমাত্র আপত্তি বোধ করে না। এখানকার কনেষ্টবলদের যে রকম মেজাজ দেখা গেল, তাতে তারা যে কষ্ট স্বীকার কোরে প্রতি রাত্রে চৌকী দেয় এমন বোধ হোলো না; তবে আমরা এখানে যে দু'রাত্রি ছিলুম, সে দু'রাত্রেই এদের হাঁক দু'তিনবার কোরে শুনেছিলুম। পাঠক মহাশয় অনুগ্রহ কোরে মনে করবেন না যে, তারা আমাদের চোর বিবেচনা কোরে এতখানি সতর্কতা অবলম্বন কোরেছিল; তারা যদি সেই সিদ্ধান্ত কোরে এরকম সতর্ক হোতো, তবে তাদের প্রশংসা করবার কারণ ছিল; কিন্তু তারা এতখানি সতর্ক হয়েছিল তার কারণ, সেদিন ঐ বিভাগের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর পরিদর্শন উপলক্ষে এখানে উপস্থিত

ছিলেন। তাঁকে একটু কার্যপটুতা দেখান এরা অনাবশ্যক বোলে মনে করে নি।

অপরাহ্নে একাকীই ডাক্তারখানা দেখ্‌তে গেলুম। ডাক্তারটি নূতন লোক, সবে তিন দিন হলো এখানে এসেছেন। এই অশিক্ষিত লোকের মধ্যে নিঃসঙ্গ প্রবাসে তাঁর দিন যে কেমন কোরে কাট্‌চে তা আমি ঠিক কোরে উঠ্‌তে পাল্লুম না। এই তিন দিন একা থেকে বোধ হলো তিনি খানিকটা দোমে গিয়েছেন; তাঁর কাছে যেতেই তিনি আমাকে মহা সমাদরে গ্রহণ কোল্লেন। দুই একটা কথাতেই বুঝলুম, লোকটি বড় বিনয়ী। ডাক্তার বাবুর বয়স ত্রিশ বৎসরেরও কম বোলে বোধ হোলো। এঁর বাড়ী মুরাদাবাদের কাছে একটি গ্রামে, লাহোর মেডিকেল স্কুল থেকে ডাক্তারী পাশ কোরেছেন; আজ ছয় সাত বছর গবর্ণমেণ্টের চাকরী কোচ্ছেন। ইংরেজী বেশ ভাল না জানলেও কথাবার্ত্তা চলনসই বল্‌তে পারেন। আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ইংরেজীতেই আলাপ কোল্লেন, শেষে যখন আমার মুখে শুনলেন যে, আমি অনেকদিন থেকে পশ্চিমাঞ্চলে আছি, তখন ইংরেজী ছেড়ে হিন্দুস্থানীতে কথা আরম্ভ কোল্লেন।

খানিক পরে তাঁর সঙ্গে হাঁসপাতাল দেখ্‌তে গেলুম। সে দিন সেখানে দশবারো জন রোগী ছিল, তার মধ্যে একজনও বাঙ্গালী দেখা গেল না। রোগীদের উপর ডাক্তার বাবুর বড় যত্ন। শুধু কর্ত্তব্য বোলে যে তাঁর যত্ন তা বোধ হলো না; বাস্তবিকই তাদের জন্যে তাঁর একটু প্রাণের আগ্রহ দেখা গেল। হাঁসপাতাল দেখা হোলে পুনর্ব্বার তাঁর বিশ্রাম কক্ষে এসে বোসলুম। তাঁর টেবিলের উপর তিন চারখানা খবরের কাগজ দেখ্‌লুম, তার মধ্যে লাহোরের Tribune ও কলিকাতার অমৃতবাজার পত্রিকা ছিল; অনেকদিন পরে অমৃতবাজার হাতে পড়ায় মনে বড় আনন্দ হোলো। এই দুর্গম পাহাড়ের মধ্যেও অমৃতবাজার

আসে। আমাদের দেশের কাগজের এ রকম বিস্তৃতি লক্ষ্য কোরে মনে মধ্যে একটু অহঙ্কারও জন্মালো। অমৃতবাজার সম্পাদক মহাশয়ের উপর ডাক্তার বাবুর গভীর ভক্তি, তিনি তাঁকে এতদূর উচ্চ মনে করেন যে অনায়াসে আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "Is there any like of him in Bengal?" আমি উত্তরে তাঁকে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ সেনের নাম বোল্লুম। সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা তিনি লাহোরে একবার শুনেছিলেন, তাঁকে "Prophet of India" বোলে উল্লেখ কোল্লেন, এবং আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, আমি যে সুরেন্দ্র বাবুর নাম কল্লুম তিনি সেই বক্তা সুরেন্দ্র বাবু কি না! আমি উত্তর দিলে তিনি বল্লেন সুরেন্দ্রবাবু যে, সংবাদপত্রের সম্পাদক তা তিনি ইতিপূর্ব্বে জান্‌তেন না। যাহোক আমার কাছ থেকে তিনি বেঙ্গলী ও মিররের ঠিকানা লিখে নিলেন এবং বোল্লেন তিনি শীঘ্রই স্থানান্তরে বদলী হবেন. সেখানে গিয়েই এই পত্রিকা দু'খানা নেবেন।

আমাদের কথাবার্ত্তা হোচ্ছে এমন সময় আর একটী ভদ্র যুবক সেখানে উপস্থিত হোলেন। ডাক্তার বাবু তাঁকে সমাদর কোরে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। ইনিই পূর্ব্বকথিত পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর। এঁর বাড়ী অম্বালায়, লাহোর কালেজে বি, এ পর্য্যন্ত পোড়েছিলেন; কথাবার্ত্তায় যতদূর বুঝলুম, দেখলুম লোকটির বেশ পড়া শুনা আছে। আমার মত একজন ইংরেজী-জানা 'ইয়ংম্যান' তীর্থভ্রমণে এসেছে শুনে, তিনি খুব আশ্চর্য্য হোয়ে গেলেন! "সন্ন্যাসী চোর নয় যে চকায় ঘটায়"—এ প্রবচনটা আমার পক্ষে বেশ খেটে গেল। তিনি পুলিশের লোক, সুতরাং যে কথাটার সহজ অর্থ হয় তিনি তার কূটার্থ টেনে আনবেন এর আর আশ্চর্য্য কি?—তিনি সিদ্ধান্ত কোল্লেন যে, আমি নিশ্চয়ই কোন "পোলিটিক্যাল অবজেক্ট" নিয়ে বের হোয়েছি; এমন কি, আমার "অবজেক্টটা" কি, তাও জানবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা

কোল্লেন; কিন্তু বলা বাহুল্য, কৃতকার্য্য হোতে পাল্লেন না; তবে সে আমার দোষে কি তাঁর দোষে তা নিশ্চয় বলা যায় না। আমি কিন্তু তাঁকে যৎপরোনাস্তি আয়াসের সঙ্গে বুঝ্তে চেষ্টা কল্লুম যে, সেই জনহীন পাহাড়ের মধ্যে আমার মত একজন দুর্ব্বল বাঙ্গালীর কোন 'পলিটীক্যাল অবজেক্ট'ই সিদ্ধ হোতে পারে না। অবশেষে তিনি বল্লেন, "I cannot bring myself to believe that a man of culture like you has been taking so much trouble to go to see a shrine." আমি কি শুধু ভাঙ্গা মন্দিরে কতকগুলি বহু পুরাতন দেবমূর্ত্তি দেখ্বার জন্যে, অনাহারে অনিদ্রায় কঠোর পরিশ্রম কোরে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি?—এরা কি আমার কঙ্কালসার হৃদয়ের গভীর বেদনা নিবারণ কোর্তে পারে? পার্ব্বত্য নগ্ন সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির বিচিত্র দৃশ্য খরতোয়া বঙ্কিম গিরীনদীর রজত প্রবাহ ও সুশীতল সমীরণের অবারিত হিল্লোল, এরাই যে আমার জীবনের উপাস্য দেবতা, ইনেস্পক্টর তা বুঝতে পাল্লেন না।

যাহোক ইনেস্পক্টর বাবুর সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েও অনেক কথা হোলো। ক্রমে বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট, আইরিশ হোমরুল ও জাতীয় মহাসমিতি হোতে আরম্ভ কোরে আমাদের প্লীহা বৃদ্ধি ও তার সঙ্গে সাহেবদের ঘুঁসির নৈকট্য প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই আলোচনা করা গেল। ইনেস্পক্টর বাবু সেই দিনই চোলে যাবেন; তিনি তাঁর ঠিকানা আমাকে দিয়ে গেলেন এবং বোল্লেন যদি রাস্তায় কোন অসুবিধা হয় এবং কোনও স্থানে থানাওয়ালারা কোনও যাত্রীর উপর অত্যাচার করে, তা হোলে আমি যেন অবিলম্বে তাঁকে সে কথা জানাই। তাঁকে এ সমস্ত কথা জানালে, তিনি অত্যন্ত বাধিত হবেন এবং প্রতিকারের যথেষ্ট চেষ্টা কোরবেন। ইন্স্পক্টর বাবুর ভদ্রতায় আমি খুব আনন্দ লাভ কল্লুম।

ইন্স্পেক্টর বাবু চোলে গেলে আমিও উঠ্বার যোগাড় কোল্লুম,

কিন্তু ডাক্তার বাবু আমার জন্যে প্রচুর জলযোগের আয়োজন কোরেছিলেন; সুতরাং তাঁহাকে একটু বাধিত করা দরকার হলো। তাঁর কাছে বিদায় নেবার সময় তিনি আমার সঙ্গে কতকগুলি কুইনাইনের বড়ী, আমাশয়ের বড়ী প্রভৃতি তিন চার রকম দরকারী ঔষধ দিলেন। আমার নিজের কিছুই দরকার ছিল না, সে কথা তাঁকে বোল্লে তিনি উত্তর দিলেন যে, সেগুলি সঙ্গে থাকলে অন্ততঃ রাস্তাতেও কোন পীড়িত বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করা চল্‌বে। এর পর আর কোন কথা নেই। আমি তাঁকে হৃদয়ের সঙ্গে ধন্যবাদ দিয়ে ঔষধগুলি নিয়ে বাসায় ফিরে এলুম। তখন অপরাহ্ন ৫টা।

বাসায় এসে দেখি, সকলেই যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হোয়েছেন। আমাদের নন্দপ্রয়াগের পথে খানিকটে অগ্রসর হোয়ে থাকা দরকার; কারণ আগামী কাল চন্দ্রগ্রহণ, গ্রহণের ন্যায় শুভদিনে রাস্তায় কোন চটীতে না পোড়ে থেকে একেবারে নন্দপ্রয়াগে পৌঁছুতে সকলেরই আগ্রহ। সঙ্গীদ্বয় যদি এ অভিপ্রায় কিছুক্ষণ আগে ব্যক্ত কোত্তেন, তা হোলে অনায়াসে আরো দুঘণ্টা আগে বের হওয়া যেত। যাহোক সেই অপরাহ্নেই কর্ণপ্রয়াগ ছেড়ে চোলতে আরম্ভ কোল্লুম, বৈকালে বেশী পথ চলা যায় না, তার উপর পথ খুব খারাপ, পর পর শুধু চড়াই আর উৎরাই। কাজেই সন্ধ্যা লাগতে লাগতে কর্ণপ্রয়াগ থেকে তিন মাইলের বেশী যেতে পারি নি। যেখানে এসে সন্ধ্যা লাগ্‌লো, সে যায়গাটার নাম কাঙ্কা চটী।

আমরা কাঙ্কা চটীতেই রাত্রি কাটান স্থির কোল্লুম। এই চটীতে একখান মাত্র ঘর, তবে ঘরখানা একটু বড়—এই যা কথা। ঘর পাতা দিয়ে ছাওয়া, কোন দিকে বেড়া নেই। চটীওয়ালা বড় ভাল মানুষ, দোকানদার হলেও তার ব্যবহার বড় ভদ্র! এ দেশের চটিওয়ালারা ঘরভাড়া নেয় না, অধিকন্তু যাত্রীদের থালা, ঘটী, কড়াই প্রভৃতি দিয়ে

সাহায্য করে। প্রত্যেক চটিওয়ালার দোকানেই এ রকম সাত আট প্রস্থ জিনিস থাকে। রাস্তা যে রকম দুর্গম, তাতে নিজের শরীরকেই সময় সময় নিয়ে যাওয়া কঠিন, তার উপর যদি ঘটী বাটী প্রভৃতি সংসারের জিনিস বোয়ে নিয়ে যেতে হয়, তা হোলে শুধু আমাদের মত দুর্বল বাঙ্গালী কেন, অনেক কষ্টসহ হিন্দুস্থানীকেও এই পথে যাওয়ার অভিপ্রায় পরিত্যাগ কোর্‌তে হয়। তবু হিন্দুস্থানীরা কখন কখন দুই একটা অবশ্য-ব্যবহার্য্য জিনিস সঙ্গে নিয়ে আসে। চটীওয়ালাদের একটা নিয়ম আছে, তাদের দোকান থেকে আবশ্যক খাদ্যদ্রব্যাদি না কিনে, রাস্তার যেখানে সস্তা পাওয়া যায় এমন কোনও জায়গা থেকে যদি কিনে নিয়ে আসা যায়, তা হোলে চটীওয়ালা "থালি বর্ত্তন" (থালা বাটী ইত্যাদি বাসন) দেওয়া ত দূরের কথা, সে যাত্রীকে তাদের ঘরেই বোস্‌তে দেবে না; কারণ নারায়ণযাত্রীদের কাছ থেকে আশ্রয়স্থানের ভাড়া নেওয়া তাদের মতে মহাপাপ, অথচ নারয়ণযাত্রী যে তাদের আশ্রয় অভাবে গাছের তলায় পোড়ে শীতে মারা যাবে, তাতে তাদের অপরাধ হবে না! চটীওয়ালারা বলে যে, তাদের দোকান থেকে জিনিস কিন্‌লে যে লাভ হয়, তাতেই তাদের দোকানের ভাড়া ইত্যাদি পুষিয়ে যায়; সে ত আর ঘরের পয়সা ব্যয় কোরে সদাব্রত খোলে নি। এ কথার কোন বৈষয়িক উত্তর দেওয়া শক্ত। চটীতে কোনও বিছানা পাবার যো নেই, নিজের কম্বলই একমাত্র সম্বল।

তবু আমরা এখানে বেশ সুখে ছিলুম; চটীওয়ালা সকাল সকাল আমাদের খাওয়া দাওয়ার যোগাড় কোরে দিলে, এবং পুদিনা ও তেঁতুল দিয়ে সে নিজে এমন সুস্বাদু চাটনি তৈয়েরী কোর্‌লে, যার কথা বহুদিন আমাদের মনে থাক্‌বে।

আমরা পথশ্রমে কাতর হোয়েছিলুম, আহারাদির পর শয়ন করা গেল; কিন্তু আর সকল গুণ থাক্‌লেও চটীওয়ালার এক মহৎ দোষ ছিল, সে

কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় ধর্ম্মালাপী। সে আমাদের পাশে বোসে ধর্ম্মালাপ আরম্ভ কোরলে, এবং হনুমানজীর লেজের দৈর্ঘ্য, ভরতের বাঁটুলের গুরুত্ব ও ভীমসেনের আহারের পরিমাণ প্রভৃতি অসাধারণ বিষয়ে প্রশ্ন কোর্‌তে লাগ্‌লো। বলা বাহুল্য, আমাদের দ্বারা তার কৌতূহল নিবৃত্তির বড় সুবিধে হয় নি। বিশেষতঃ কানের গোড়ায় সে বক্ বক্ করাতে বৈদান্তিক ভায়া যে রকম অশান্তভাবে উঃ! আঃ! কোর্‌তে লাগলেন, তাতে আমার ভয় হলো, হয়তবা নিদ্রাকাতর অসহিষ্ণু বৈদান্তিক কিছু গোলযোগ বাধাবেন। যা হোক ক্রমে আমাদের সকলকে নিদ্রামগ্ন দেখে চটীওয়ালা বোধ করি ভগ্নোৎসাহে শুতে গিয়েছিল। শেষরাত্রে জেগে দেখি, আকাশ ভয়ানক অন্ধকার, মেঘে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন, অল্প অল্প বৃষ্টিও পোড়ছে। মেঘের গতিক দেখে সঙ্গীগণ বের হবেন কি না, তাই ইতস্ততঃ কোর্‌তে লাগলেন। আমি কথাবার্ত্তা না কোয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়্‌বার উদ্যোগ কোর্‌তে লাগলুম।

নন্দপ্রয়াগ

২৩ মে, শনিবার,—কয়েকদিন আগে বৈদান্তিক ভায়া শিলাবর্ষণের সুখ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কোরেছিলেন, আজ আকাশে এই রকম ঘোর ঘনঘটা দেখে চটী ত্যাগ করা সম্বন্ধে তাঁকে কিঞ্চিৎ উদাসীন দেখা গেল, এবং তিনি তাঁর ধূলিলাঞ্ছিত কম্বলখানিতে সর্ব্বশরীর ভাল কোরে ঢেকে, এই গুরু গম্ভীর মেঘগর্জ্জন ও ঝুপ ঝাপ বৃষ্টিপতনের মধ্যে আর একবার দীর্ঘনিদ্রার আয়োজন কোর্‌তে লাগলেন। আজ তাঁকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া আমি বাহুল্য বোধ কল্লুম না। টানাটানিতে তাঁর কম্বলখানির "নূতনত্ব" আরও একটু বাড়িয়ে তাঁকে আমাদের সঙ্গে যাত্রা কোর্‌তে বাধ্য

কল্লুম এবং বৃষ্টির মধ্যেই চল্‌তে আরম্ভ করা গেল; কিন্তু মেঘের অবস্থা দেখে কারো বুঝ্‌তে বাকী রইল না যে, আজ "গ্রহণদেখা" অসম্ভব! তবু যতটা পথ এগিয়ে থাকা যায়, সেই ভাল মনে কোরেই আমরা দুর্য্যোগের মধ্যেও চল্‌তে লাগলুম; বৈদান্তিক আমার পশ্চাতে নীরবে পথ অতিক্রম কোর্‌তে লাগলেন। আমার মস্তকে আশু বজ্রপাতের প্রার্থনা ছাড়া সে সময় যে তিনি অন্য কোনও চিন্তায় মনোনিবেশ কোরেছিলেন, এমন মনে হয় না।

রাস্তায় খানিকদূর এসে আমরা একটা পরিত্যক্ত দোতলা বাড়ী ও বাগান দেখ্‌তে পেলম; বাড়ীটী একে পরিত্যক্ত, তার উপর বহু প্রাচীন। তার পূর্ব্বেকার শোভা ও সম্পদ্ এখন সম্পূর্ণ অপহৃত হয়েছে; কিন্তু এই নির্জ্জন পার্ব্বত্য প্রদেশে, বৃক্ষরাজী-সমাচ্ছন্ন এই ভগ্ন অট্টালিকা আমার ন্যায় কল্পনাজীবীর চক্ষে এক নূতন কল্পনার রাজ্য খুলে দিলে! সেই বহুপূর্ব্বে যখন এই অট্টালিকা সমৃদ্ধ ও ধনপূর্ণ ছিল, সেই সময়ের একটা প্রশান্ত ও পবিত্র দৃশ্য আমার সম্মুখে বিকাশিত হোলো। যেন কোন তেজঃপুঞ্জসমন্বিত যোগিবর ঐ সম্মুখের বাঁধান বটমূলে বোসে প্রভাত-সূর্য্যের দিকে চেয়ে হৃদয়ের অন্তস্তল হোতে বিশ্বপিতার স্তুতিগান কোচ্ছেন এবং সেই গভীর মহান্ সঙ্গীতের প্রতিবর্ণ প্রভাতরাগরঞ্জিত স্তব্ধ বনস্থলীতে প্রতিধ্বনিত হোচ্ছে; সাধুর অগণ্য শিষ্যবৃন্দ চারিদিকে নানা কার্য্যে ব্যস্ত। কেহ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে মৃগচর্ম্মে বোসে ঊর্দ্ধমুখে সাম গান কোচ্ছেন, কেহ অপেক্ষাকৃত যুবক সাধুকে তত্ত্বো-পদেশ দিচ্ছেন, কেহ বা স্নানান্তে সর্ব্বশরীরে বিভূতি মেখে সুদীর্ঘ জটাপাশ রৌদ্রে ছেড়ে দিয়ে বোসে আছেন। বশিষ্ঠের আশ্রম, বিশ্বামিত্রের তপোবন, গৌরবসাম্পদ সকল জায়গার কথা ধীরে ধীরে আমার হৃদয় অধিকার কোর্‌লে। অতীত গৌরবের জীর্ণ সমাধি বুকের মধ্যে নিয়ে এই বিস্তীর্ণ অট্টালিকার বিদীর্ণপ্রায় পঞ্জরগুলি কত কাল থেকে এই নির্জ্জন

প্রদেশে একটা বিমল শান্তির উৎস খুলে দিয়েছে! কিন্তু তীর্থযাত্রীর মধ্যে কয়জন লোক এই পুণ্যাশ্রমের ভগ্নাবশেষ দেখে মুগ্ধ হয়? যে সব যাত্রী এই রাস্তায় চলে, তাদের মধ্যে বোধ করি অতি অল্প লোকই এই অট্টালিকায় প্রবেশ কোরে আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট কোরেছে। আমাদের আগে আগেও দুই একজন যাত্রী যাচ্ছিল। এই অট্টালিকার কাছে এসে উদাসীন ভাবে তারা একবার এর দিকে চাইলে, তারপর "মালুম হোতা কি হিঁয়া এক স্বামীজীকা আশ্রম থা!" এই পর্য্যন্ত বলেই সে স্থান ত্যাগ কোল্লে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই আশ্রমের প্রত্যেক বৃক্ষলতার সঙ্গে শান্তি, আনন্দ ও প্রেমের এমন একটা মাধুর্য্য বিজড়িত রয়েছে, এই ভগ্ন অট্টালিকার প্রত্যেক প্রাচীর এবং কক্ষগুলিতে এমন একটি নীরব ইতিহাস অঙ্কিত আছে, যা দৃষ্টিপথে না পোড়েই থাকতে পারে না।

বেলা তখন প্রায় ৯টা। বৃষ্টি একটু একটু থেমে গিয়েছে, রৌদ্রও উঠেছে। আমি সেই বাঁধা বটতলায় বোসে নানা কথা ভাবছি; মাথার উপর টুপ্‌টাপ কোরে বৃক্ষপল্লবচ্যুত জলবিন্দু পড়াতে একটা পুরাতন গান মনে পড়ে গেল,—

"আবার বল রে তরু প্রভাতকালে,
ধরা ভেসে যায় তোর নয়ন জলে,
না জেনে লোকে বলে শিশির পড়া জল রে!"

বাস্তবিক এ জায়গাটাতে এমন এক স্নিগ্ধ সৌম্যভাব মনের মধ্যে জাগিয়ে দেয় যে, ভগবানের করুণা ও প্রকৃতির বিশ্বব্যাপী সুশোভনত্ব স্বতঃই হৃদয় অধিকার করে।

আমার সঙ্গীরা আমার পিছে পিছে আস্‌ছিলেন। আমার অস্বাভাবিক গতি-বৃদ্ধি বশতঃই হোক, কি তাঁদের স্বাভাবিক ধীরতা বশতঃই হোক, তাঁরা অনেক পিছিয়ে পড়েছেন। তাঁদের পথ চেয়ে আমি এত

ক্ষণ এই ভগ্ন অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করি নি; ভাবছিলুম সকলে একত্রেই যাব, কিন্তু এক ঘণ্টা অপেক্ষা কোরেও যখন তাঁদের দেখ্‌তে পেলুম না, তখন একাই সেই নির্জ্জন অট্টালিকায় প্রবেশ কোল্লুম! দেখলুম অট্টালিকা জঙ্গলে পরিপূর্ণ হোয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনো দেওয়ালে ধূমরাশি লেগে আছে। কত দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত ধূম এই দেওয়ালে কোনও ব্রহ্মপরায়ণ সাধুর অনুষ্ঠিত পবিত্র হোমাগ্নির চিহ্ন অঙ্কিত কোরে রেখেছে! এই যজ্ঞধূমের সুগন্ধ এখনো যেন চারিপাশের বায়ুস্তর আমোদিত কোর্‌চে। প্রত্যেক ঘরেরই মাঝখানে এক একটা অগ্নিকুণ্ড; ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্যেই ইহা তৈয়েরী হোয়েছিল বলে মনে হোলো। নীচের পাঁচটা ঘরে আর কিছু নেই। উপরে উঠবার জন্যে সিঁড়ির সন্ধান কোর্ত্তে লাগলুম। বহু অনুসন্ধানে প্রায় গলদ্‌ঘর্ম্ম হোয়ে অনেকক্ষণ পরে একটা সিঁড়ি আবিষ্কার করা গেল। ধাপগুলি কতক বা ভেঙ্গে গিয়েছে আর কতকের উপর বড় বড় গাছ জন্মেছে। যা হোক বিশেষ সতর্ক হোয়ে উপরে উঠলুম; সম্মুখেই দেখি একটা প্রকাণ্ড হল ও তার যে পাশে নদী সেইদিকে দুটি ঘর, প্রত্যেক ঘরে নদীর দিকে চার পাঁচটা জানালা। জানালায় শুধু ফুকোর বর্ত্তমান, কপাট চৌকাট অনেক পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হোয়েছে।

উপরের হলটি আজও বেশ পরিষ্কার আছে। দেওয়ালে নানারকম ছবি আঁকা; দুই একটা ছবি মুছে গিয়েছে, কোন কোনটার রঙ্গ ময়লা। কিন্তু অনেক ছবির রঙ্গই বেশ উজ্জ্বল আছে। সকল ছবিই হিন্দুস্থানী ধরণের, এবং যে সকল রঙ্গে আঁকা হোয়েছে, সেগুলি অতি উৎকৃষ্ট। চিত্রকরও যে সুনিপুণ, তা ছবিগুলি একটু লক্ষ্য কোরে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারা যায়।

আমি ছবি দেখতে লাগলুম। প্রথমেই দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন নজরে পোড়ল। নাগরাজ শেষকে মন্থনরজ্জু কোরে দেব ও দানবে মহোৎ-

সাহে সমুদ্রমন্থন আরম্ভ কোরেছে; কোন্ দিকে দেবতার দল আর কোন্ দিকে দানবের দল তা চিনে নেওয়া একটু শক্ত। তবে দেব দানবের চেহারার মধ্যে এইটুকু পার্থক্য দেখা গেল যে, দেবতাদের চেহারা নিতান্ত ভালমানুষের মত, তাঁরা প্রায় সকলেই মুকুটধারী; আর দানবের চেহারা অনেকটা ডাকাতের মত; গাঁট্টাগোট্টা শরীর, মোটা-মোটা চোখ, এবং ঝাঁকড়া চুল। যেন তাদের শরীরের প্রত্যেক মাংস-পেশী হোতে একটা জাগ্রত উৎসাহ ও কার্য্যপরতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে; মুখে যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞার চিহ্ন সুস্পষ্ট অঙ্কিত। কিন্তু সব চেয়ে প্রধান বিশেষত্ব আমার বোধ হোলো, তাদের আকৃতির ও পরিচ্ছদের; —দুই-ই হিন্দুস্থানী ধরণের! আমাদের সেই সমতল বঙ্গভূমির ইন্দ্রের চেহারা কেমন বরের মত, কিন্তু এ পার্ব্বত্য প্রদেশে এই বাড়ীর দেও-য়ালে ইন্দ্র যে মূর্ত্তিতে বিরাজ কোচ্চেন, তাতে আমরা দূরের কথা, ইন্দ্রাণী স্বয়ং বাঙ্গলা মুলুক হোতে এখানে এসে দেবরাজকে খুঁজে নিতে পারেন, নিতান্ত চাক্ষুষ প্রমাণ ছাড়া একথা বিশ্বাস কোরতে পারি নে।

সমুদ্রমন্থনের পরবর্ত্তী চিত্র সীতার বিবাহ। নবজলধরকান্তি সৌম্য-মূর্ত্তি রামচন্দ্র হরধনু ভেঙ্গে বরের বেশে সভাতলে দাঁড়িয়ে আছেন। নতমুখ; কিন্তু বিনয় এবং সমাগত রাজা, ঋষি ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি এক সুগভীর সম্মানের ভরে সেই সুন্দর মুখ এক আশ্চর্য্য শোভা ধারণ কোরেছে; সীতাদেবী পুষ্পমালা হস্তে সেই বিবাহসভায় অগ্র-সর হোচ্চেন; সঙ্গে সুহাসিনী সুন্দরী সখীর দল। এই আনন্দপূর্ণ দিনে, বিপুল উৎসবের মধ্যে তাদের অসীম আনন্দ যেন তাদের হৃদয় মধ্যে আর বেঁধে রাখতে পারছে না। বর্ষাকালে নদীর জল যেমন নদীর পরিসর পরিপূর্ণ কোরে দুই কূল প্লাবিত করে, এদের হৃদয় পূর্ণ কোরে তেমনি সর্ব্বশরীরে একটা দুর্দ্দমনীয় চাঞ্চল্য উপস্থিত কোরেছে, এবং

সেই জন্যে তাদের আরো সুন্দর লাগ্‌ছে। লজ্জায় সীতা দেবীর মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে, এবং শত শত সভাসদ্‌বর্গের কৌতুকপূর্ণ স্থিরদৃষ্টি সেই লজ্জামণ্ডিত কোমল মুখখানির উপর যুগপৎ বর্ষিত হোয়ে তাঁকে আরো বিপন্ন কোরে তুলেছে ; কিন্তু তবু যেন হৃদয়ের প্রসন্নতা মুখে প্রতিফলিত হোচ্ছে। বিবাহ সভার একধারে লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন উপবিষ্ট; উচ্চ গৃহচূড়া থেকে উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী এবং শ্রুতকীর্ত্তি অলক্ষিত ভাবে তাঁদের দেখে অতিকষ্টে প্রবল হাস্যবেগ সংবরণ কচ্ছেন। এঁদের তিন ভাইয়ের আকার প্রকার ও বেশভুষায় আমি এমন কিছু দেখলুম না যাতে কোরে হঠাৎ এই রকম অপর্য্যাপ্ত হাসির আমদানী হোতে পারে ; তবে কথা এই যে, তরুণদের হাস্যের সর্ব্বদা সন্তোষজনক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা নেই, এবং আমি আশা করি যাঁদের সম্বন্ধে আমি হঠাৎ একটা মন্তব্য প্রকাশ কোরে ফেলেছি, তাঁদের সদয় হৃদয় আমাকে ক্ষমা কোর্‌তে কুণ্ঠিত হবে না।

সীতার বিবাহের পরই শিবের বিবাহের ছবি। স্ত্রী আচার হোচ্ছে ; এয়োরা বরকে চারিদিকে ঘিরে হুলাহুলি কোর্‌চে ; বর কিন্তু প্রশান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, এ আনন্দ স্রোতে তাঁকে কিছুমাত্র চঞ্চল কোর্‌তে পারে নি। বরের বিবাহ সাজ কিছুই দেখলুম না ; কারণ তিনি বিয়ে কোর্‌তে এসেও "ইউনিফর্ম্ম" ছাড়েন নি, এখনো পরণে সেই বাগছাল, গায়ে বিভূতি ও মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ জটার উপর উদ্যতফণা সর্প! বর দেখে, কোন কোন পুরনারী ভারি নিরাশ হোয়ে স্থানান্তরে দাঁড়িয়ে দুঃখ কোচ্ছেন। এই বিবাহের ঘটক নারদ। বৃদ্ধের বড়ই সাধ, তিনি একটু অন্তরাল থেকে স্ত্রী-আচারটি এক নজর দেখে নেন, কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য তিনি রমণীদের সর্ব্বত্রগামীদৃষ্টি এড়াতে পারেন নি, দুই তিনটি কুমারী ছুটে এসে একজন তাঁর কাপড়, একজন উত্তরীয়, এবং আর এক-জন তাঁর আবক্ষবিলম্বিত শুভ্রদাড়ীগুলি চেপে ধোরেছে। বুড়োর

সখও মন্দ নয়, বীণাযন্ত্রটী পর্য্যন্ত হাতে কোরে এসেছেন! নিজেকে নিতান্ত নিঃসহায়ভাবে কুমারীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে, বীণাযন্ত্রটি যাতে এ যাত্রা রক্ষা পায় সেই জন্য যন্ত্রসমেত দক্ষিণ হস্তখানি উর্দ্ধে তুলেছেন, এবং অন্য ছুটি কুমারী বীণাযন্ত্রটি কেড়ে নেবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কোচ্ছে। নারদ বেচারীর ব্যতিব্যস্ত ভাব দেখে আমার বড়ই হাসি এল!

তার পরই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের ছবি দেখতে পেলুম। অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ কোরেছেন; দ্রৌপদী তাঁকে বরমাল্য দিতে যাচ্ছেন, মধ্যপথে যেতে না যেতেই সমাগত ক্ষত্রিয় রাজগণ একযোগ হোয়ে যে যার অস্ত্র নিয়ে অর্জ্জুনের দিকে ছুটে চোল্‌ছেন, যেন তাঁদের প্রজ্বলিত ক্রোধ-বহ্নি তৃণের ন্যায় এখনি অর্জ্জুনকে দগ্ধ কোরবে। অর্জ্জুনের কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি শান্তমুখে ধীরভাবে যুধিষ্ঠিরের আদেশ প্রতীক্ষা কচ্চেন। সুদীর্ঘ হস্তে বিশাল ধনু ও সুতীক্ষ্ণ বাণ, যেন অগ্রজের সামান্য অঙ্গুলীসঙ্কেতমাত্রে এই অগণ্য শত্রুসমষ্টি নিপাতে প্রবৃত্ত হোতে পারেন। ধন্য চিত্রকর, যে তুলীর সামান্য চালনায় এই ছবি এঁকেছে। একদিকে অচঞ্চল বীর্য্য ও গাম্ভীর্য্য, অন্যদিকে ভ্রাতার প্রতি অসাধারণ নির্ভর। সম্মুখে মৃত্যুস্রোত ভীম গর্জ্জনে অগ্রসর হোচ্ছে, সে দিকে লক্ষ্য নেই; শুধু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কি অনুমতি করেন তাই জানবার জন্যে তাঁর দিকে বদ্ধদৃষ্টি।

দ্রৌপদী যেন এই আকস্মিক বিপদে কিঞ্চিৎ ভীতা হোয়েছেন; কিন্তু তিনি বীরের কন্যা, বীরকে পতিত্বে বরণ করবার জন্য অগ্রসর হোচ্ছেন, ভয় তাঁর সাজে না; তাই তাঁর মুখে ভয় অপেক্ষা কৌতুকের আবেশই বেশী পরিমাণে অঙ্কিত হোয়েছে। তিনি বিস্ফারিত নেত্রে সেই ক্রুদ্ধ রাজন্যবর্গের দিকে চেয়ে রোয়েছেন। এই বিপ্লববহ্নির মধ্যে তাঁকে একাকী দেখে পাঞ্চাল কুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন ত্রস্তপদে ভগিনীর দিকে অগ্রসর হোচ্ছেন, যেন তাঁর বীর হৃদয়ের দুর্ভেদ্য বর্ম্মে ছোট বোনটির নবীন সুকোমল দেহখানি এই ঘোর বিপদের মধ্যে রক্ষা করবেন।

আর একদিকে মল্লবেশে বীর বৃকোদর। যেন প্রচণ্ড সমরোল্লাস তাঁর বিরাট দেহকে অধীর কোরে তুলেছে। তিনি একটা প্রকাণ্ড গাছ উপ্‌ড়ে নিয়ে, তার আগার দিক্‌টা ধোরে শত্রুমণ্ডলীর উপর নিক্ষেপ করবার উপক্রম কোচ্ছেন। ভয়ে রাজগণ ইতস্ততঃ পলায়নপর! সকলের পশ্চাতে এক প্রকাণ্ড হস্তী; মাহুত তাকে ভীমের সম্মুখীন করবার জন্যে যথাসাধ্য বলে তার মাথায় ডাঙ্গস মারছে, কিন্তু গজরাজ বোধ করি বৃকোদরের হাতের সেই তরুবরের এক আধটা গুরু গম্ভীর প্রহার আস্বাদন কোরে থাক্‌বে, সুতরাং হস্তিপকের অঙ্কুশ তাড়না তার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ভেবেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌ছে। এক পাশে একখানি রথ, এই বৃক্ষের আঘাতেই চূর্ণমান। রথী ও সারথি বিপদ বুঝে পূর্ব্বেই চম্পট দিয়েছিলেন, কিন্তু কিয়দ্দূর যেতে না যেতে পরস্পরের ধাক্কায় ভূতলে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। রথীর শিরস্ত্রাণের উপর সারথির নাগরাজুতা শোভা পাচ্ছে! পলায়ন কোরেও সম্পূর্ণ নিরাপদ হবার সম্ভাবনা নেই দেখে দুজন ব্রাহ্মণ গলার পৈতা হাতে কোরে ধোরে ভীমসেনকে দেখাচ্ছে; তাদের ভয়চকিত মুখ ও কম্পমান দেহ দেখলেই মনে হয় যেন, তারা বোলছে, "মেরো না বাবা, এই দেখ আমরা ব্রাহ্মণ, আশীর্ব্বাদ কচ্চি, তোমার ভাল হবে।"—শেষের দৃশ্যটা দেখে না হেসে থাকা যায় না।

আরো কতকগুলো পৌরাণিক ছবি আছে। তার সমস্ত বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় না। যে গুলি মুছে গিয়েছে, অনেককষ্টে তাদের অর্থবোধ করা যায় বটে, কিন্তু আমি ততখানি কষ্ট স্বীকার করা দরকার বোধ করলুম না। সেই হলের ঘর হোতে নদীর দিকে যে দুটী কুঠরীর কথা বলেছি, তারই মধ্যে প্রবেশ কল্লুম। একটী কুঠরীর দেওয়ালে আমি যে একখানি পট দেখলুম, সেখানা কিন্তু আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছিল। হলের যে ছবিগুলির কথা উপরে বলেছি, তাতে নানারকম রঙ্গের জোগাড় কোরতে হয়েছিল এবং তুলীর দরকার হয়েছিল; কিন্তু আমি এখন যে ছবিখানার কথা বোলছি, তাতে সে সকল কিছুরই দরকার হয় নি। সন্ন্যাসীর আশ্রম,

এখানে কয়লার অভাব ছিল না। একখানি কয়লা দিয়ে দেওয়ালে কে মহাদেবের মূর্ত্তি এঁকে রেখেছে। মহাদেব ঘাড় হেট কোরে কোলে উঠ্‌তে উদ্যত-বাহু গণেশকে দুই হাত দিয়ে জোড়িয়ে ধোরেছেন, আর পাশে দাঁড়িয়ে পার্ব্বতী প্রসন্নমনে পিতা-পুত্রের এই স্নেহ-সম্মিলন দেখ্‌ছেন। কয়লা দিয়ে আঁকা বটে, কিন্তু তার প্রত্যেকটানে কতখানি মাধুরী, স্নেহ ও প্রেম ফুটে উঠেছে, তা হৃদয় দিয়ে অনুভব করা ছাড়া কালি কলমে লেখা যায় না। কোন সন্ন্যাসীরই অবশ্য এ ছবি আঁকা। হলের চিত্রের সঙ্গে এ ছবির যখন কোন সম্বন্ধই নেই, তখন আর কোন্ গৃহী ব্যক্তি এই সুদূর তীর্থে এসে ছবি আঁক্‌তে বোস্‌বে? কিন্তু সে যে একজন সুদক্ষ চিত্রকর ও সহৃদয় ব্যক্তি, তার আর সন্দেহ নেই। এই ছবি আঁক্‌বার সময় হয় ত তার স্নেহভালবাসাপূর্ণ সংসারের কথা মনে পড়েছিল; সে হয়ত প্রিয়তমার প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি ছেড়ে এসেছে, হয় ত প্রাণাধিক পুত্রের স্নেহবন্ধন-পাশ কাটিয়ে এসেছে, তাই তার ব্যথিত হৃদয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই দেওয়ালে অঙ্কিত কোরেছে·এবং সন্ন্যাস-জীবনের দীর্ঘ সঞ্চিত স্নেহ ও প্রেমের উন্মুক্ত স্মৃতি এই ছবির প্রত্যেক টানে বিন্দু বিন্দু কোরে ঢেলে দিয়ে তাকে সুশোভিত কোরে তুলেছে। হয়ত শুধু মহাদেব আঁকতেই তার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তার হৃদয় অজ্ঞাতসারে তার জীবনের ছবি এঁকে ফেলেছে; নতুবা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর সাধনভবনে এ পূর্ণ সংসারীর আলেখ্য কেন? আবার মনে হলো সন্ন্যাসী হয় ত এই মন্ত্রেরই উপাসক। মহাদেবের ন্যায় নির্লিপ্তসংসারী হবার জন্যে তার যোগ সাধন; কিন্তু এ নির্জ্জন স্থান তার উপযোগী নয়; এখানে পার্ব্বতীর হস্ত চিহ্ন কিছুই দেখা গেল না। যে বাড়ীতে একদিন রমণীর পদার্পণ হোয়েছে, সে বাড়ীতে গৃহলক্ষ্মীদের কোন না কোন চিহ্ন থাকেই। অবিবাহিতের গৃহ-কক্ষে যদি কোন দিন রমণী প্রবেশ করেন, তবে তাঁর সুকোমল কর সেই গৃহের বহুকালের সঞ্চিত বিশৃঙ্খলা বিদূরিত করে; কিন্তু এই পার্ব্বত্য-গৃহে কখন যে কোন গৃহলক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হোয়েছে, তা

আমার বোধ হোলো না। এই কয়লার আঁকা সেই ছবির সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমার কত অতীত কথা মনে এল; একটি ক্ষুদ্র বালিকার কোমলস্মৃতি বুকের মধ্যে একটা ব্যথা জাগিয়ে তুল্‌লে। হায়, সে যদি আজ এ পৃথিবীতে থাকৃতো!

আমি এখানে দাঁড়িয়ে নিবিষ্টচিত্তে এই সকল কথা ভাব্‌চি, হঠাৎ বৈদান্তিকের উচ্চ কণ্ঠস্বর আমার কাণে প্রবেশ কল্লে। এমন একটা যায়গায় আমি আড্ডা নিয়েছি ঠিক কোরে, বৈদান্তিক বাহিরে থেকে আমাকে ডাকাডাকি কোচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে দেখি, ভায়া গাছতলায় বোসে; আমাকে দেখে বল্লেন, সকালে তাড়াতাড়ি বেধেছিল, এই দারুণ শীতে দস্তুর মত ভিজোলে, তবে ছাড়লে। এখন যে যাবার কথা নেই, অভিপ্রায়টা কি?—আমি বল্লুম, আমার আর অভিপ্রায় কি থাকবে? আপনারা যে রকম গজগমনে আসছেন, তা তীর্থ-ভ্রমণের উপযোগী নয়; আমি ত আর আপনাদের ফেলে যেতে পারি নে, তাই এখানে এই বাড়ীটীর ভিতর একটু অপেক্ষা কোচ্ছিলুম, আসুন চল্‌তে আরম্ভ করি। চল্‌তে আরম্ভ কর্‌বো কি, স্বামীজীর দেখা নেই! একটু অপেক্ষা কোরে তাঁর খোঁজে বাহির হওয়া গেল। কোথাও তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না। শেষে দেখি তিনি খানিক দূরে একটি পঞ্চবটীবেষ্টিত লতামণ্ডপ আবিষ্কার কোরে, তার মধ্যে থেকে ভিজে পাতাগুলি সরিয়ে, ভিজে মাটীতেই শুয়ে রাজার মত আরাম উপভোগ কচ্ছেন! তিনি বোল্লেন, এমন সুন্দর স্থান অল্পই দেখা যায়। তাঁর এই কথার প্রতিবাদ কর্‌বার কিছু ছিল না, কিন্তু এখানে শুয়ে তাঁর আরাম ভোগের রকমটা আমার বড়ই হাস্যজনক বোলে বোধ হোয়েছিল!

কাল্‌কা চটি থেকে নন্দ-প্রয়াগ সাত মাইল। এ সাত মাইল রাস্তা বেশ ভাল, এর মধ্যে বেশী চড়াই উৎরাই নেই। আমরা চল্‌তে আরম্ভ কোরে খানিক দূরে একটা আশ্রম দেখ্‌লুম। আশ্রমটি রাস্তার উপরে,

কয়েকখানা কুটীর, তাতে অনেকগুলি সন্ন্যাসী। কিছুদিন আগে আমার বাসার চোর চাকরটা সন্ন্যাসী সেজে খুব আড়ম্বরের সঙ্গে "বম্ বম্" কোচ্ছিল, সে কথা পাঠকেরা জানেন ; এ সন্ন্যাসীগুলোও সেই দলের। তারা সেখানে বোসে কেউ কেউ জটলা কোচ্ছে, কেউ নিজেকে খুব উচু গলায় কোন বিখ্যাত সাধুর চেয়ে বড় প্রতিপন্ন কোরে বিলক্ষণ আত্ম-প্রসাদ অনুভব কোচ্ছে, কেউ বা সমস্তই বৃথা ভেবে যৎপরোনাস্তি উৎ-সাহের সঙ্গে গঞ্জিকাদেবীর সেবা কোচ্ছে! বলা বাহুল্য আমরা সেখানে দাঁড়ালুম না ; তারা আমাদের সাধু দেখে অভ্যর্থনার ক্রটী কোল্লে না ; দু-তিনটে গাঁজার কোল্‌কে আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে গঞ্জিকা-পানে "জবাকুসুমসঙ্কাশং"-লোহিত চক্ষু কপালে তুলে বোল্লে "থোড়া তামাকু পি জে!"। আমরা ত "পিজের" মধ্যেই নই ; এক বৈদান্তিক তামাকখোর ; কিন্তু গাঁজার গন্ধে তিনি দশ হাত তফাতে সোরে দাঁড়া-লেন : সুতরাং আমাদের কারো দ্বারা এই সন্ন্যাসীদের খাতির রহিল না। সাধু হোয়ে আমরা এ রকম কোরে গাঁজার কোলকের অপমান কোর্ত্তে সাহস কল্লুম দেখে, বেচারীদের বিস্ময় ও বিরক্তির সীমা রইল না। চল্‌তে চল্‌তে ফিরে তাকিয়ে দেখ্‌লুম, তারা একবার আমা[illegible] দিকে কটাক্ষপাত কোচ্ছে, আর কি যেন বোল্‌ছে ; অনুমান হলো আমরা যে "ভণ্ড সাধু" এই কথা নিয়ে তাদের মধ্যে একটা আলোচনা চোল্‌চে।

বেলা এগারটার সময় আমরা নন্দ-প্রয়াগে পৌছলুম। এখানে নন্দার সঙ্গে অলকনন্দার সঙ্গম হোয়েছে। কারো কারো মতে অলকনন্দার সঙ্গে নন্দার সঙ্গম হোয়েই এখান হোতে অলকনন্দা নাম হোয়েছে। এসব নন্দা যে সশরীরে এই পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে, আমাদের সে জ্ঞান ছিল না ; ছেলেবেলায় ভূগোলে পড়বার সময় এ সকল নামের সঙ্গে পরিচয় না হওয়ায় এগুলিকে স্বর্গরাজ্যের সামিল ধোরে রেখেছিলুম। এখন দেখ্‌ছি সেগুলি স্বর্গের নয়, এই মর্ত্ত্যেরই জলধারা। বাস্তবিকই

আমাদের দেশ যদি পৃথিবী হয়, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অনুর্ব্বর ক্ষেত্র যদি পৃথিবী হয়, মাড়োয়ারের দগ্ধ মৃত্তিকা যদি পৃথিবী হয়, তা হোলে যারা এ স্থানকে স্বর্গ বোলে উল্লেখ কোরে গেছেন, তাঁরা অন্যায় করেন নি। মানুষের কর্ম্মফল যদি মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবার কারণ হয়, তা হোলে আমার পক্ষে তার বড় একটা সম্ভাবনা দেখছি নে। তবে আমার সান্ত্বনা এই, আমি মনে করি আমার এ জীবনেই স্বর্গবাস হোয়ে গিয়েছে, এ সব দেশে যা আছে তার চেয়ে আর বেশী কি স্বর্গে থাকবে? কিন্তু আমি ঢেঁকী, স্বর্গেও ধান ভেনেছিলুম; আর সেই জন্যেই বুঝি, স্বর্গভ্রষ্ট হোয়ে এখানে এসেও আবার ধান ভানতে আরম্ভ কোরেছি। জীবনটা ধান ভানতেই গেল! তবে যে মধ্যে মধ্যে 'শিবের গীত' গাই, সে কেবল দশজনের অনুরোধে; কিন্তু দুঃখ, তাও ভাল কোরে গাওয়া হয় না।

নন্দায় তখনো জল ছিল কিন্তু বেশী নয়, তাতে নদীর মধ্যেকার পাথরগুলি ডুবিয়ে রাখতে পারে। আমরা যেখানে পার হোয়ে নন্দ-প্রয়াগ বাজারে পৌছলুম, সেখানে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড আছে, তারই পাশ দিয়ে জলের ধারা কলকল শব্দে অতি বেগে বোয়ে চোলেছে। যেখানে বড় পাথর নেই, সেখানে জলধারা বেশ দেখা যাচ্ছে। যেখানে জলধারা পাথরের আড়ালে পোড়ে দেখা যাচ্ছে না, সেখান হোতেই অবিশ্রান্ত কল কল শব্দ উত্থিত হোচ্ছে। আমরা একটা থেকে আর একটা পাথরে অতি সাবধানে পা ফেলে, জলে পা না ঠেকিয়েই, নন্দা পার হোয়ে বাজারে উপস্থিত হোলুম। বর্ষাকালে কিন্তু এ রকম কোরে নন্দা পার হওয়া যায় না। অল্প দূরে যে একটা সাঁকো আছে, তখন তারই উপর দিয়ে নদী পার হোয়ে বাজারে ও সঙ্গমস্থলে আসতে হয়।

বাজারে একটা দোতালা ঘরে বাসা করা গেল। নীচে দোকান, উপরে আমাদের বাসা। আগাগোড়া কাঠের ঘর, কেবল মাথার উপরে শ্লেট্ পাথর দিয়ে ছাওয়া। আমরা যে ঘরটায় ছিলুম, তার একটা

বারান্দা বাজারের রাস্তার দিকে ; আমরা সেই বারান্দা দখল কোরে বসলুম। দুপুরে আমরা কিছু খাওয়া দাওয়া কল্লুম না। বৈকালে বাজার দেখ্‌তে বাহির হওয়া গেল। অনেকগুলি দোকান, আর তাতে অনেক জিনিস পত্র বিক্রী হোচ্ছে। বোল্‌তে গেলে শ্রীনগরের পর আর এমন বাজার এ পথের মধ্যে দেখি নি। বাজারে প্রায় সকল জিনিসই পাওয়া যায়। আমরা রাত্রের জন্যে খাওয়া দাওয়ার একটু বিশেষ বন্দোবস্ত কোল্লুম।

খানিক পরে আবার বাহির হোয়ে পড়া গেল। স্বামীজী ও বৈদান্তিক বাসায় থাক্‌লেন। বাজারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, দেখি দুজন বাঙ্গালী পুরুষ এবং তিন চার জন স্ত্রীলোক একটা দোকানে বোসে আছে। তাদের দেখেই আমার মনে এমন একটা আনন্দ উথ্‌লে উঠলো, তা যাঁরা দূর প্রবাসে দীর্ঘকাল পরে একজন আত্মীয়কে দেখেছেন, তাঁরাই শুধু বুঝ্‌তে পারবেন। আমি তাঁদের কাছে যেতেই তাঁরা পরম আগ্রহে আমাকে সেখানে বোস্‌তে বোল্লেন। তাঁদের মুখে শুন্‌লুম, তাঁরা আগের বৎসরে নারায়ণ দর্শন করবার জন্যে এসেছিলেন ; রাস্তায় অনেক নিষেধ করেছিল, কিন্তু তাঁরা কারো কথা না শুনে এতখানি রাস্তা এসেছিলেন। শুন্‌লুম, তাঁরা কাটগুদামের পথে এসেছিলেন। এখানে এসে আর অগ্রসর হোতে পারেন নি, কারণ শীতও অসম্ভব, আর তাঁদের বিশ্বাস জন্মেছিল যে, সেবার নারায়ণের দ্বার খোলা হয় নি। দুর্ভিক্ষের জন্য যাত্রী-আসা বন্ধ কোরে দেওয়াতেই বোধ হয় তাঁদের এ রকম ধারণা হোয়েছিল। তাঁরা নারায়ণ দর্শন কোর্ত্তে এসেছেন ; এত অর্থব্যয় কষ্ট সহ্য কোরে এতটা পথ এসে পোড়েছেন, সম্মুখে আর আট নয় দিনের রাস্তা বাকি, এরকম অবস্থায় যদি তাঁরা ফিরে যান, তা হোলে হয় তো জীবনে আর নারায়ণ দর্শন নাও ঘট্‌তে পারে। এই সমস্ত কথা ভেবে এই এক বৎসর এখানে অপেক্ষা কোচ্ছেন, এবং সংবাদ লিখে ডাকে বাড়ী হোতে

খরচ পত্র আনিয়ে এই দোকান ঘরে বাস কোচ্চেন; অভিপ্রায় একটি বার মাত্র নারায়ণ দর্শন কোরবেন। কি ভক্তি! স্বীকার করি, তাঁদের ভক্তি স্বার্থপরতামিশ্রিত, হয় ত পরকালে অক্ষয় স্বর্গলাভের প্রলোভনেই তারা এই কষ্টকর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হোয়েছিলেন; কিন্তু বাঞ্ছিতের প্রতি এমন অসাধারণ একনিষ্ঠা, এ শুধু প্রশংসনীয় নয়, অনুকরণীয়।

এবার যখন পাণ্ডারা সর্ব্বপ্রথমে নারায়ণের দ্বার খুল্‌তে যায়, তখন এই কয়েকজন লোকও তাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। নারায়ণ দর্শন কোরে কাল তাঁরা এখানে ফিরে এসেছেন, আজ এখানে বিশ্রাম কোরে আগামী কাল দেশে ফিরে যাবেন। তাঁরা বোল্লেন যে, তাঁদের যাবার সময় সমস্ত বদ্‌রিকাশ্রম বরফে ঢেকে ছিল, এমন কি নারায়ণের প্রকাণ্ড মন্দিরের চূড়া অতি অল্পই দেখা যাচ্ছিল। এই জন্যে দিনকতক তাঁদের খানিকটা দূরে অপেক্ষা কোর্ত্তে হোয়েছিল। বরফ গল্‌তে আরম্ভ হোলো, দু চার দিন পরে তাঁরা অগ্রসর হোয়েছিলেন! কিন্তু তবুও পাণ্ডাদের ও তাঁদের মন্দির পর্য্যন্ত যেতে জায়গায় জায়গায় বরফ কেটে রাস্তা কোর্‌তে হোয়েছিল!

তাঁরা আগামী কাল বাঙ্গালাদেশ যাবেন শুনে, আপনা হোতেই প্রাণের মধ্যে কেমনতর কোরে উঠ্‌লো;—সেই বাঙ্গালাদেশ—যেখানে আমার ঘরবাড়ী আছে, এবং আজন্মের বন্ধু বান্ধবেরা যেখানে বিচরণ কোরছেন—তখন মনে পোড়লো,—কত কি ছেড়ে এসেছি! মায়ার বন্ধন কি কঠিন!

এই স্বদেশীয়দের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধোরে কথাবার্ত্তা কহার পর সেখানে হোতে উঠ্‌লুম। তখন সন্ধ্যা হোয়ে এসেছে। আমাদের বাসার সম্মুখে রাস্তার পরপারেই এক প্রকাণ্ড মহাদেবের মন্দির। সন্ধ্যার সময় সেখানে কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো; অনবরত দামামা বাজ্‌তে লাগলো; মধ্যে-মধ্যে সুস্বরে বাঁশী বাজ্‌তে লাগলো এবং মন্দির মধ্যে ও প্রাঙ্গণে বাজা

রের সব লোক একত্রিত হলো। স্ত্রী পুরুষ দেবতার সম্মুখে নিঃসঙ্কোচে গায় গায় এসে দাঁড়ালো। আমি অপরিচিত পথিক, এক পাশে দাঁড়িয়ে এই পবিত্র দৃশ্য দেখতে লাগলুম। কি তাদের সুন্দর মুখশ্রী, কি তাদের প্রবল নিষ্ঠা; এক সুগভীর ধর্ম্মভাব যেন তাদের সরল হৃদয়কে পরিপূর্ণ কোরে ফেলেছে। যখন সন্ধ্যার আরতি শেষ হলো, শঙ্খ ঘণ্টার রব ধীরে ধীরে সেই নৈশ আকাশে বিলীন হোয়ে গেল এবং "ব্যোম কেদার" বোলে সকলে ভক্তিভাবে প্রণাম কোল্লে, তখন এক অতি অনির্ব্বচনীয় ভাবে হৃদয় পূর্ণ কোরে আমি ধীরে ধীরে বাসায় ফিরে এলুম। আস্‌তে আস্‌তে একটা কবিতা আমার মনে পোড়ে গেল,—

"যোগী নাই পাই নাই পরমার্থ জ্ঞান,
বেদান্তের প্রতিপাদ্য চিনি না চিন্ময়ে,
আস্তিকের নাস্তিকের শুনিনি বিধান,
জানি না কি লেখে তন্ত্র পুরাণ নিচয়ে।
জানি এই, যোগী যারে ধেয়ায় হৃদয়ে,
সরলা বালিকা পূজে পুষ্প অর্ঘ্য দিয়া,
সেই বিশ্বপতি দেবে সায়াহ্ণ সময়ে,
সুখী হই, ভক্তিভাবে হৃদে আরাধিয়া॥"

সন্ধ্যার পর বাজারের মধ্যে আর একটু ঘুরে দেখা গেল। বাজারের অধিকাংশ দোকানের সঙ্গেই যাত্রীদের বাসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঘর আছে; কেহ বা দোকানঘরের মধ্যে ও দ্বিতলে যাত্রী-বাসের জন্য ঘর রেখেছে; দেখলুম সমস্ত বাজারে তিন চারশতের বেশী যাত্রী থাকতে পারে না।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল; সন্ধ্যার পর একটু একটু কোরে চারিদিকে মেঘ জমা হোতে লাগলো। যারা গ্রহণ দেখবার আশায় বোসেছিল, তাদের অদৃষ্টে আর গ্রহণ দেখা হোলো না। খানিক পরে খুব মেঘ কোরে বৃষ্টি এল। অনেকদিন পরে একটু ভাল রকম

আহার হোলো, বৈদান্তিক ভায়া এই কয় দিনের অর্দ্ধাশন পরিপূর্ণ মাত্রায় পুষিয়ে নিলেন। আহারাদির পর সেই ঝুপ্‌ঝাপ্‌ বৃষ্টির মধ্যে যখন কম্বলখানা গায়ে জড়িয়ে শয়ন করা গেল, তখন বোধ হোলো এমন আরাম বহুদিন উপভোগ করা হয় নি।

যোশীমঠের পথে

২৭ মে, রবিবার,—অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ আমাদের উঠ্‌তে একটু বেশী দেরী হোয়েছিল। তখন সূর্য্য উঠেছে, কিন্তু তখনো চারিদিকে মেঘ বেশ ঘন হোয়েছিল, আর সেই মেঘের মধ্য দিয়ে অল্প অল্প সূর্য্য-কিরণ জলসিক্ত পার্ব্বত্য প্রকৃতির উপর এক একবার প্রতিফলিত হোচ্ছিল; সে এমন সুন্দর যে সহজেই একটা কিছুর সঙ্গে তার উপমা দেবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু যার সঙ্গে উপমা দেওয়া যেতে পারে এমন কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার মনে হোলো কোন সুন্দরীর বড় বড় জলভরা চোখের উপর মুখে যদি একটুখানি হাসি ফুটে ওঠে ত সে অনেকটা এই রকম দেখায়। প্রভাত সূর্য্যের সেই সতেজ, প্রদীপ্ত রশ্মির চেয়ে এই মেঘাবৃত প্রভা কেমন মধুর ও সরস! বাজারের উপর সেই খোলা বারান্দায় বোসে গিরিপ্রাচীরবেষ্টিত এই সুন্দর ক্ষুদ্র নগরটির প্রাভাতিক শোভা দেখে, আমার চক্ষু জুড়িয়ে গেল কিন্তু বেশীক্ষণ এ শোভা উপ-ভোগ করবার অবসর পেলুম না, স্বামীজী ও বৈদান্তিক সুসজ্জিত হোয়ে আমার পাশে এসে দর্শন দিলেন; সুতরাং বাঙ্‌নিষ্পত্তি না কোরে নেমে পড়া গেল, দোকানদারের প্রাপ্য চুকিয়ে দিতে আর বেশী বিলম্ব হোলো না।

রাস্তায় বেরিয়ে দেখি চারিদিক্ হোতে কল কল কোরে ঝরণা ছুটছে, সুতরাং অনুমান করা কঠিন হোলো না যে, রাত্রে অসম্ভব রকম বৃষ্টি হোয়ে গিয়েছে এবং সেই সঙ্গে বুঝ্লুম, গত রাত্রে আমরা কুম্ভকর্ণের 'এক্টিনী' কোরেছিলুম। একটু অগ্রসর হোয়েই দেখি সেই বাঙ্গালী যাত্রীর দল নন্দপ্রয়াগের বাজারে তাঁদের এক বৎসরের ঘর দুয়োর ছেড়ে রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত হোয়েছেন। তাঁদের বিদায় দেবার জন্যে বাজারের অনেক লোক সেখানে জমা হোয়েছে। দশদিন যেখানে বাস করা যায়, সেখানকার লোকজন, এমন কি গাছ পালার উপরও একটা স্নেহ জন্মায়, তা পাঁচটি বাঙ্গালী স্ত্রী পুরুষ এক বৎসর কাল এই পর্ব্বতে ক্ষুদ্র একটা বাজারের মধ্যে বাস কোরে সকলেরই পরিচিত এবং অনেকের আত্মীয় হোয়ে উঠবেন এ আর আশ্চর্য্য কি? আমি সে দোকানের সম্মুখ থেকে সহজে চোলে যেতে পাল্লুম না, আমার মনে নানা ভাবের উদয় হোলো। স্ত্রীলোক তিনটির মধ্যে কেউ কোন পাহাড়ীর ধূলো মাটী মাখা মেয়েকে কোলে নিয়ে মুখচুম্বন কোচ্ছেন; মেয়েটা এতখানি আদরের কোন কারণই খুঁজে না পেয়ে অবাক্ হোয়ে রয়েছে কারণ সে বুঝতে পাচ্ছে না এক বৎসর কাল ধোরে সে যাঁদের [illegible] আদর পেয়েছে, আজ এই তাঁদের শেষ আদর; আর তাঁরা এ জীবনে তাকে দেখতে আস্বেন না। একজন বাঙ্গালী রমণী একটি যুবতীর গলা ধোরে চক্ষের জল ফেলছেন; তাঁর এই এক বৎসরের সঞ্চিত স্নেহ মমতা যেন চোখের জলে উথ্লে উঠ্‌চে। যুবতীও তার দেশগত কাঠিন্য ভুলে স্নেহশীলা বালিকার মত রোদন কোচ্ছে। কোথায় সেই সুদূর পূর্ব্বের শস্যশ্যামল সমতল বঙ্গের অন্তঃপুরচারিকা, আর কোথায় এই হিমালয়ের ক্রোড়স্থ পাষাণ প্রাচীরবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র নগরের হিন্দুস্থানী যুবতী! পরস্পরের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ, কিন্তু ভালবাসা এমন দুটী বিসদৃশ প্রাণীকে এই এক বৎসরের মধ্যেই কি দৃঢ়রূপে এক সঙ্গে বেঁধে

ফেলেছে! তাই আজ তারা দেশ কাল ভুলে পরস্পরের জন্যে অশ্রু বিসর্জন কোচ্ছে। আমি এই দৃশ্যে একবারে মুগ্ধ হোয়ে গেলুম; এই দৃশ্য আমার কতকাল মনে থাকবে! আমরা তিন জন একটু তফাতে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছি, ছেলের দল আমাদের সম্মুখে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে; বাঙ্গালীর জন্যে, আমারই যারা ভাই বোনের মত, তাদের জন্যে এই পাহাড়ীদের এত স্নেহ, এত আগ্রহ; কে জানে, পাহাড়ের অনুর্ব্বর কঠিন প্রদেশেও আমাদের জন্য করুণার কোমল উৎস শতমুখে প্রবাহিত হোতে পারে?

পাহাড়ীদের কাছে বিদায় নেওয়া শেষ হোলে, তাঁরা আমাদের কাছে বিদায় নিতে এলেন। তাঁরা ছেড়ে যাবেন, আমার প্রাণের মধ্যে কেমন কোরে উঠলো; জানিনে বিদেশে দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হোলে, তাদের প্রতি এমন টান হয় কেন? বোধ হয় দেশের একটা লুপ্তস্মৃতি মনের মধ্যে হঠাৎ জেগে প্রীতিপ্রবাহে হৃদয় ভাসিয়ে দেয়, তাই তখন আমরা আত্মপর ভুলে যাই; শুধু মনে হয়, এরা যে দেশের, আমিও সেই দেশের, এঁরা আমার স্বদেশবাসী, আমার আত্মীয়। তাই সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই প্রিয়তম জন্মভূমির কথা মনে হোলো। কোথায় আমরা কোন্ অজানিত, বিপদ্‌পূর্ণ বরফের রাজ্যে যাচ্ছি, আর এঁরা চিরবাঞ্ছিত জন্মভূমিতে আত্মীয় বন্ধুগণের মধ্যে ফিরে যাচ্ছেন। এ যাত্রা হোতে যে এ জীবনে ফিরে আস্‌বো, সে কথা কে বোল্‌বে; মনে পড়্‌লো, সেই বহুদিন আগে যখন কল্‌কাতায় থেকে পড়া শুনা কোর্‌তুম, সে সময় মধ্যে মধ্যে বন্ধুবান্ধবদের গাড়ীতে তুলে দিতে সিয়ালদহ ষ্টেসনে যেতুম; তাঁরা যখন গাড়িতে চোড়ে বস্‌তেন, গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে, সে সময় দেশে যাবার জন্যে প্রাণে কেমন একটা ব্যাকুলতা উপস্থিত হোত। সে দিন সমস্ত দিন আর কোন কাজেই মন লাগ্‌তো না, শুধু বাড়ীর স্নেহ-কোমল স্মৃতি নিরাশাপূর্ণ চপল চিত্তকে অধীর কোরে তুল্‌তো। আজ অনেক বৎসরের পরে, বহু দূরে এই পর্ব্বতের মধ্যে কয়জন বাঙ্গালী স্ত্রী পুরুষকে

দেশে যেতে দেগে মনে সেই ভাব জেগে উঠ্‌লো। এখন ঘরে মা নেই, বাপ নেই, স্ত্রী নেই, পুত্র নেই; গৃহ অরণ্যের ন্যায় বিজন; তবু সেই প্রাচীন স্মৃতির সমাধিমন্দিরে ফিরে যেতে মন অস্থির হোয়ে উঠ্‌লো। অনাহারে, ফল মূল মাত্র আহার কোরে কত দীর্ঘ দিন কাটিয়ে দিয়েছি, সঙ্গে কম্বল ভিন্ন সম্বল নেই, তারই উপর কত বিনিদ্র রাত্রিই অতিবাহিত হোয়েছে। পরিশ্রমেও কাতর নই, কিন্তু হায়, কোথায় সন্ন্যাসীর সংযম, কোথায় মনের দৃঢ়তা? মনুষ্যহৃদয় যৎপরোনাস্তি দুর্ব্বল ও অত্যন্ত অসার।

কাতর হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণচক্ষে এক রাত্রির পরিচিত বাঙ্গালী যাত্রীদের বহুদিনের পরিচিত আত্মীয়ের ন্যায় বিদায় দিলুম এবং যতক্ষণ তাঁদের দেখা যায়, ততক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম। তাঁরা অদৃশ্য হোলে ক্ষীণ পদবিক্ষেপে অগ্রসর হোতে লাগ্‌লুম। সঙ্গীদ্বয়ের মনে যে কোন রকম ভাবান্তর উপস্থিত হোয়েছিল, তা বোধ হোলো না; কারণ তাঁরা আজ খুব তেজে চল্‌তে লাগলেন। আমার মনই আজ উৎসাহশূন্য; আমি সকলের পিছনে পড়ে রইলুম।

ছ'মাইল এসে একটা টানা সাঁকো পার হোয়ে লালসাঙ্গায় পৌঁছান গেল। যারা রুদ্রপ্রয়াগ হোতে কেদারনাথ দর্শন কোর্ত্তে যায়, তারা এখানে এসে বদরীনারায়ণের পথে মেশে। রুদ্রপ্রয়াগ হোতে আমরা অলকানন্দার ধারে এসেছি; কেদারযাত্রীগণ রুদ্রপ্রয়াগে অলকানন্দা পার হোয়ে মন্দাকিনীর ধারে ধারে কেদারের দিকে যায়। কেদার দর্শন কোরে আবার চার দিনের রাস্তা হোটে এসে ডাইনের রাস্তা ধোরে এই লালসাঙ্গায় বদরিকাশ্রমের রাস্তায় পড়ে। লালসাঙ্গায় দোকানের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। গঙ্গা অনেক নীচে, সেখানে নামা উঠা করা বড় কঠিন ব্যাপার, এবং সকলে এই কষ্টসাধ্য কাজে প্রবৃত্তও হয় না, কারণ পাহাড়ের গায়ে যে তিনটে উৎকৃষ্ট জলের ঝরণা আছে, তাতেই সকলের কাজ চোলে যায়।

লালসাঙ্গায় এসে আমরা একটা ছোট দোকানঘরে বাসা নিলুম; জায়গাটা তেমন নির্জ্জন নয়। কেদারনাথ এবং বদরিকাশ্রম উভয় পথের যাত্রীই এখানে সমবেত হয়, সুতরাং প্রায় সর্ব্বদাই এ স্থানটা সরগরম থাকে। এখানেও একটা থানা ও একটা দাতব্য চিকিৎসালয় আছে; এই দুইটি বেশ বড় রকমের। প্রথমে থানা দেখে পরে চিকিৎসালয়টি দেখ্‌তে যাব, এ রকমের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু এখানে পৌছিয়ে থানায় যে এক ব্যাপারের গল্প শুনা গেল, তাতে আর কোথাও যেতে প্রবৃত্তি হলো না। ব্যাপারটা আবার আমাদেরই নিয়ে; আমাদের অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের। পাঠক হয় ত গল্পটী শুন্‌বার জন্যে একটু উদ্‌গ্রীব হয়েছেন, সুতরাং সাধুসন্ন্যাসীদের পক্ষে গৌরবজনক না হোলেও আমাকে এখানে ব্যাপারটি খুলে বোল্‌তে হোচ্ছে। ব্যাপার আর কিছু নয়, একজন স্বামীজি—অবশ্য অনেক তীর্থ ভ্রমণ এবং প্রচুর ডাল রুটীর সর্ব্বনাশ কোরেছেন—সেইদিন সকালে চোর বলে ধৃত হোয়েছেন। চুরীর জিনিসও বড় বেশী নয়। এক দোকানদারের এক জোড়া ছেঁড়া নাগরা জুতো! স্বামীজির স্কন্ধবিলম্বিত ঝোলার মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাশে শততালিবিশিষ্ট, ধূলিধূসরিত সেই অনিন্দ্য সুন্দর নাগরা জুতা শোভা পাচ্ছিল। বেচারা রাত্রে এক দোকানে ছিল; অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গীতাদি পাঠ হোয়েছে, দোকানদার সাধু-সৎকারেরও ত্রুটি করে নি; কিন্তু সাধুর নিতান্তই গ্রহের ফের সকালে চোলে যাবার সময় সে দোকানদারের নাগরা জোড়াটা ভুলে ঝোলার মধ্যে তুলে নিয়ে "যঃ পলায়তি স জীবতি" কোচ্ছিল। এ দিকে দোকানদারেরও সকালে উঠে কোথায় যাবার আবশ্যক হয়; সে জুতো নেই! ঐ সন্ন্যাসী ছাড়া তার দোকানে আর কেউ ছিল না, কিন্তু এই ঘোর কলিকালে জুতো যে সন্ন্যাসীর অনুগ্রহে একরাত্রে হঠাৎ জ্যান্ত গরু হোয়ে মাঠে চোরতে যাবে, নিতান্ত ছাতুখোর হোলেও দোকানদারের মনে এমন সম্ভাবনাটা কিছুতেই স্থান পায় নি। সুতরাং সেই সন্ন্যাসীকে ধোরে

লালসাঙ্গার থানায় উপস্থিত কোর্‌লে। শুন্‌লুম, অনেক লোক সেখানে একত্র হোয়ে স্বামীজির যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা কোচ্ছে এবং সন্ন্যাসী জাতির উপরও অনেক ভদ্রতাবিরুদ্ধ অপরাধ আরোপিত হোচ্ছে। অতএব এ অবস্থায় সেখানে গিয়ে দু'চারটে মিষ্ট সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত হওয়ার চেয়ে দোকানদারের মুখে মুখে সবিশেষ শুনাই কর্ত্তব্য মনে কোল্লুম। আরও এক কারণে সেখানে যাওয়া হয় নি; শুনলুম চোর সন্ন্যাসী "পূরবিয়া" অর্থাৎ পূর্ব্বদেশবাসী; পূর্ব্বদেশবাসীকে—কাশী, অযোধ্যা, বিহার, বাঙ্গালা এই সকল দেশের অধিবাসীকে এ দেশের লোক পূরবিয়া বলে সুতরাং এই চোর সন্ন্যাসীর বাড়ী এই সকল দেশের কোথাও হইলে সে আমার এক দেশবাসী, কারণ আমরা দুজনেই পূরবিয়া; অকারণ কে এমন 'চোরের জাত ভাই' হওয়ার অপবাদ ঘাড়ে কোর্ত্তে যায়? বিশেষ আমরা যখন দোকানে বোসে চোরের গল্প শুনছিলুম, সেই সময় দু'তিনজন লোক, দেখে বোধ হোলো পাঞ্জাবী, আমাদের দোকানের সমুখ দিয়ে চোরের কথা বোল্‌তে বোলতে যাচ্ছিল। আমাদের দেখেই হোক, কি কথা প্রসঙ্গেই হউক, একজন বোল্লে "তামাম্ পূরবিয়া আদ্‌মী চোট্টা হ্যায়!" কথাটা অম্লান বদনে হজম করা গেল; একে বিদেশ, তাতে রাস্তার লোকের কথা এ কথার আর কে প্রতিবাদ কোরবে? কিন্তু দেখ্‌লুম, হুজুগে এরাও আমাদের চেয়ে কিছু কম নয়। দুপুর বেলা যতক্ষণ ছিলুম, সকলের মুখেই সেই চোর সন্ন্যাসীর কথা! বোধ হোলো এরা এই পাহাড়ের মধ্যে এক ভাবেই জীবন কাটিয়ে কিছু নূতনত্বের অভাবে দারুণ বিমর্ষ হোয়ে পোড়েছিল, আজ এই এক 'নূতন' হুজুগ জোটায় এই ভয়ানক শীতে এরা দিন কতক একটু বেশ সজীবতা অনুভব কোর্‌বে।

বেলা থাকৃতে থাকৃতেই সেখান হোতে বের হোয়ে তিন মাইল দূরে 'বওলা' চটিতে উপস্থিত হওয়া গেল। তখন সন্ধ্যা গাঢ় হোয়ে আস্‌ছিল; আকাশ পরিষ্কার, দূরে দূরে দু'পাঁচটা বড় বড় নক্ষত্র; পশ্চিম আকাশে

অস্তমিত তপনের লোহিত রাগ অতি সামান্য প্রকাশ পাচ্ছিল এবং আমাদের আগে পাছে চারিদিকে ধূসর পর্ব্বতশ্রেণী বিরাট পাষাণ প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে ছিল। সেই গগনস্পর্শী স্তূপাকার অন্ধকাররাশির দিকে তাকিয়ে ভয় ও ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হোয়ে যায়। জগতের কোন গভীর রহস্যে পাষাণ বক্ষ পূর্ণ কোরে কত যুগ যুগান্তর হোতে এরা এমনি এখানে দাঁড়িয়ে আছে, কে বোল্‌তে পারে? আমার মত সংসারতাপক্লিষ্ট পথিক কত দিন হয় ত এমনি সময় এখানে দাঁড়িয়ে এই গম্ভীর দৃশ্য দেখে এই কথাই চিন্তা কোরেছে। চটিতে বিশ্রাম কর্‌বার জন্যে অল্প জায়গা পাওয়া গেল, কিন্তু রাত্রে আর কিছু আহার জুট্‌লো না। শয়ন করা গেল বটে কিন্তু রাত্রির সঙ্গে শীতে হৃৎকম্প বৃদ্ধি হোতে লাগলো। কি ভয়ানক শীত, আমরা একদিনও এমন শীতের হাতে পড়িনি। কম্বলের সাধ্য কি এ শীতকে দমন করে! স্বামীজি ও বৈদান্তিক একটু গরম হবার অভিপ্রায়ে আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিলেন। আমার আবার সে অভ্যাস নেই, নিতান্ত পক্ষে যদি নাক বের না কোরে রাখি ত দম আটকে মারা যাবার উপক্রম ঘটে; কিন্তু নাক খুলে রাখাতে বোধ হোতে লাগলো রাজ্যের জমাট শীত আর কোন থান দিয়ে সুবিধা না পেয়ে সেই পথেই বুকের মধ্যে প্রবেশ কোচ্চে। চটিওয়ালা আবার এর উপর জানিয়ে দিলে যে, আজ শীতের আরম্ভ মাত্র! এই যদি আরম্ভ হয় তবে শেস না জানি কি রকম; আমার কল্পনা শক্তি সে কথা ভাবতে দেহখানির মতই আড়ষ্ট হোয়ে পড়লো। অত্যন্ত কষ্টে রাত্রি কেটে গেল। এই প্রবল শীতে আমার ভাল রকম ঘুম হয় নি, কিন্তু বৈদান্তিক ভায়ার নাসিকা গর্জ্জন সমস্ত রাত্রিই অপ্রতিহত ভাবে চোলেছিল।

২৫ মে, সোমবার,—খুব সকালে উঠে রওনা হওয়া গেল। কন্‌কনে শীত, দুইপাশে উঁচু অসমান পাহাড়, পাহাড়ের গা দিয়ে আঁকাবাঁকা অপ্রশস্ত রাস্তা। সেই রাস্তা ধোরে আমরা চল্‌তে লাগলুম। এদিকে

ক্রমেই গাছপালা সমস্ত কোমে আস্‌চে ; আমরা আজ যে রাস্তায় চল্‌চি, তাতে গাছপালা নেই বল্লেই হয় ; খালি নীরস, কঠিন, ধূসর পর্ব্বতশ্রেণী অভ্রভেদী হোয়ে পথরোধ কোরে দাঁড়িয়েছে। দুই একটা জায়গায় বরফ জমাট বেঁধে রয়েছে। অন্যান্য দিন কদাচ বরফ দেখতে পাওয়া যেত, কিন্তু আজ অনেক জায়গাতেই শ্বেত বরফের স্তূপ দেখা যাচ্ছে। সেই নিষ্কলঙ্ক শুভ্র বরফস্তূপের দিকে চাইলে মনে হয়, এমন পবিত্র বুঝি জগতে আর কিছু নেই।

বেলা প্রায় ৯টার সময় আমরা যে পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম, সেটা ছেড়ে একটা পরিষ্কার জায়গায় এসে পড়লুম। এতক্ষণ দেখতে পাই নি, কারণ সম্মুখের পাহাড়ে আমাদের দৃষ্টিরোধ হোয়েছিল, কিন্তু এখানে উপস্থিত হওয়া মাত্র কি অপূর্ব্ব সুন্দর, মহান্ ও গম্ভীর দৃশ্য আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হোলো! বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখলুম, আমরা এক সুবিশাল বরফের পাহাড়ের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছি ; তার চারিটি সুদীর্ঘ শৃঙ্গ আগাগোড়া বরফে আচ্ছন্ন। তখন সূর্য্য আকাশের অনেক উচ্চে উঠেছে, তার উজ্জ্বল কিরণ এসে সেই সমুন্নত শুভ্র পর্ব্বত শৃঙ্গগুলির উপর পোড়েছে, প্রাতঃসূর্য্যকিরণ সেই তুষার-ধবল আর্দ্র পর্ব্বতশৃঙ্গে হিল্লোলিত হওয়াতে বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশে প্রতিক্ষণে কি যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হোচ্ছিল, বর্ণনা কোরে তা বুঝিয়ে দেওয়া যায় না ; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম চিত্রকরের তুলীতে সেই অপূর্ব্ব দৃশ্যের অতি সামান্য প্রতিকৃতিও অঙ্কিত হোতে পারে না। মানুষের দু'খানি হাত আশ্চর্য্য কাজ কোরতে পারে ; প্রকৃতিকে লজ্জা দেবার চেষ্টাতেই বুঝি মানুষের ক্ষুদ্র দু'খানি হাতে আগ্রার জগদ্বিখ্যাত সৌধ নির্ম্মিত হোয়ে পথিকের নয়ন মন মুগ্ধ কোরেছে। তাজমহল আমি অনেকবার দেখেছি,—সে সৌন্দর্য্য, সে ভাস্কর-নৈপুণ্য, নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মার্ব্বেল প্রস্তরের সেই বিচিত্র হর্ম্ম্য প্রকৃতির স্বহস্তের কোন রচনা অপেক্ষা হীন বোলে বোধ হয় না ; কিন্তু আজ আমার সম্মুখে সহসা

যে দৃশ্য উন্মুক্ত হোয়েছে, এ অলৌকিক! মানুষের ক্ষমতা ও ক্ষমতার গর্ব্ব এই বিরাট বিশাল নগ্ন সৌন্দর্য্যের পাদদেশে এসে স্তম্ভিত হোয়ে যায়; প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন বর্ণে স্বরঞ্জিত অভ্রভেদী শৃঙ্গের দিকে তাকালে আমাদের ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কোর্ত্তে পারি; সৃষ্টি দেখে আমরা স্রষ্টার মহান্ ভাব কতক পরিমাণে হৃদয়ে ধারণা করবার অবসর পাই।

খানিক দূর আর অন্য দৃশ্য নেই। বামে দক্ষিণে, সম্মুখে পশ্চাতে সকল দিকেই শুভ্রকায় তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতশ্রেণী। এ সকল দৃশ্য দেখবার আগে জায়গায় জায়গায় বরফের স্তূপ দেখেই মনে কি আনন্দ হোচ্ছিল, কিন্তু এখন এই বরফের রাজ্যের মধ্যে এসে পড়াতে সেই গভীর আনন্দ অব্যক্ত বিস্ময়ে পরিণত হোয়েছে! এক একবার আমার মনে হোতে লাগলো, সেই শস্যশ্যামল, সমতল, ধনধান্যপূর্ণ প্রদেশ, আর সেই চির হিমানীবেষ্টিত, বৃক্ষলতাশূন্য, নির্জ্জন উপত্যকা, এ কি একই পৃথিবীর অন্তর্গত?

প্রায় পাঁচ মাইল যাওয়ার পর আবার যেন একটু একটু লোকালয়ের আভাস পাওয়া গেল। আমরা আর একটা পর্ব্বতের উপর এসে পোড়লুম। এটায় তত বরফ দেখা গেল না, স্থানে স্থানে বরফ আছে মাত্র; এ ছাড়া এদিকে ওদিকে দু' পাঁচটা গাছপালাও দেখা গেল। এ পাহাড়টা সেই বরফের পাহাড়ের একটি ক্ষুদ্রমস্তক দরিদ্র প্রতিবাসী। আরো খানিক দূর যাওয়ার পর শুনলুম, নিকটেই একটা বাজার আছে; বাজারের নাম "পিপল কুঠী।" এই পাহাড়ের মাথায় খানিকটে জায়গা সমভূমি, সেখানেই বাজার অবস্থিত। আমরা রাস্তা ছেড়ে খানিক উপরে উঠে তবে বাজারে পৌছলুম। বাজারটা নিতান্ত মন্দ নয়; আট দশখানা দোকান আছে, খাদ্যদ্রব্যও মোটামুটি সকল রকমই পাওয়া যায়। বাজারের অবস্থিতি স্থানই কিন্তু আমার সব চেয়ে মনোহর বোধ হলো।

চারিদিক্ অত্যন্ত নীচু, কেবল মাঝখানে পাহাড়ের মাথার উপর বাজার হোতে নীচের দৃশ্য বড়ই সুন্দর। আমরা একটা দোকানে আড্ডা নিলুম, আমাদের সেই দোকান বাজারের এক প্রান্তে। দোকান হোতে নেমে দাঁড়িয়ে একবার নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলুম ; মাথা ঘুরে উঠলো !

'পিপলকুঠী'তেই সে বেলা বাস কোর্ত্তে হবে শুনে, আমাদের আত্মা-পুরুষ উড়ে গেল। পাঠকের বোধ করি স্মরণ আছে, রাস্তায় একদিন 'পিপল চটীতে' মাছির উৎপাতে বিব্রত হয়ে দুপুরের রৌদ্র মাথায় কোরেই আমাদের চটি ত্যাগ কোর্‌তে হয়। বাঙ্গালায় একটা প্রবাদ আছে "ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখ্‌লেই ভয় পায়"—আমাদেরও সেই দশা। 'পিপলকুঠি' নাম শুনেই 'পিপলচটির' কথা মনে পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই অগণ্য মক্ষিকাকুলের সাদর সম্ভাষণের সম্ভাবনায় প্রাণে দারুণ আশঙ্কা উপস্থিত হোলো। সঙ্গীর স্বামীজি অচ্যুত ভায়াকে ডেকে বোল্লেন, "অচ্যুত! দেখ কি, আজ মহাসংগ্রাম! চটিতে যদি হাজার সৈন্য থাকে, তবে কুঠীতে যে লক্ষাধিক সৈন্য থাক্‌বে, তার আর সন্দেহ নেই।" যা হোক, খানিক পরেই বুঝলুম, আমাদের ভয় অমূলক ; এখানে মাছির কোন উপদ্রব নেই, কিন্তু মাছির বদলে আমাদের আর এক উপদ্রব সহ্য কোর্‌তে হোলো। আমাদের দোকানদারের বাড়ী আর দোকান একই ঘরে। সেই ঘরের যে অংশে আমাদের থাক্‌বার জায়গা হোলো, তারই আর এক অংশে দোকানদারের পরিবারগণ বাস করে। তার পরিবারের মধ্যে তার স্ত্রী, একটি ষোল সতের বছর বয়সের ছেলে, আর তিন চারিটি ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে দেখতে পেলুম। বড় ছেলেটি দোকানের কাজে বাপের সাহায্য করে, আর ছোট ছেলেমেয়েগুলি বাপ মায়ের দোকান আর গৃহস্থালীর এলোমেলো বাড়িয়ে দেয়। আজ তাদের দোকানে এই নূতন যাত্রী কয়টি দেখে, তাদের আনন্দ দেখে কে? আমাদের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপনের জন্যে তারা বড়ই উৎসুক হোয়ে উঠলো। অচ্যুত ভায়ার

গম্ভীর মুখভঙ্গী ও বিজ্ঞের ন্যায় আকার ইঙ্গিত দেখে তার কাছে বড় ঘেঁস্‌তে সাহস করলে না; কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই স্বামীজি ও আমার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা কোরে নিলে। তিন চার বৎসরের একটি মেয়ে আমার ডাইরীখানা নিয়ে গম্ভীর মুখে তার পাতা উল্‌টে পাল্‌টে পোড়তে আরম্ভ কোল্লে; শেষে পড়া হোলে আমার পেন্সিলটি দখল কোরে ডাইরীর একখানা সাদা পৃষ্ঠায় দেব অক্ষরে নানা কথা লিখ্‌তে লাগলো। আমাদের মত লোকের সাধ্য কি সে সব হরফের অর্থ আবিষ্কার করি। আজ কতদিন চোলে গিয়েছে, সেই বালিকার কথা ভুলে গিয়েছিলুম; বালিকাটিও এতদিন না জানি কত বড় হোয়ে উঠেছে; হয়তো সে তার সেই শৈশব-চাপল্য এতদিনে ভুলে গিয়েছে; কিন্তু আজ এই বাঙ্গালা দেশের এক প্রান্তে এক ক্ষুদ্রগৃহে বোসে যখন ডাইরী খুলে এই সব লিখ্‌ছি, তখন তাহার এক পৃষ্ঠে বালিকাহস্তের হিজিবিজি দেখে, সেই সুদূর পর্ব্বতশিখরে দোকানীর সেই ছোট মেয়েটীর কথা মনে হোলো। পেন্সিলের দাগ, আমার মনের মধ্যে তার সেই সুন্দর মুখখানি, দুটি মোটা মোটা চোখ ও কোঁকড়া কোঁকড়া বিশৃঙ্খল চুলের রাশের কথা জাগিয়ে দিলে। আমার প্রবাসের অন্যান্য স্মরণ চিহ্নগুলির মধ্যে সাদা কাগজে বালিকা হস্তে পেন্সিলের দাগ একট; কিন্তু এর মধুরত্ব আর কেউ বুঝতে পারবে না, শুধু আমার স্মৃতিতেই এর ক্ষুদ্র ইতিহাস সন্নিবদ্ধ। পেন্সিলের দাগগুলি ক্রমেই মুছে যাচ্ছে, আমিও হয় ত এক দিন সেই ছোট মেয়েটির কথা ভুলে যাব।

মেয়েটি যখন আমার ডাইরীতে এই রকম পাণ্ডিত্য প্রকাশ কোচ্ছিল, সে সময় তার একটি বড় ভাই, বয়স প্রায় ছয় বৎসর হবে, আমার পর্ব্বত ভ্রমণের সুদীর্ঘ যষ্টিখানা Evolution theoryর জোরে অশ্বরূপে পরিণত করে তাতেই সোয়ার হয়ে চাবুক লাগাচ্ছিল। এই রকমে আমাদের ক্ষুদ্র সঙ্গীগুলির সঙ্গে যে কত অনর্থক বাক্যব্যয় কোর্‌তে হোয়েছিল, তার সংখ্যা নেই। তাদের যে সমস্ত প্রশ্ন, তার সদুত্তর দেওয়া আমাদের কাজ নয়;

কিন্তু যা হয় একটা উত্তর পেয়েও তাদের সন্তোষের লাঘব হয় নি ; তবে একটি ছেলের একটি প্রশ্ন, আমার বহুকাল মনে থাক্‌বে ; তার বয়স বছর আষ্টেক, সে আমাদের তীর্থ ভ্রমণ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌তে কোর্‌তে অবশেষে বোল্লে "বাপ্‌জী নে বোলা কি স্বামী লোগোঁ কি সাথ্‌ নারায়ণজী বাতচিজ কর্‌তা হ্যায়, তুম্‌হারা সাথ্‌ নারায়ণজীকো কেয়া বাৎ হুয়া ?"—প্রশ্ন শুনে আমার চক্ষু স্থির। ভেবে চিন্তে বল্লুম "হামরা সাথ্‌ আবিতক্‌ নারায়ণজী কি মুলাকাত নেহি হুয়া," আমার কথা শুনে বালক কিছু বিরক্ত হোয়ে বোল্লে, "আরে তব্‌ কাহে ঘড় ছোড়্‌কে সাধু হুয়া ?" কথাটা বালকের বটে ; কিন্তু তার মধ্যে কি গভীর ভাবই লুকান ছিল ! ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, কিন্তু ধার্ম্মিক সাধু অনেক। আমি ধার্ম্মিকও নই সাধুও নই, কেবল সাধুর দলে পড়ে এই সব নিগ্রহ ভোগ করছি ; আগে জ্ঞান ছিল, কেবল অসাধুর সঙ্গে বেড়ালেই কৈফিয়তের তলে পড়্‌তে হয়, এখন দেখ্‌ছি সাধুর সহচর হলেও সকল সময় কৈফিয়ৎ এড়ান যায় না।

আজ বৈকালে আর বের হবার ইচ্ছা ছিল না। একে ত বেলা বেশী নেই, তার পর এমন কন্‌কনে শীত, বেলা থাক্‌তে কম্বলের ভিতর হতে হাত পা বের করা শক্ত। আমরা রওনা হোতে একটু ইতস্ত করাতে সকলেই বোল্লেন, এখন থেকে এই বরফ ভেঙ্গে চলা সহজ নয়, আমাদের গতিশক্তি ক্রমে কোমে আস্‌চে, আবার এ সময় যদি আমরা দু'বেলার বদলে একবেলা চলতে আরম্ভ করি, তা হোলে বদরিকাশ্রমে পৌছুতে আমাদের আরো বিলম্ব হোয়ে যাবে। সুতরাং আমরা চল্‌তে আরম্ভ কোল্লুম ; দু'মাইল দূরে 'গড়ুই গঙ্গা' চটী পর্য্যন্ত আস্‌তে আস্‌তেই সন্ধ্যা হোয়ে গেল, কাজেই সেখানে রাত্রি বাস্‌ কোর্ত্তে হোলো।

২৬ মে, মঙ্গলবার, খুব সকালে চল্‌তে আরম্ভ কোল্লুম। আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে তিনটী প্রাণী চোল্‌চি। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবল রৌদ্রে বোধ হয় এখন আমাদের বঙ্গভূমি মরুভূমিতে পরিণত হবার উপক্রম হোয়েছে ;

বাঙ্গালা ও উত্তর পশ্চিমের সর্ব্বত্র লোকজন গলদ্‌ঘর্ম্ম হোয়ে শুধু "জল জল" বোলে চীৎকার কোচ্ছে; আর আমরা বরফ স্তূপের ভিতর দিয়ে চল্‌চি, যেন চিরহিমানীমণ্ডিত মেরুপ্রদেশ! মেরু-প্রবাসী, কঠিনব্রত, পৃথিবীর গুপ্ত সত্যানুসন্ধিৎসু সন্ন্যাসিবর্গের কথা মনে জেগে উঠ্‌লো; কি তাঁদের যত্ন উৎসাহ ও একাগ্রতা! এর চেয়েও প্রচণ্ড শীতে ও বহুদূরবর্ত্তী, অজ্ঞাত বিপদসঙ্কুল প্রদেশে মৃত্যুভয় তুচ্ছ জ্ঞান কোরে তাঁরা দিনের পর দিন কি অসাধারণ পরিশ্রমই না করেন। আর আমরা কি করি? হৃদয়ে অনেক খানি অবিনয় ও মাথায় অহঙ্কারের দুর্ব্বহ বোঝা নিয়ে প্রকাণ্ড সাধু সেজে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াই। হৃদয়ে ভগবানের প্রতি ভক্তি ও নির্ভর নেই, মানুষের প্রতিও স্বতঃ উৎসারিত প্রেম প্রবাহের একান্ত অভাব; কিন্তু তবুও আমরা ইহকালে মানুষের ভক্তি ও পরকালে অনন্ত স্বর্গের দাওয়া করি; কারণ আমরা সাধু, এবং আমরা তীর্থ পর্য্যটন কোরে থাকি! এই সমস্ত কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে "গড়ুই গঙ্গা" হোতে ছমাইল দূরে 'কুমার চটীতে' উপস্থিত হলুম, তখন বেলা প্রায় বারটা। এখানে নাম মাত্র খাওয়া দাওয়া কোরে অল্প বিশ্রামের পর আবার রওনা হওয়া গেল। তিন মাইল চোলে সন্ধ্যা বেলা একটা পাহাড়ের গায়ে ডাকহরকরাদের আড্ডার মত নির্জ্জন কুটীর দেখ্‌তে পেলুম; সেই পত্রকুটীরে রাত্রিবাস স্থির করা গেল। অন্ধকার রাত্রি, কোন দিকে জনমানবের সাড়া শব্দ নেই, নিকটে কোন লোকালয় আছে বোলেও বোধ হোলো না। এই বহুদূর বিস্তৃত, গগনস্পর্শী পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আমরা তিনটী পথশ্রান্ত, শীতক্লিষ্ট পথিক কোন রকমে রাত্রি কাটিয়ে দিলুম।

২৭ মে, বুধবার,—আমরা যোশীমঠের খুব নিকটে এসে পোড়েছি। সকালে উঠে খুব উৎসাহের সঙ্গে হাঁট্‌তে লাগলুম। রাস্তায় এখনো অনেক যায়গা বরফে ঢাকা। দিনকতক আগে পথ যে প্রায় বরফাবৃত ছিল, তা বেশ বুঝতে পারা গেল। এখন খুব বরফ গোল্‌ছে। এ পথে "চড়াই

উৎরাই” তত বেশী না থাকলেও এই বরফের উৎপাতে আমাদের চোলতে বড় অসুবিধা হোচ্ছে। আমাদের পাঁচমাইল পথ আস্‌তে বেলা দুপুর হোয়ে গেল ; পাঁচ মাইল এসে যোশীমঠে (জ্যোতির্ম্মঠে) উপস্থিত হোলুম।

যোশীমঠ

(জ্যোতির্ম্মঠ)

২৭মে, বুধবার,—আগের দিন রাত্রে আমরা যে চটীতে ছিলুম সেখান হোতে যোশীমঠ মোটে পাঁচমাইল মাত্র কিন্তু এই পাঁচমাইল আসতেই আমাদের কত সময় লেগেছিল, তা পূর্ব্বে বোলেছি যোশীমঠ যখন আর প্রায় একমাইল দূরে আছে, সেই স্থানে এসে দেখলুম, পাহাড়ের গা বেয়ে একটা রাস্তা নীচে দিকে চোলে গিয়েছে ; আরো দেখলুম যে বেশীর ভাগ যাত্রী আস্‌ছিল দুই একজন বাদে সকলই সেই পথে নেমে গেল। তা .. কোথায় যায় জান্‌বার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হওয়ায় একজন সহযাত্রীকে সে কথা জিজ্ঞাসা কোল্লুম। তিনি উত্তর দিলেন, আমরা যে পথে যাচ্ছি, এইটি যোশীমঠের পথ ; যাত্রীরা সাধারণতঃ এ পথ দিয়ে নারায়ণদর্শন কোত্তে যায় না, তারা ঐ নীচের পথ দিয়ে বরাবর বিষ্ণুপ্রয়াগে চোলে যায় ; তারপর নারায়ণ দেখে ফিরবার সময় যোশীমঠ দিয়ে আসে। সেও যে সকলে আসে তা নয়। আমাদের এই রাস্তা থেকে একটা প্রকাণ্ড “উৎরাই” (দেড়মাইলের বেশী) নামলেই বিষ্ণুপ্রয়াগ।

নারায়ণ দর্শনে অনেক যাত্রীই যায়; কিন্তু তারা যোশীমঠে না গিয়ে যে আশ পাশ দিয়ে যাওয়া আসা করে, তা আমি বুঝতে পারি নে। হিন্দুর

কাছে ত যোশীমঠ অত্যন্ত আদরের সামগ্রী ; তবু এখানে লোকের গতি-বিধির অভাবের কারণ এই বোলে মনে হয় যে, এ পথে যারা আসে সত্যের প্রতি তাদের ততটা আদর নেই এবং প্রকৃত জ্ঞানলাভের চেষ্টা অপেক্ষা তীর্থদর্শনের দ্বারা পাপক্ষয় ও পুণ্যার্জ্জনকেই তারা তীর্থভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য বোলে মনে করে ; সুতরাং সাধু সন্ন্যাসীর কাছে যোশীমঠের তেমন সম্মান দেখা যায় না। আমি এখন পর্য্যন্ত বদরিকাশ্রম দেখি নি, কিন্তু এখানে এসে আমার মনে হোলে যত কষ্ট কোরেই বদরিকাশ্রমে যাওয়া যাক্, যোশীমঠে আস্‌বার জন্যে তার চেয়ে শতগুণে বেশী কষ্ট স্বীকার করাও সার্থক। যদি ইয়ুরোপ, কি আমেরিকায় যোশীমঠের মত স্থান থাক্‌তো, তা হোলে কত পণ্ডিত, ধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠাবান্ কত শিক্ষিত যুবক, প্রতি বৎসর সেখানে সমবেত হোয়ে কত গুপ্ত সত্য আবিষ্কার কোরে ফেল্‌তেন ; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এ দেশে সে সম্ভাবনা কোথায় ?

উপরেই বলেছি, যোশীমঠ হিন্দুর কাছে একটি মহাতীর্থ ; কিন্তু এটি যে শুধু হিন্দুরই তীর্থস্থান, তা নয়। যেখানে নারায়ণের বা মহা-দেবের কিম্বা অন্য কোন দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই স্থানই হিন্দুর পবিত্রতীর্থ কিন্তু যেখানে দেবোপম মানব আপনার শান্ত পবিত্র চরিত্রে চারিদিক্ মধুর স্নিগ্ধ কোরে রাখেন, এবং মানবের ক্ষুদ্রতা ও অপূর্ণতার অনেক উর্দ্ধে দেবমহিমায় বিরাজ করেন, সেস্থান শুধু হিন্দুর তীর্থ নয়, সে স্থান বিশাল মানবজাতির সাধারণ তীর্থক্ষেত্র। দেবতার উদ্দেশ্যে উপহার প্রদানের জন্য সেখানে কেহ ফল পুষ্পাদি নিয়ে যায় না বটে, কিন্তু নিখিল মানবহৃদয়নিঃসৃত ভক্তি ও প্রীতির পুণ্যসৌরভে সেই দেবমানবের অমর কীর্ত্তি-মন্দির পরিব্যাপ্ত হোয়ে থাকে।

এই যোশীমঠ একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার কীর্ত্তিমন্দির। শঙ্করা-চার্য্য ইহার প্রতিষ্ঠাতা, এবং এইখানেই তাঁর জীবনের অনেকদিন অতি-

বাহিত হোয়েছিল। অতএব বলা বাহুল্য যে যোশীমঠ শুধু ভক্ত হিন্দুর কাছে নয়, ঐতিহাসিকের কাছেও বিশেষ আদরের সামগ্রী। শঙ্করাচার্য্য কোন্ সময় জন্মগ্রহণ কোরেছিলেন, সে তত্ত্ব নিরূপণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; সে জন্য কোনরকম চেষ্টাও করিনি; চেষ্টা কোল্লে হয় ত একটু ফল লাভ হোতো, কিন্তু বাঙ্গালীজন্ম গ্রহণ কোরে, সেরূপ করা যে এক মহা দোষের কথা! আমরা প্রত্নতত্ত্ব লিখি, কিন্তু তাতে কতটুকু নিজস্ব থাকে? কেবল তর্জ্জমা করি এবং একজন বৈদেশিক কঠোর পরিশ্রম ও আজীবন সাধনদ্বারা যে সত্যটুকু আবিষ্কার কোরে গেছেন, তারই উপর টিকা টিপ্পনী, ভাষ্য কোরে দোষগুণের অতি সূক্ষ্ম আলোচনাদ্বারা আপনাদের পাণ্ডিত্য স্তূপাকারে ফাঁপিয়ে তুলি; এই ত আমাদের ক্ষমতা! আজকাল শঙ্করাচার্য্যের জন্মকাল নিয়ে বঙ্গ-সাহিত্যে বেশ একটু আলোচনা চোল্‌চে; আমাদের মনে হয় সে আলোচনা আন্তরিক নয় এবং তা ইতিহাসের জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিতদের সময় ক্ষেপণের উদ্দেশ্য-হীন উপায় মাত্র, কিন্তু বাস্তবিকই যদি এ সম্বন্ধে একটা সত্য আবিষ্কারের জন্য প্রাণে গভীর আগ্রহ জেগে উঠ্‌তো, তা হোলে কি আমরা স্থির থাক্‌তে পাত্তুম? কখন না। শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধীয় যে সকল রচনা, প্রাচীন গ্রন্থ, অনুশাসন ও নিদর্শনাদি যোশীমঠে আছে শুনা গেল, তাতে বুঝ্‌লুম একটু বেশী চেষ্টা কোল্লেই তাঁর সম্বন্ধে সমস্ত কথা সহজে জান্‌তে পারা যায়। কিন্তু আমি মূর্খ, জ্ঞানলালসা-বিরহিত দ্বিপদ মাত্র, কাজেই সেদিকে আমার মন যায় নি। কিন্তু বাস্তবিক যাঁরা ভারতের লুপ্তপ্রায় ইতিহাসের পঙ্কোদ্ধারে বদ্ধপরিকর, তাঁদের এই সমস্ত দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে এসে সত্যের সন্ধানে লিপ্ত হওয়াই উচিত। যাহোক অন্যান্য দেশ হোলে এরকম আশা করা অন্যায় হোত না, কারণ সে সকল দেশের লোক জীবনটা অসার মায়াময় বোলে কোন রকমে কাটিয়ে দিতে রাজী নয়; যার উপর সমাজের ও দেশের মঙ্গল, পরিশেষে সমগ্র মানবজাতির মঙ্গল

নির্ভর করে, এমন কাজে তারা প্রাণপণে নিযুক্ত থাকে এবং মৃত্যুর উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে যখন একদলকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তখন আর একদল অকম্পিতহৃদয়ে সেই উদ্দাম স্রোতের দিকে অগ্রসর হয়; কিন্তু আমাদের কাছে জীবন স্বপ্ন, জগৎ মায়াময়, সংসার মরুভূমি তুল্য। কোন রকমে চোক মুখ বুজে যদি চল্লিশটা বছর পার হোতে পারি, তা হোলে আমাদের আর পায় কে? ইহজীবনের কাজে ইস্তফা দিয়ে শৈশবের সুখস্মৃতির রোমন্থনে মগ্ন হই, না হয় পৌত্রাদি পরিবেষ্টিত হোয়ে তাদের সঙ্গে নানারকম প্রীতিকর সম্বন্ধ পাতিয়ে পুরাণো মর্‌চেপড়া রসিকতার প্রবৃত্তিকে কিছু উজ্জ্বল কোরে তুলি। আমাদের দিয়ে দেশের আবার উপকার হবে! যোশীমঠে উপস্থিত হোয়ে শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে নানা রকম কথা শুন্‌তে শুন্‌তে নিজের সম্বন্ধে আমার মনে এই প্রকার ভাবেরই উদয় হোচ্ছিল। দুঃখ বেশী হোলে মনের মধ্যে নিজের দুর্ব্বলতার কথাই বেশী বাজে; এ কথার উপর কোনও যুক্তি তর্ক নেই এবং কোনও দার্শনিক যদি এই মত খণ্ডন করবার জন্য প্রস্তুত হন, তা হোলে আমি সে ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক মনে করি না।

যা হোক যোশীমঠে এসে শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে যে সকল কথা জান্‌তে পেরেছিলুম, তারই এখানে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করি। এ সমস্ত কথার সঙ্গে ইতিহাসের কতটা মিল আছে, তা আমি বল্‌তে পারিনে; ঐতিহাসিকেরা তা বুঝতে পারবেন, তবে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, পথে ঘাটে সাধু সন্ন্যাসী দ্বারা যে সমস্ত তত্ত্ব সংগৃহীত হয়, তার মধ্যে অনেক গলদ থাকাই সম্ভব।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য হিন্দুর চারিটী মহাতীর্থে চারিটি মঠ স্থাপন করেন। তাঁর আবির্ভাবকালে ভারতে হিন্দুধর্ম্ম নিতান্ত নিষ্প্রভ ও জড়তা সম্পন্ন হোয়ে পড়ে, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে প্রাচীন ধর্ম্ম ও ক্রিয়াকর্ম্ম সমস্ত প্লাবিত হোয়ে যায়। হিন্দু ধর্ম্মের এই অধোগতির পর বৌদ্ধধর্ম্মের

প্লাবন ভেদ কোরে তার যে পুনরুত্থান হয়, তা মহাভারতীয় যুগের সেই তেজোময় মহাপ্রতাপ সম্পন্ন কর্ম্মশীল জীবনের একটা বিরাট কম্পনে হিন্দু সমাজের সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ করতে পারে নি সত্য, কিন্তু তা যে হিন্দুসমাজে এক নব প্রাণের সঞ্চার কোরেছিল, তার আর সন্দেহ নাই; শঙ্করাচার্য্যই এই নব প্রাণের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার স্থাপিত এই মঠ চতুষ্টয়ই তাঁহার প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র। দ্বারকায় তিনি যে মঠ স্থাপন করেন, সেই মঠের নাম "শারদা মঠ"; সেতুবন্ধ রামেশ্বরে স্থাপিত মঠের নাম "সিঙ্গিরী মঠ", পুরুষোত্তমে "গোবর্দ্ধন মঠ", এবং হিমাচলের এই দুর্গম প্রান্তে "যোশীমঠ" যুগাতীত কাল হোতে বিস্তীর্ণ ভারতে তাঁর অমরকীর্ত্তি ঘোষণা কচ্চে! স্থানমাহাত্ম্যের অনুসরণ কোল্লে এই মঠ বদরিকাশ্রমেই প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উচিত ছিল, কিন্তু বদরিকাশ্রম বৎসরের মধ্যে আট মাস বরফে ঢাকা থাকে সুতরাং সেখানে বাস করা অসম্ভব বুঝে সে স্থানের পরিবর্ত্তে এখানেই মঠ স্থাপিত হোয়েছে। এই মঠ অতি পুরাণো বলেই মনে হয়।

বর্ত্তমান সময়ে পণ্ডিতেরা শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কালের যে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ কোরেছেন, তাতে কারো মতে তিনি ষষ্ঠশতাব্দীর শেষভাগে এবং কারও কারও মতে আরও দুইশ বৎসর পরে অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ কোরেছিলেন। বদরিকাশ্রমে যাওয়ার পর যোশীমঠের মঠাধ্যক্ষের সঙ্গে আমার সেখানে দেখা হোয়েছিল, কথাপ্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য্যের কথা উঠলে তিনি বোল্লেন, স্বামীজী (শঙ্করাচার্য্য) অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগেই প্রাদুর্ভূত হন! তিনি আরো বল্লেন যে, তাঁর সঙ্গে আমাদের যোশীমঠে দেখা হোলে এ সম্বন্ধে অল্প বিস্তর প্রমাণও দেখাতে পারতেন। যোশীমঠে অনেক পুরাণো পুঁথি ছিল, তার কতক কতক নানা রকম বিপ্লবে নষ্ট হোয়ে গিয়েছে; কিন্তু সেই হস্তলিখিত কীটদষ্ট জীর্ণ প্রাচীন গ্রন্থের কতকগুলি এই মঠে বর্ত্তমান আছে এবং আমরা যদি পুনর্ব্বার যোশীমঠে যাই, তা হোলে মঠাধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের আহ্লাদের

সঙ্গে তা দেখাবেন। সেই সমস্ত জীর্ণ গ্রন্থে শুধু যে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কালেরই নিরূপণ হবে তা নয়, তাতে সে সময়ের সামাজিক অবস্থা তৎকালিক রাজনীতি, হিন্দুধর্ম্ম ও ধর্ম্মাদির উন্নতি বিস্তৃতি ও অবনতি, সাধারণ লোকের ধর্ম্মে আস্থা এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত আছে। এসকল পুঁথির সাহায্যে প্রাচীন গুপ্ত সত্য আবিষ্কার দ্বারা দেশের যে অনেক উপকার সাধন করা যেতে পারে, তার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু কে এতখানি কষ্ট স্বীকার কোরে এই দুর্গম দুরারোহ পর্ব্বতে এসে এই কঠিন কাজে হস্তক্ষেপ কোরবে? আমাদের দেশে এখনো সে সময় আসে নি এবং আমরা এখনো এরূপ কঠিন ব্রত গ্রহণ করবার উপযুক্ত হই নি। সত্যের জন্যে প্রাণ দেবার কথা বহু পূর্ব্বে শুনা যেত বটে, কিন্তু এখন নকল নবিশেরই প্রাধান্য।

মনে কোরেছিলুম, বদরিকাশ্রম হোতে ফিরবার সময় যোশীমঠ সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্ব সংগ্রহ কোরে নিয়ে যাব, কিন্তু নানা রকম বাধা বিঘ্ন ঘটায় আর সে বিষয়ে হাত দিতে পারি নি। কখনো যে সে আশা পূর্ণ হবে, তারও কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না। যদি আমাদের উৎসাহশীল ইতিহাসপ্রিয় কোন পাঠক এই দেশহিতকর কাজে হস্তক্ষেপ কোর্‌তে চান, যদি লুপ্তপ্রায় গুপ্ত সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া উপযুক্ত মনে করেন, তা হোলে যোশীমঠ ছাড়া এমন আরো দুচারিটী স্থানের নাম কোর্‌তে পারি, যেখানে সন্ধান কোরলে অনেক প্রাচীন তত্ত্ব আবিষ্কার হোতে পারে।

আমরা যে পথে যোশীমঠে গেলুম, সে পথটী পাহাড়ের গায়ে, আঁকা বাঁকা পথের দুধারে শ্রেণীবদ্ধ দোকান। দোকানগুলি নিতান্ত সামান্য, তার প্রায় অধিকাংশই দোতলা; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষগুলি যেন পর্ব্বতের গায়ে মিশে রোয়েছে। কলিকাতার বড় বড় অট্টালিকাগুলিতে যাঁরা চিরদিন বাস কোরে আস্‌ছেন, তাঁরা এই ছোট ছোট ঘরগুলি দেখ্‌লে কিছুতেই

বিশ্বাস কোরতে পারবেন না যে, এইটুকু ঘরে সাড়ে তিন হাত দীর্ঘ মানুষ কিরূপে বসবাস করে! এই কথা বৈদান্তিক ভায়াকে বলাতে তিনি একটা পৌরাণিক গল্পের অবতারণা কোল্লেন। কিঞ্চিৎ বিস্তৃতি হোলেও তার একটা সংক্ষিপ্তসার পাঠক মহাশয়কে উপহার দেওয়া যেতে পারে। বৈদান্তিকের মুখে শুনলুম, পূর্ব্বকালে এক ঋষি ছিলেন, (নামটা বেশ জাঁকাল রকম, কিন্তু স্মরণ হচ্ছে না) সেই ঋষি অনেক বৎসর যাবৎ তপস্যা করার পর তাঁর কেমন সখ হোলো যে, একটুখানি ঘর তৈয়েরি কোরে তার নীচে মাথা রেখে দিনকতক আরামে থাকবেন। কিন্তু মানুষের পরমায়ুর কথা ত আর বলা যায় না, যদি শীঘ্রই পরমায়ু শেষ হয়, তবে অকারণ একখানা ঘর তোলা কেন? তাই একবার ধ্যান কোরে পরমায়ুর শেষ মুড়োর অনুসন্ধান করা হোলো, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দেখলেন তাঁর পরমায়ুর আর মোট পাঁচ হাজার বছর বাকি। অতএব এই সামান্য দিনের জন্যে ঘর তুলে খামকা ঝঞ্ঝাটের আবশ্যক কি? এই সিদ্ধান্ত কোরে তিনি এক গাছতলায় বসেই সেই সামান্য কয়েকটা বছর কাটিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে একদিন একটি বড় গোছের দেবতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, অন্যান্য কথা [illegible]র পর দেবতাটী বোল্লেন, "আপনার একখানি কুটীর হোলে ভাল হয়, গাছতলাটা বাসের পক্ষে খুব নিরাপদ স্থান নয়।"—আমাদের অল্পায়ু ঋষি ঠাকুরটী উত্তর দিলেন যে, "মোটে পাঁচ হাজার বছর বাঁচব, তার জন্যে আবার ঘর!"—অর্থাৎ দু'পাঁচ লাখ বৎসর বাঁচবার সম্ভাবনা থাকতো তা হোলে একদিন একটা কুঁড়ে টুড়ে তয়েরী কোল্লেও করা যেত। বৈদান্তিক এই দৃষ্টান্তের সঙ্গে উপদেশ জুড়তেও ছাড়লেন না; তিনি বোল্লেন, এই ঘটনা হোতে বুঝা যাচ্চে, ইহলোককে আমরা কত তুচ্ছ জ্ঞান করি, পরলোকেই আমাদের স্থায়ী বাসস্থান; দিন কতকের জন্যে এই ইহলোকের প্রবাসে এসে তিন চার তালা বাড়ী তুলে স্থায়ী রকমে

বাসের বন্দোবস্ত, সে কেবল ইউরোপীয়গণের বিলাসরসসিক্ত দুর্ব্বল অন্তঃকরণের পক্ষেই শোভা পায় এবং তাঁদের অনুকরণ-প্রিয় দেশীয়গণ সম্বন্ধেও একথা খাটতে পারে। এই কথায় বৈদান্তিকের সঙ্গে দারুণ তর্ক বেধে গেল। আমি বল্লুম, 'হাঁ ইউরোপীয়গণের এ একটি ভয়ানক ত্রুটী বলে অবশ্য স্বীকার কোর্ত্তে হবে, কারণ তাঁরা যে কয়টা বছর বাঁচেন, তাতে তাঁদের মহাপ্রাণী একটু সুখস্বচ্ছন্দতা, একটু আরাম ও তৃপ্তি অনুভব কর্‌বার অবসর পায়; আর তাঁরা যে কিছু কাজ করেন, তাতেও তাঁদের নামগুলিকে কিছু দীর্ঘকাল ইহলোকে স্থায়ী কর্‌বার কিঞ্চিৎ বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু আমাদের ঠিক উল্‌টো ব্যবস্থা; জীবনটী পরিপূর্ণমাত্রায় অপব্যয় করাই আমাদের বৈরাগ্যের প্রধান লক্ষণ।" যা হোক্‌ সুখের বিষয় স্বামীজির বিশেষ যত্নে আমাদের এই আন্দোলন অতঃপর নিবৃত্তি হোয়ে গেল। আমরা চল্‌তে চল্‌তে বাজার দেখ্‌তে লাগলুম; দেখ্‌লুম বাজারে সকল রকম জিনিসই পাওয়া যায়, এমন কি সোনা-রূপার কারিকর এবং টাকাকড়ি লেনদেনের মহাজন পর্য্যন্ত এখানে আছে। এ সকল এখানে থাকবার কারণ যোশীমঠ বদরি-নারায়ণের মোহান্তের "হেড্‌ কোয়াটার", তিনি এখানে সশিষ্যে বাস করেন। এতদ্ভিন্ন যে সমস্ত পাহাড়ী ভুটিয়া ও নেপালীগণ বদরিকাশ্রমে বাস করে, তারা শীতকালে সেখানে থাকৃতে না পেরে এখানে এসে কয়েকমাস কাটিয়ে গ্রীষ্মকালে আবার দেশে ফিরে যায়।

যোশীমঠের দু'মাইল নীচে পাহাড়ের পাদদেশে বিষ্ণু প্রয়াগ। বিষ্ণু-প্রয়াগেও অনেক লোক বাস করে, কিন্তু তাছেড়ে আর খানিক আগে গেলে আর লোকালয় দেখা যায় না। বল্‌তে গেলে বদরিকাশ্রমের রাস্তায় বার মাসের লোকালয়ের এখানেই শেষ; তবে এর পরেও দু' একটী জায়গা আছে সেখানে কোন কোন বছর শীতের প্রাবল্য কিছু

কম হোলে, দুই একঘর লোক বাস কোরে থাকে। কিন্তু যোশীমঠের মতন এমন আড্ডা আর নেই।

এই সকল কারণেই যোশীমঠ সহরের মত। কিন্তু যে সকল প্রাচীন গৌরবের চিহ্ন আজও যোশীমঠে বর্ত্তমান আছে, তা দেখবার কি বুঝবার লোক বড় একটা দেখা যায় না! আমরা বাজারের মধ্যে দিয়ে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে দাতব্য চিকিৎসালয়ের পাশে একটা দোকানে আশ্রয় নিলুম।

পূর্ব্বেই বোলেছি, যোশীমঠের রাস্তা পাহাড়ের গায়ে। যোশীমঠের পাহাড়টা একটু বাঁকা, এই বাঁকের অল্প নীচেই খানিক সমতল স্থান। এইস্থান টুকু এক বিঘার কিছু বেশী হবে; তারই উপর পর্ব্বতের কোলের মধ্যে হিন্দুর গৌরব-স্তম্ভ শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত যোশীমঠ বিরাজিত। মন্দিরটী বেশী বড় নয়। আমরা যে দোকানে বাসা নিয়েছিলুম, মন্দিরের চূড়া ততদূর পর্য্যন্তও উঁচু নয়।

আমরা দোকানে আর বিশ্রাম কল্লুম না! লাঠি আর কম্বল দোকান ঘরে ফেলে তখনই মঠ দর্শনে বের হওয়া গেল। যোশীমঠের রাস্তা দিয়ে নীচে নাম্‌তে নাম্‌তে রাস্তার পাশে আর একটা মন্দির দেখ্‌তে পেলুম। এই মন্দিরে প্রবেশ করি কি না ভাবচি, এমন সময় একজন পথপ্রদর্শক জুটে গেল; তার সঙ্গেই আমরা মন্দিরে প্রবেশ কল্লুম। দেখলুম, মন্দিরটা বহু কালের পুরাতন। কত শতাব্দীর বিপ্লব পরিবর্ত্তনের নীরব ইতিহাস যে এই প্রাচীন মন্দিরের পাষাণপ্রাচীরে বন্দী আছে, তা নির্দ্ধারণ করা যায় না! কিন্তু এ মন্দির এতই দৃঢ় যে, একটা জমাট পাহাড়ের স্তূপ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না, এবং মনে হোলো সৃষ্টির শেষ দিনেও তা থেকে একখণ্ড পাথর বিচ্যুত হোয়ে পড়বে না। আমাদের পথ-প্রদর্শক বোল্লে, এ মন্দিরটি শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বে নির্ম্মিত!

আমরা যখন মন্দিরে প্রবেশ করি নি, তখন মনে হোয়েছিল, অন্যান্য

মন্দিরে যা দেখি এখানেও হয় ত তাই দেখ্‌বো ; সেই অনাদি শিবলিঙ্গ, না হয় অনন্ত শালগ্রামশিলা ; খুব বেশী হয় ত সুন্দর সুবেশ এক নারায়ণ মূর্ত্তি ! কিন্তু সে সব কিছুই আমার দৃষ্টি গোচর হোল না, শুধু মন্দিরের মাঝখানে তিন হাত কি সাড়ে তিনহাত লম্বা ও এক হাত চওড়া একখান সিঁদূর মাথান জিনিস ; তা কাঠও হতে পারে, পাথরও হতে পারে, আবার লোহা কি ইস্পাত হওয়াও আশ্চর্য্য নয়, কারণ তেল সিঁদূর ছাড়া তার কোন স্বরূপ অবধারণ কোর্ত্তে পাল্লুম না। প্রথমে মনে কল্লুম, হয় ত বা লোকে এই আসন খানাই পূজা করে। কিন্তু আমাদের পথ প্রদর্শক যে এক রোমহর্ষণ কাহিনী বোল্লে তা শুনে আতঙ্কে আমার সর্ব্ব শরীর শিউরে উঠ্‌লো। তার মুখে শুন্‌লুম যে, এইখানে এক দেবী-মূর্ত্তি বহুকাল হোতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। নররক্ত ভিন্ন অন্য প্রাণীর রক্তে তাঁর পিপাসা দূর হোতো না বোলে তাঁর সম্মুখে প্রতিদিন নিয়মমত নরবলি দেওয়া হোতো। এতদ্ভিন্ন উৎসব উপলক্ষে কোন কোন দিন এত মনুষ্যমুণ্ড দেহচ্যুত হোতো যে, তাদের উচ্ছ্বসিত শোণিতপ্লাবনে মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হোয়ে যেতো। সে বোল্লে যে, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি ঠিক এই জায়গায় আমার পায়ের নীচেই শত শত নিরপরাধ ব্যক্তি এই ভয়ানক অনুষ্ঠানের অনুরোধে নিহত হোয়েছে। বোধ করি, তাদের অবরুদ্ধ মর্ম্মোচ্ছ্বাস ও নিরাশ ক্রন্দন পাষাণ-প্রাচীর ভেদ কর্‌বার পূর্ব্বেই তাদের জীবনের উপর চির অন্ধকারের যব-নিকা পতিত হোয়েছে। আমি সভয়ে সম্মুখে চেয়ে দেখ্‌লুম ; বোধ হোতে লাগ্‌লো, শত শত রক্তাপ্লুত, ছিন্ন-মস্তক যেন শোণিতস্রোতে তীরবেগে ভেসে আস্‌ছে, আর ঘাতকের পৈশাচিক নৃত্য ও অট্টহাস্যে চতুর্দ্দিক্ প্রকম্পিত হোচ্ছে। হায় দেবি, কতকাল থেকে তুমি মাতার সুপবিত্র, স্নেহ-কোমল ও নিতান্ত নির্ভরতাপূর্ণ অধিকার হরণ কোরে সন্তানের উষ্ণ রুধিরে আপনার লোল জিহ্বা তৃপ্ত কোরেছো। কিন্তু

তোমারই বা দোষ কি, তোমাদের নামে মানুষ প্রতিদিন অসঙ্কোচে কত কুকার্য্যই না করে ?

কিন্তু কতদিন দেবী স্থানচ্যুত হোয়েছেন, তা ঠিক জান্‌তে পাল্লুম না। কেহ কেহ বলেন, শঙ্করাচার্য্য যখন যোশীমঠের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময় তিনি এই ভয়ানক কাণ্ড নিবারণ করেন, সেই সময় হোতে দেবীমূর্ত্তি বিমুখ অবস্থায় মন্দির মধ্যে প্রোথিত হোয়েছেন; এখন শুধু তাঁর শূন্য আসনখানিই দেখা যায়, এবং তারই পূজা হোয়ে থাকে কিন্তু কারো মতে এই বিপ্লব শঙ্কারাচার্য্যের দ্বারা সাধিত হয় নি, এ সম্বন্ধে তাদের প্রধান যুক্তি এই যে, শঙ্করাচার্য্য হিন্দুধর্ম্মের একজন অবতার বিশেষ, এমন কি অনেকে তাঁর উপর শিবত্ব পর্য্যন্ত আরোপ কোরে থাকে; সেই শঙ্করাচার্য্য যে এমন একটা ম্লেচ্ছভাবাপন্ন কাজ কোরে ফেল্‌বেন, এ কথা তারা কিছুতেই বিশ্বাস কোর্ত্তে রাজী নয়। কিন্তু এরা বোঝে না, ধর্ম্মের সংস্কার ও বিনাশ এক কথা নয়, সুতরাং ধর্ম্মের সংস্কারের জন্য যে কাজ শঙ্করাচার্য্যের পক্ষে নিতান্ত সহজ, এরা তা ধর্ম্মবিনাশক মনে কোরে কখনই ধারণা কোরতে পারে না যে, এমন অধর্ম্ম শঙ্করাচার্য্য দ্বারা কিরূপে সাধিত হোতে পারে ? যা হো' এ সম্বন্ধে এদের মতও উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে না। কারণ এরা বলে, বৌদ্ধেরা যখন এখানে আসেন, তখনই তাঁরা এই ঘৃণিত প্রথা বন্ধ কোরে-ছিলেন। এই দুই মতের কোন্ মত সত্য, তা অনুমান করা কঠিন। এই বিষম অপ্রীতিকর জায়গায় আমি আর বেশীক্ষণ থাক্‌তে পাল্লুম না দ্রুতপদে মন্দির ত্যাগ কল্লুম, বোধ হোতে লাগ্‌লো শত শত নরকঙ্কাল আমার পাছে পাছে ছুটে আস্‌চে !

মন্দির থেকে বা'র হোয়ে একেবারে যোশীমঠে উপস্থিত হোলুম। বাহিরে একটা ঝরণা হোতে অবিরাম জল পোড়ছে; সেই ঝরণার কাছ দিয়ে একটা ছোট দ্বারপথে আমরা মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ কোল্লুম।

দেখি, একটা দোতলা চক, বাইরে টানা বারাণ্ডা, মধ্যে ছোট ছোট কুঠরী। বাহিরে অনতিদীর্ঘ একটি উঠান, তিন দিকে দোতালা কোঠা, আর এক দিকে মন্দির। অনুচ্চ মন্দির. মন্দিরের মধ্যে দিনের বেলাতেই ভয়ানক অন্ধকার। সচরাচর মন্দিরের মধ্যে যেখানে মূর্ত্তি থাকে, এই মন্দিরে সেখানে তাকিয়া বেষ্টিত স্থূল গদি দেখ্তে পেলুম; এইটী শঙ্করাচার্য্যের গদি। এই গদি বাঁ পাশে রেখে অগ্রসর হোতেই দেখি এক চতুর্ভুজ মুর্ত্তি; তেমন জাঁকাল নয়, বিশেষতঃ একটা অন্ধকারময় কুঠুরীতে পোড়ে তাঁর মাহাত্ম্যও খুব খাট হোয়ে গিয়েছে বোলে বোধ হলো।

মন্দির থেকে বেরিয়ে উঠানের এক পাশে বোস্‌লুম। উঠানটি পাথর দিয়ে বাঁধানো, দেখ্‌লুম সেখানে অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষ কোলাহল কোচ্ছে। একজন পাণ্ডা একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে এমন কুৎসিত ভাষায় ঝগড়া কোরছে যে সেখানে দুদণ্ড অপেক্ষা করা অসম্ভব হোয়ে উঠ্‌লো। কোথায় মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের প্রধান মঠে উপস্থিত হোয়ে আমরা শান্তি আনন্দ উপভোগ কর্‌বো, না পাণ্ডাঠাকুরদের বৈষয়িক গণ্ডগোলের জন্যে হিমালয়ের শৈত্য ও শান্তিময় ক্রোড়স্থিত এই পরম পবিত্র তীর্থস্থান এক বিড়ম্বনার কারণ হোয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মঠ নিয়ে যে সমস্ত পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় হোয়ে গিয়েছে, তা শুন্‌লে মনে বড়ই কষ্ট উপস্থিত হয়। পাঠক মহাশয়ের অবগতির জন্য মঠের সেই শোচনীয় ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে বিবৃত কোরচি।

শঙ্করাচার্য্য এই মঠের ভার ত্রোটকাচার্য্য গিরির হাতে সমর্পণ কোরে যান। এই মঠ তিন শ্রেণীর সন্ন্যাসীর অধিকারে থাকে; গিরি, পুরী ও সাগর। সন্ন্যাসী মহাশয়েরা সহসা এই অতুল সম্পত্তির অধিকারী হোয়ে সন্ন্যাস ধর্ম্ম আর ঠিক রাখ্‌তে পার্‌লেন না। দীর্ঘকালের কঠোর সংযম ও বৈরাগ্যকে বিলাস সাগরে ভাসিয়ে শুষ্ক প্রাণে প্রচুর আরাম সঞ্চয় করতে লাগ্‌লেন। ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে শুধু শারীরিক সুখ সম্ভোগই তাঁদের জীবনের

অদ্বিতীয় উদ্দেশ্য হোয়ে উঠ্লো। ক্রমে তাঁদের অবস্থা এরকম হোয়ে উঠলো যে, মঠ আর চলে না। এই অবস্থায় মঠাধ্যক্ষ "গিরি" সন্ন্যাসী অন্য সম্প্রদায়ের একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে জুয়া খেলে যথাসর্ব্বস্ব হারান। শেষে এই মঠ বাজী রেখে খেলা আরম্ভ করেন; দুর্ভাগ্যক্রমে মঠটিও হারাতে হয়। সন্ন্যাসী ঠাকুরের যে রকম পণ, তাতে যদি দ্রৌপদী থাকতো তা হলে তাঁকেও হয় ত পণে ধোরতেন। যাহোক তা না থাকলেও এখানেই এক পর্ব্ব অভিনীত হোয়ে গেল। সর্ব্বত্যাগী হয়েও যিনি ইচ্ছা কোরে প্রবৃত্তির স্রোতে আপনার মন প্রাণ ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, এখন বাধ্য হোয়ে তাঁকে নিবৃত্তির অঙ্কে আশ্রয় নিতে হলো ও আসক্তিবর্জ্জিত বৈরাগ্যাবলম্বী সাধুর মত সমস্ত ত্যাগ কোরে চলে যেতে হলো; কিন্তু তাঁর এই চিরন্তনের বিলাস-ক্ষেত্র ছেড়ে যেতে মনে যে দারুণ আঘাত লেগেছিল, মায়াবদ্ধ গৃহীর নৈরাশ্যপূর্ণ মর্ম্মভেদী যাতনা অপেক্ষা তা অল্প নয়।

যা হোক, যে সন্ন্যাসী এই মঠ লাভ কোল্লেন, তিনি ইহা দক্ষিণ দেশী রাওল ব্রাহ্মণদের কাছে বিক্রয় কোল্লেন। তাঁরাই এখন এই মঠের অধিকারী, সুতরাং বদরিনারায়ণের মন্দির আজও তাঁদের দখলে। [illegible]লুম, এ পর্য্যন্ত সাতাশ জন রাওল-ব্রাহ্মণ এই মঠের অধ্যক্ষতা কে[illegible] গেছেন। তাড়িত সন্ন্যাসী বা মঠাধ্যক্ষের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী কেবলানন্দ গিরি এখন নেপালে আছেন শুনা গেল। তিনি অতি মহৎ লোক। এই মন্দির হস্তগত করবার জন্যে তিনি বিশেষ চেষ্টা কোচ্ছেন। তিনি বলেন, মঠ দান বিক্রয় করবার বা বন্ধক দেবার সম্পত্তি নহে, কিম্বা মঠাধ্যক্ষের সে অধিকারও নাই; তিনি আজীবন মঠের স্বত্বাধিকারী মাত্র, তাও যদি তিনি পবিত্রভাবে মঠের সকল অনুশাসন মেনে চলেন, তা হোলেই। কলুষিত-চরিত্র বা ভ্রষ্টাচারী হোলে তাঁকে মঠচ্যুত হোতে হবে, ইহাই শঙ্করাচার্য্যের আদেশ। কেবলানন্দ গিরির এই মঠে সম্পূর্ণ অধিকার আছে। জানি না এই মঠ নিয়ে মামলা মকদ্দমা হওয়া সম্ভব আছে কি না

বিস্তৃত মঠপ্রাঙ্গণে বোসে একজন পলিতকেশ বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর মুখে মঠের শোচনীয় ইতিহাস শুনতে লাগলুম। মহামহিমান্বিত যোশীমঠের এই শোচনীয় কাহিনী আমার মনে শুধু মানবহৃদয়ের দুর্ব্বলতা, হীনতা ও স্বার্থপরতার কথাই জাগিয়ে দিতে লাগলো। দূর হোতে মনে হোত, যারা সংসারতাপদগ্ধ ক্লিষ্ট পার্থিব হৃদয়ের অনেক ঊর্দ্ধে শান্তি ও প্রীতির সুশীতল ছায়া উপভোগ করেন, পর্ব্বতের কোলের এই সকল পবিত্র তীর্থে তাঁদের দর্শন কোরে এবং তাঁদের কাছে সান্ত্বনার কথা শুনে হৃদয়ের অশান্তি ও দুর্ব্বলতা খানিকটে দূরে যাবে, চতুর্দ্দিকে বাহ্য প্রকৃতি শরীর ও মন উভয়কেই পবিত্র পরিতৃপ্ত কোরে তুলবে; সেই আশাতেই এত দূরে এত কষ্ট কোরে এসেছিলুম। বাহ্যপ্রকৃতি তার অনন্ত সৌন্দর্য্যের দ্বার উন্মুক্ত কোরে আমাকে মুগ্ধ কোরে ফেলেছে, এই স্বর্গীয় শোভা আমার হৃদয়ে পরিব্যাপ্ত হোয়ে রয়েছে। কিন্তু মানবের সে দেবহৃদয় কই? সেই আত্মত্যাগ ও সমদর্শিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—যা বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, এবং যা দেখবার আশাতে এতদূর এসে পড়েছি,—তা কোথায়?

বিষ্ণু প্রয়াগ

২৭ মে, বুধবার—অপরাহ্ণ।—আজ যোশীমঠ হোতে বের হবার একটুও ইচ্ছা ছিল না। শুধু একদিনের জন্যই নয়, আমার ইচ্ছা তিন চারি দিন এখানে থাকি। শঙ্করাচার্য্যের এই অতীত গৌরবের সমাধিক্ষেত্র, এই স্থান ছেড়ে আমার সহজে যেতে ইচ্ছে কোরেছিল না। থাকবার ইচ্ছা কল্লুম বটে, কিন্তু থাকা হোলো না; স্বামিজী জিদ্ করতে লাগলেন, আজই রওনা হোতে হবে; তার উপর অসহিষ্ণু বৈদান্তিকের তাড়না অসহ্য হোয়ে

উঠলো। দু' দণ্ড যে কোথাও বিশ্রাম করবো সে যো নেই, বোধ হয় জন্মান্তরে আমি গরু এবং বৈদান্তিক রাখাল ছিলেম, তাই বুঝি আজও নাকে দড়ি দিয়ে আমাকে নিয়ে ঘুরিয়ে বেড়াবার ঝোঁক ছাড়তে পারেন নি। কি করা যায়, বেরিয়ে পড়া গেল!

আগেই বোলেছি পাহাড়ের উপর যোশীমঠ, নীচে বিষ্ণুপ্রয়াগ। যোশীমঠ হোতে বিষ্ণুপ্রয়াগ একটা খুব খাড়া উৎরাই। যদি পাহাড়ের গায়ে গাছ-পালা না থাকতো, তা হোলে শঙ্করের মন্দির হোতে গা ছেড়ে দিলে তৎক্ষণাৎ বিষ্ণু-প্রয়াগে এসে একেবারে অলকনন্দা দাখিল হওয়া যেত! যোশীমঠ হতে এই উৎরাই-টুকু নাম্‌তে আমার একটু বেশী কষ্ট হয়েছিল, কারণ পাহাড়ের গা এমন সোজা, আস্তে আস্তে লাঠিতে ভর দিয়ে নবাবী চা'লে চলা যায় না; নামতে বেশ একটু বেগ পেতে হয়, কে যেন উপর হোতে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে নামিয়ে দিচ্ছে! আমরা বেলা ৫টার সময় রওনা হোয়েছিলুম, কিন্তু আধঘণ্টার মধ্যেই একেবারে বিষ্ণুগঙ্গার উপর টানা সাঁকোর কাছে এসে পড়লুম। এই বিষ্ণুপ্রয়াগে বিষ্ণুগঙ্গা অলকনন্দার সঙ্গে মিশেছে।

আমি একটী একটী করিয়া ক্রমাগত প্রয়াগের কথাই বোলেছি। একটা প্রয়াগের যায়গায় পাঁচটা প্রয়াগের কথা বলেছি, তবু আমার প্রয়াগ ফুরোয় না। আজ আবার আর এক প্রয়াগে উপস্থিত। সর্ব্বশুদ্ধ প্রয়াগ পাঁচটাই বটে; কিন্তু বিষ্ণুপ্রয়াগকে পূর্ব্ব বর্ণিত প্রয়াগগুলির মধ্যে একটা Supplement বলে ধোরে নেওয়া দরকার; Supplement এই জন্যে বোলছি যে 'কেদারখণ্ডে' পাঁচটার বেশী উল্লেখ নেই, কিন্তু তথাপিও বিষ্ণু-প্রয়াগকে প্রয়াগ না বোল্লে তার উপর নিতান্ত অবিচার করা হয়; শুধু অবিচার নয়, তাতে তার যথেষ্ট অপমান করাও হয়। বিষ্ণুপ্রয়াগকে প্রয়াগ শ্রেণীভুক্ত না করাতে অন্ততঃ এই প্রমাণ হয় যে 'কেদারখণ্ড' লেখক একজন চিন্তাশীল ও ভক্ত হোতে পারেন; কিন্তু তিনি কবি নন এবং কবি-

ত্বের মাধুর্য্য ও গৌরব অপেক্ষা তিনি পৌরাণিক আধিপত্যকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে চান।

যাহোক, কাব্যজগতে বিষ্ণু-প্রয়াগের মহিমা স্বপ্রকাশিত ; তা কোন লেখকের লেখনীমুখে ব্যক্ত হোক, আর নাই হোক। আজকাল প্রকৃতির জীবন্ত সৌন্দর্য্যের প্রীতিপূর্ণ স্নিগ্ধ সত্তার পৌরাণিক প্রতিষ্ঠার উপর নিঃসঙ্কোচে রাজত্ব কোরচে, সুতরাং এ যুগে বিষ্ণু-প্রয়াগকে প্রয়াগসমষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিলে বেশী আপত্তি হবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। আর যদি দুই নদীর সঙ্গমস্থলকেই প্রয়াগ বলা যায়, তা হোলে এই স্থানটিকেই সকলের আগে প্রয়াগ বলা উচিত। কেন, সে কথা আগে বোলেছি।

আমরা যখন যোশীমঠ হোতে খানিকটে নেমে এসেছি, সেই সময় খানিক দূরে জলের একটা গম্ভীর কল্লোল শুনা গেল। এই অবিরাম কল্লোলের সঙ্গে কার যে তুলনা দেওয়া যেতে পারে, অনেক চিন্তা কোরেও স্থির কোর্ত্তে পারি নি। কোথা হোতে এই শব্দ আসচে, তা কিছুই ঠিক কোর্ত্তে পাল্লুম না, বিশেষ আমাদের তিন জনেরই অভিজ্ঞতা সমান, সুতরাং কোন রকমেই মীমাংসা হলো না। তবে অনুমান, এ শব্দ অলকনন্দার স্রোতের শব্দ ভিন্ন আর কিছু নয়। ক্রমে যখন ধীরে ধীরে বিষ্ণুগঙ্গার সাঁকোর উপর এসে পোড়লুম, তখন খুব প্রবল শব্দ শুনতে পাওয়া গেল ; একটু এদিকে ওদিকে সন্ধান কোর্ত্তেই দেখ্‌লুম, বিষ্ণুগঙ্গা খুব প্রবল বেগে বয়ে যাচ্চে, এ তারই শব্দ। আমরা ঘুরতে ঘুরতে নদীর কাছে এসে দাঁড়ালুম। এখানে নদীর তলদেশ অত্যন্ত ভয়ানক, বড় উচু নীচু, তাই এ রকম জলের শব্দ হোচ্চে।

আমরা সাঁকো পার হোয়ে বাজারে উপস্থিত হোলুম। বাজার ত ভারি, সেই "যথাপূর্ব্ব তথাপর"। খানিকটে অপ্রশস্ত সমতল জায়গায় খান চার দোকান ; তাতে আটা, ডাল, ঘি, নুন, গুড় বিক্রয় হয়। আমরা বাজারে উপস্থিত হবা-মাত্র একজন দোকানদার—ফরমাইস পেলে সে তখনি গরম

গরম পুরী, ভুজ্জি (তরকারী) তৈয়েরী কোরে দিতে পারে, এই কথা আমাদের কাছে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা কোর্‌লে এবং কথার সাক্ষীস্বরূপ আর তিন চার জন লোককে দাঁড় করালে ; তারাও মুক্তকণ্ঠে এই হালুই-কর ঠাকুরের যশোগানে প্রবৃত্ত হোলো। এদের রকম সকম দেখে আমার বড়ই আমোদ বোধ হোয়েছিল ; আমার আরো আমোদের কারণ, তারা আমাদের যতটা নির্ব্বোধ ভেবে দু'পয়সা উপায়ের চেষ্টা কোচ্ছিল, সুখের বিষয় আমরা ততটা নির্ব্বোধ নই, কিন্তু সে জন্য তাদের মনে অনেকখানি আশার সঞ্চার সম্বন্ধে কোনও বাধা হয় নি। দেখ্‌লুম কলিকাতার চিনেবাজারের দোকানদারেরাই যে ধূর্ত্ত ও ব্যবসাকার্য্যে দক্ষ, তা নয় ; হিমালয়বক্ষে এই সকল দোকানদারেরাও জানে, কি রকম কোর্‌লে দুপয়সা উপায় হতে পারে।

যাহোক, মিষ্ট কথা ও ভবিষ্যতে পুরীর খরিদ্দার হবার ষোল আনা রকম আশা দিয়ে এই দোকানদার-পুঙ্গবটিকে বশ করা গেল। কোথায় রাত্রি কাটান যায়, তা ঠিক করবার জন্যে তার উপরই ভার দিলুম। বুঝলুম আজ তাকে যে লোভ দেখান গিয়েছে, তাতেই সে আমাদের জন্যে কষ্ট স্বীকার কোর্‌বে ; আর বাস্তবিকই দেখলুম, এই সাধুদের কাছে দু'পয়সা লাভ কোরতে পার্‌বে বুঝে, সে আমাদের একটা আড্ডার জন্যে খুব উৎসাহের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো। কিন্তু তার কোনও চেষ্টার ত্রুটি না হোলেও, অদৃষ্ট ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে, কাজেই কোথাও-আড্ডা মিল্‌লো না। বামুন ঠাকুর অনুসন্ধানের পর অকৃতকার্য্য হোয়ে যখন আমাদের সম্মুখে কাতর ভাবে দাঁড়াল, তখন আমাদের নিজের কথা ভেবে যতটা দুঃখ না হোক, ঠাকুরের ভাব দেখে তার চেয়ে বেশী দুঃখ হোয়েছিল। আমি ঠাকুরকে বুঝিয়ে দিলুম, তার আর কষ্ট করবার দরকার নেই, আমরাই একটা বাসা খুঁজে নিচ্ছি ; কিন্তু এতে যেন সে নিরুৎসাহ না হয়, লুচি তরকারী তার দোকান ছাড়া আমরা আর কোথাও নিচ্ছি নে।

আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া গেল। স্থান আর মেলে না। সকাল বেলায় যে সব যাত্রী যোশীমঠে না গিয়ে রাস্তা থেকে আমাদের ছেড়ে নীচের পথ দিয়ে বরাবর এখানে চোলে এসেছে, তারাই এখানে সকল আড্ডা দখল কোরে ফেলেছে, একটি প্রাণীও ছেড়ে যায় নি; সুতরাং পরে আসার জন্যে আমাদের স্থানাভাব হোয়ে উঠেছিল। এখনো অনেক বেলা আছে, অথচ যাত্রীর দল আর অগ্রসর না হোয়ে, এখানে কেন সময় ক্ষেপ কোরছে জান্‌বার জন্যে বিশেষ কৌতূহল বোধ হোল। শুনলুম, আগামী কাল যে পথে চোল্‌তে হবে তার মত ভয়ানক, বিপদপূর্ণ রাস্তা বদরিনারায়ণের পথে আর নেই; অপরাহ্নে এ পথে চলা দুরূহ। রাত্রে নিদ্রায় শ্রান্তি দূর কোরে সকালে এই পথে চলা সুবিধা ও যুক্তিসঙ্গত মনে কোরে যাত্রীরা আজকের মত এখানেই অপেক্ষা কোচ্ছে। অল্প কয়েক-খানি ঘর তারা এমন পরিপূর্ণ মাত্রায় দখল কোরেছে যে তার মধ্যে একটু পা বাড়াবার যায়গা নাই। লোক যে বড় বেশী তা নয়; তারা যদি একটু গোছাল ভাবে বিছানা গুলি বিছিয়ে নিত, তা হোলে প্রত্যেক ঘরে আরো ৫।৭ জনের স্থান হোতে পারতো; কিন্তু সন্ন্যাসী বাবাজীরা তীর্থ কোরতেই এসেছেন, এবং নারায়ণ দর্শন কোরে অনেকখানি পুণ্য সঞ্চয়ই তাঁদের অভিপ্রায়; তাঁরা অনুগ্রহ কোরে পা দু'খানি একটু গুটিয়ে বোস্‌লে সেই পদতলে আমরা যৎকিঞ্চিৎ স্থান পেয়ে এই বরফ রাজ্যে কৃতার্থ হোয়ে যাই, তাঁদেরও পুণ্য সঞ্চয় হয়, সে কথা বোধ করি তাঁদের ভাব্‌বার অবসর হয় নি। এতটুকু অসুবিধা যারা সহ্য কোরতে প্রস্তুত নয়, তারা যে কেন সন্ন্যাসী হোয়েছে তা আমি বুঝতে পারিনে। বলা বাহুল্য, সন্ন্যাসীদের এই স্বার্থপরতা দেখে বেশী রাগ হোয়েছিল, কি রাত্রিবাসের অনুপায় দেখে বেশী রাগ হোয়েছিল, তখন তা ঠিক কোরে বল্‌তে পারিনে; তবে মনে হয়, গাছ তলায় বরফে পড়ে থাকার চেয়ে ঘরে একটু আয়াসে থাকা যায় আর এই সন্ন্যাসীগুলো সেই আরামের বিষম বিঘ্ন, অতএব আত্ম-সুখের কথাটা

পিছনে দাঁড় করিয়ে তাদের স্বার্থপরতার উপরই রাগটা বেশী প্রবল হোয়ে উঠেছিল। বাস্তবিক কত সময় আমরা পরের স্বার্থপরতা দেখে রাগ করি; কিন্তু আমাদের সে রাগও স্বার্থপরতাপূর্ণ। আমাদের মনে হোতে লাগলো, যদি আমাদের দেশ, কি আমাদের ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেটের রেলগাড়ি হোতো, তা হোলে এখনি পুলিসম্যান ডেকে ওদের গাঁটরি ও বোঁচকা বুঁচকি সরিয়ে দিয়ে এত জায়গা করে নিতে পাত্তুম যে, তাতে বোসে হাত পা মেলে বিলক্ষণ আরাম কর্ত্তে যেতো। কিন্তু এখানে সে রকমের প্রীতিকর সম্ভাবনা কিছু মাত্র নেই, কাজেই উপস্থিত রাগটা চাপা দিয়ে বাসার অনুসন্ধানে অন্যত্র প্রস্থান করা গেল।

থানিক ঘুরতে ঘুরতে স্বামীজি ও অচ্যুত ভায়া বোসে পোড়লেন, আমার শ্রান্তি ক্লান্তি নেই; আমি ভাবলুম, আগে সঙ্গমস্থলটা দেখে আসি, তার পর যা হয় করা যাবে। সঙ্গমস্থলে চল্লুম। বাজারের পিছনে খানিকটে নীচেই সঙ্গমস্থল, কিন্তু বাজারের পিছনে অল্প একটু নেমেই একেবারে ঠিক সঙ্গমস্থলের মাথার উপরে পাহাড়ের গায়ে একটা খুব নূতন ছোট মন্দির দেখলুম। মন্দিরটি এমন স্থানে [illegible]র্ম্মিত যে, এখানে মহাদেব প্রতিষ্ঠা না কোরে যদি একজন কবিকে [illegible]ষ্ঠা করা যেত, তা হোলে ঠিক কাজ করা হোতো। বিষ্ণুগঙ্গা ও অলকনন্দা গভীর নীচে দিয়ে আনন্দো[illegible]াসের বিপুল কল্লোলে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন কোরেছে; পাশে ঈষৎ বক্র সমুন্নত বিশাল পর্ব্বত আকাশ ভেদ কোরে উঠেছে এবং তারই গায়ে এই ক্ষুদ্র মন্দির, প্রকৃতির স্বহস্তনির্ম্মিত চিত্রবৎ! তখন সন্ধ্যার বড় বিলম্ব ছিল না, আলো ও অন্ধকারের কোমল মিলন মন্দিরের শোভন দৃশ্যকে আরও মধুর কোরে তুলেছিল। আরো অগ্রসর হোয়ে দেখলুম, মন্দিরটির পাদদেশ হোতে আরম্ভ কোরে পাহাড়ের গা খুঁদে ছোট ছোট সিঁড়ি তৈয়েরী করা হয়েছে; সিঁড়ি একেবারে সঙ্গমস্থলে এসে পোড়েছে। উদ্দাম তরঙ্গ সেই সিঁড়িতে, পর্ব্বতের কঠিন গায়ে ক্রমাগত

আছ্‌ড়ে পোড়ছে। এ পর্য্যন্ত অনেক সুন্দর দৃশ্য দেখেছি, কিন্তু এই প্রকারের এমন সুন্দর দৃশ্য আমার চক্ষে এই নূতন। মন্দিরের কাছে এসে ইচ্ছা হোলো আজ এখানেই থাকি। মন্দিরের বাইরে খানিক বারান্দা বের করা ছিল, তাতে তিন চারজন লোক বেশ থাক্‌তে পারে; কিন্তু কাকেও না দেখে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করছি, এমন সময় দেখি সেই দোকানদার বামুন সেখানে উপস্থিত; কথায় কথায় জানতে পাল্লুম মন্দির এখন সেই দোকানদারেরই জিম্মায় আছে। আমি তখন সেই মন্দিরে থাকবার অভিপ্রায় প্রকাশ কোল্লুম; কিন্তু সে প্রথমে কিছুতেই রাজি হোলো না, কারণ মন্দিরটি নূতন তৈয়েরী হোয়েছে, তাতে এখনো দেবতা প্রতিষ্ঠা হয় নি। এক বৎসর হোলো ইন্দোরের রাণী এসে এই মন্দির তৈয়েরী করিয়ে দিয়েছেন। এই বৎসর নর্ম্মদাতীর হোতে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি এনে মন্দির ও দেবতা উভয়েরই প্রতিষ্ঠা করা হবে।

আমি তো জোর জবরদস্তি কোরে মন্দিরের সম্মুখে বোসে পড়লুম, সেও কিন্তু নাছোড়বন্দা। যাহোক দুই চারিটী বচন দেওয়ার পর সে আর কোন আপত্তি কল্লে না; মন্দিরদ্বারে একটি ছোট ছেলে বোসেছিল; তাকে বাজারে পাঠিয়ে স্বামীজী ও অচ্যুত ভায়াকে ডাকিয়ে আনলুম। স্বামীজী মন্দির ও স্থানের সৌন্দর্য্য দেখে একেবারে আনন্দে অধীর, বৈদান্তিক পারৎ পক্ষে কারো প্রশংসা করেন না, কিম্বা অল্প কারণে তাঁর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ওষ্ঠের উপকূলে প্রকাশ পায় না, কিন্তু এই সুন্দর স্থান আবিষ্কার করার জন্যে তিনি আজ আমাকে কলম্বসের পাশে আসন দিতে সঙ্কুচিত হোলেন না। বাস্তবিক কোথায় আজ স্থানাভাবে এই শীতে বরফের মধ্যে, অনাবৃত আকাশতলে বাস করার জন্যে তাঁরা প্রস্তুত হোচ্ছিলেন, আর কোথায় এই সুন্দরস্থানে দেবনাঞ্ছিত মন্দিরের মধ্যে সুখশয্যা!

মন্দিরের ভিতরটী আটকোণবিশিষ্ট, উপরে যথারীতি চূড়া। দ্বারের গাড়ী-বারান্দার মত একটা বারান্দা বের করা, তার তিন দিকে বড় বড়

কপাট লাগানো সুতরাং ইচ্ছা কোল্লেই চারদিক্ বন্ধ কোরে বেশ সুরক্ষিত অবস্থায় থাকা যায়। আমরা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ না কোরে আগে যে সিঁড়ির কথা বলেছি, সেই সিঁড়ি দিয়ে সঙ্গমস্থলে নেমে গেলুম। সেখানে —আর শুধু সেখানে কেন—এই মন্দির মধ্যে কথা বোল্‌তে হোলে খুব চেঁচিয়ে বোলতে হয়, কারণ জলের এত শব্দ যে কিছুই শুন্‌তে পাওয়া যায় না। বিষ্ণুপ্রয়াগ সমতল স্থানে নয়, দুদিক্ হোতে যে দুটী নদী নীচে আসচে, উভয়েই পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে নামচে সুতরাং অন্য স্থান অপেক্ষা এখানে নদীর স্রোত এবং শব্দ দুইই বেশী। তার উপর যেখানে সঙ্গমস্থল, তার আট দশ হাত উজানে অলকানন্দা একটা পাহাড়ের উপর থেকে লাফিয়ে নীচে পোড়চে সুতরাং এই মন্দিরের কাছে শব্দ আরো বেশী। সমুদ্রগর্জ্জন অনেকেই শুনেছেন; অপার জলধির বিপুল গর্জ্জন, বায়ুহিল্লোলে উন্মত্ত তরঙ্গরাশির অসীম মুক্তপ্রদেশে অবাধ নৃত্য এবং তার প্রবল বিক্রম, এ সকলের মধ্যে কোমলতা বা সঙ্কীর্ণতা নেই, তাই বুঝি আমাদের ক্ষুদ্র কল্পনা তার ভিতর পোড়ে শ্রান্ত, অবসন্ন ও ব্যতিব্যস্ত হোয়ে পড়ে; কিন্তু সঙ্গমস্থলের জলের অবস্থা সে রকম নয়। এই অবিশ্রান্ত শব্দে মনে শ্রান্তি আনে না, শান্তি আনে; এই উগ্রশব্দের মধ্যে এমন একটু কোমলতা, এমন একটু মিষ্টতা আছে, যা মর্ম্মস্পর্শী। অনেকক্ষণ শব্দ শুন্‌তে শুন্‌তে বোধ হয় ঘুম আসে; কিন্তু তাই বোলে এর বিক্রম কম নয়। সঙ্গমস্থলের এই ঘূর্ণিত ফেনিল জলে নামে কার সাধ্য? নামতে সাহসই হয় না। দিবারাত্রি জল আলোড়িত হচ্ছে; জলের কাছে গেলে মাথা ঘুরে যায়। ইন্দোরের রাণী মন্দির হোতে সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়ে তার সব নীচের সিঁড়ির দুপাশে পাহাড়ের মধ্যে লোহার শিকল বাঁধিয়ে দিয়েছেন। এই শিকল জলের উপর দোলে, যাত্রীরা এই শিকল ধোরে জলস্পর্শ করে, স্নান করিবার শক্তি কারো নেই। যাদের মাথা ভাল নয়, একটা কিছু গোলমাল দেখলেই সহজে যাদের মাথা ঘুরে উঠে, তাদের এ জলের কাছে যাওয়া উচিত নয়।

হিমালয়ের মধ্যে এমন অনেক স্থান আছে যাদের সঙ্গে এর তুলনা হোতে পারে ; কিন্তু সে তুলনা হিমালয়বাসী ছাড়া আর কেউ বুঝ্বেন কিনা সন্দেহ ; তার চেয়ে যদি বলা যায়, এ একটা ছোটখাট নায়েগ্রার মত, তা হোলে বোধ করি অনেকে বুঝ্তেপারেন, কারণ বাঙ্গালীর মধ্যে দু'চারজন ছাড়া আর কেউ নায়েগ্রা না দেখ্লেও অনেকেই তার বর্ণনা পোড়ে পোড়ে তাতে অভ্যস্ত হোয়ে গেছেন, এই সঙ্গমস্থল নায়েগ্রার একটা ছোট প্রতিকৃতি বোল্লেই বোধ হয় বর্ণনা ষোল আনা রকম হয়। এতে যিনি সন্তুষ্ট নন, তাঁকে সঙ্গে কোরে আমি পাহাড় পর্ব্বত ভেঙ্গে বরং এখানে আস্তে রাজী আছি, কিন্তু বর্ণনা দিতে সম্পূর্ণই অক্ষম।

সমস্ত দেখে শুনে আমরা উপরের সেই মন্দিরে এসে উপস্থিত হোলুম। যাবার সময় দেখে গিয়েছিলুম মন্দিরের ভিতরের দ্বার বন্ধ, এখন দেখি দ্বার খোলা। একটি ৮।৯ বছরের ছেলে সেই উন্মুক্ত দ্বারের মধ্যে বোসে আছে। ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলুম, ভবিষ্যতে যেখানে শিবমূর্ত্তি স্থাপিত হবে, সেইখানে একখানা কাঠের ছোট চৌকীর উপর তেল সিঁদূরে মাখানো পাথরের খোদা কয়েকখানা মূর্ত্তি ; তেল সিঁদূরের প্রসাদে তারা পুরুষ কি স্ত্রী, মানুষ কি আর কিছু, কিছুই বুঝ্বার উপায় নেই ! মন্দিরের মালিক এখানে আসেন নি, তাই এই বালক নিখরচায় তার পুতুল গুলিকে মন্দিরের মধ্যে বসিয়ে অনায়াসে দু'চার পয়সা রোজগার কোর্‌চে ; পরে যখন মন্দিরের প্রকৃত অধিকারী এসে উপস্থিত হবেন, তখন এই দেবতারা অন্যান্য জাতিভায়ার মত বৃক্ষতল আশ্রয় কোর্‌বেন। জিজ্ঞাসা কোরে জানলুম, বালকটী আমাদের সেই লুচিওয়ালা বামুনঠাকুরের ছেলে। এদের বাড়ী যোশীমঠে। ছেলেটীর সঙ্গে গল্প যুড়ে দেওয়া গেল। এদিকে বৈদান্তিক ভায়া দোকানদারকে পুরী প্রভৃতি ফরমাইস দিলেন। যে পরিমাণে জিনিস তিনি ফরমাইস দিলেন, তাতে আমার ও স্বামীজির চার পাঁচ দিন চল্‌তো এবং যদি বৈদান্তিকের উদরের পরিমাণ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা না

থাক্‌তো, তা হোলে মনে কর্‌তুম ভায়া এই তীর্থস্থানে বুঝি আট দশজন সাধু সন্ন্যাসীকে খাইয়ে স্বর্গের পথ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত করবার চেষ্টায় আছেন! কিন্তু তিনি তেমন লোক নন, পুণ্যার্জ্জনের জন্যে তিনি সর্ব্বত্যাগ কোরেছেন, কিন্তু উদরের জন্যে তিনি এই পুণ্যেরও কিয়দংশ ত্যাগ কোর্‌তে প্রস্তুত।

সন্ধ্যা হোয়ে এল। অন্ধকার হোয়েছে দেখে ছেলেটী উপরে উঠে গিয়ে বাজার থেকে ঘি সল তে প্রদীপ নিয়ে এল; তাই বুঝতে পারলুম, মন্দিরের বর্ত্তমান অধিবাসিগণ প্রত্যহ প্রদীপের মুখ দেখ্‌তে পান না। আজ আমাদের কল্যাণে তাঁরা একটু দেবত্ব উপভোগ কোরে নিলেন। শুধু ঘি সলতে নয়, ছেলেটি যথারীতি আড়ম্বর কোরে ঠাকুরদের আরতি করলে; তারপর আবার উপরে দোকানে গিয়ে খানকতক লুচি আর খানিকটে গুড় এনে ঠাকুরদের, ভোগ দিলে; বলা বাহুল্য আমাদের জন্যে তার বাপ লুচী তৈয়েরী করেছিল মন্দিরের ঠাকুরমশায়েরা তাতেই ভাগ বসালেন। ভোগ হোয়ে গেলে ছেলে আমাদের প্রসাদ দিতেও ত্রুটি কল্লে না। এ অবস্থায় সে বালককে যৎকিঞ্চিৎ না দেওয়া ভাল দেখায় না, সুতরাং তাকে কিছু দেওয়া গেল; সে তা প্রণামী শ্রেণীভুক্ত কোরে, বকশিসের জন্যে জেদ করতে লাগলো। কায়দা মন্দ নয়। বৈদান্তিক ভায়া বল্লেন, এখন ঐ পর্য্যন্ত থাক, ফিরে আসবার সময় বকসিসের ব্যবস্থা করা যাবে। বোধ হয় আমাদের আর বিরক্ত করা সঙ্গত নয় মনে কোরে সে মন্দির ত্যাগ কোরে চলে গেল এবং যাবার সময় প্রদীপ নিবিয়ে 'তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে' কোরে দোরে তালা লাগিয়ে গেল। সে সেই রাত্রে এই চড়াই উঠে যোশীমঠে যাবে। কি সাহস! বাঙ্গালী বালক দূরের কথা, বাঙ্গালী সাহসী যুবকও একাজে প্রবৃত্ত হোতে সাহস করেন না। এ জন্যে একবার আমাদের নিজেকে নিন্দা করবার জন্য মনটা একটু ব্যস্ত হোয়ে উঠেছিল, কিন্তু ভেবে দেখলুম, এ বালকের এই অভ্যাস ও শিক্ষা অনেক দিনের। পর্ব্বত-ক্রোড়ে প্রতিপালিত এই সকল

বালকবালিকা মাতৃক্রোড় থেকে পর্ব্বত ক্রোড়ে প্রথম পদক্ষেপ কোরেই এই রকম কষ্টসহ, নির্ভীক হোতে চেষ্টা কোরেছে;—তাই বুঝি একজন য়ুরোপীয় কবি বোলেছেন, পর্ব্বত স্বাধীনতার প্রসূতি,- কিন্তু আমরা কোথা সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু হোতে শিক্ষা করবো ? ছেলেবেলায় চলতে চলতে দৈবাৎ যদি পদস্খলন হোতো তা হোলে মা দৌড়ে এসে গায়ের ধূলা ঝেড়ে দিতেন এবং মাটিতে লাথি মেরে বুঝিয়ে দিতেন আমার কোন দোষ নেই,যত দোষ মাটীর ; সেই তাঁর যাদুকে গড়াগড়ি খাইয়েছে ! তার পর ক্রমে বড় হোয়ে হারিকেন লণ্ঠন ছাড়া চোলতে শিখিনি এবং ঠাকুরমার রোমাঞ্চকর ভূতের গল্প শুনে নিজের লম্বা ছায়াকেও বিকট ভূত মনে কোরে কতদিন চীৎকার কোরেছি ; সুতরাং আমাদের সঙ্গে এদের কি রকমে তুলনা হোতে পারে ? আমরা আহারাদি কোরে মন্দিরে গমনের উদ্যোগ কোরতে লাগলুম। পাঠক পাঠিকা আমাকে ক্ষমা কোরবেন, এই আহারের পূর্ব্বে আমার ডাইরীতে এমন একটা ব্যাপারের উল্লেখ আছে, যা এখানে উল্লেখ করার সম্পূর্ণ আপত্তি ছিল, কিন্তু আমার এই ডাইরী নকল করিবার সময় আমার কাছে আমার একটী আত্মীয়া বোসেছিলেন; এই ব্যাপারটি গোপন করাতে তিনি আমার উপর এমন গঞ্জনা আরম্ভ কোল্লেন যে,আমি সেটা উল্লেখ না কোরে থাকতে পাচ্ছিনে, বিশেষ তাঁর অনুরোধ উপেক্ষণীয় নয়। ব্যাপারটী তেমন কিছু গুরুতর নয়, একটু চা খাওয়া মাত্র। বিষ্ণুপ্রয়াগে এই শীতের মধ্যে একটু গরম হবার অভিপ্রায়ে, যোশীমঠ হোতে কিঞ্চিৎ চা সংগ্রহ হয়েছিল ; সন্ধ্যার পর বিশেষ আয়েস কোরে সেই চা পান করা গিয়েছিল। তাতে আমাদের যা তৃপ্তি হোয়েছিল, তা বর্ণনাতীত ; এবং স্বামীজি চা পানের উপসংহারে যে "আঃ" বোলে আরামজ্ঞাপক শব্দ উচ্চারণ কোরেছিলেন তা অনেক দিন মনে থাকবে। আমরা সন্ন্যাসী মাত্র, তবু আমাদের এই পর্ব্বতের মধ্যে কাত্‌লির অভাবে লোটাতে জল গরম কোরে, চিনির অভাবে গুড় দিয়ে, চা খাওয়ার বিড়ম্বনা কেন; এই মনে কোরে যদি কোন

বিদ্রূপপরায়ণা পাঠিকা নাসিকা কুঞ্চিত করেন, এই ভয়ে এই চা খাওয়ার বৃত্তান্তটি বেমালুম গোপনের চেষ্টায় ছিলুম, কিন্তু ঘরের ঢেঁকী কুমীর হোলেই বিপদ। যাহোক এই ব্যাপার প্রকাশ কোর্ত্তে বাধ্য করায় আমি তাঁর উপর বড় রাগ কোরেছিলুম, কিন্তু তাতে আমাকে তিনি যে গল্প শুনিয়ে দিলেন, তাতে আমি বড়ই জব্দ হলুম। তিনি বোল্লেন, একবার পুরুষোত্তমে এক সন্ন্যাসী একখানা ইট মাথায় দিয়ে শুয়েছিল; কতকগুলি যাত্রী সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল; তাদের মধ্যে একজন তার সঙ্গীদের ডেকে বল্‌লে "একবার সন্ন্যাসী ঠাকুরের সুখ দেখ, যদি উচু জায়গা মাথা না রাখলে শোয়া না হয় ত সন্ন্যাসী না হোলেই হত!" সন্ন্যাসী এই কথা শুনে ইটখানি দূরে ফেলে দিয়ে শুধু মাথায় শয়ন কোরলে; তাতেও বেচারার অব্যাহতি নেই। পূর্ব্বকথিত যাত্রী বলে উঠলো "হুঁ, সুখটুকুও আছে, রাগটুকুও আছে।" আগে যদি জানতুম কিছুদিন বাদে আমাকে এমন একটা বিড়ম্বনা সহ্য কোর্‌তে হবে, তা হোলে কখন বিষ্ণুপ্রয়াগের সেই মন্দিরে বোসে চা খাবার যোগাড় কোর্ত্তুম না। বুঝলুম ভগবান মানুষকে সর্ব্বজ্ঞ না করুন, নিদেন দু এক জায়গায় ভবিষ্যতজ্ঞ না কোরে কাজ ভাল করেন নি।

আহারাদির পর স্বামীজি ও বৈদান্তিক শয়ন কোল্লেন। আমার চক্ষে ঘুম নেই। মন্দিরের মধ্যে ঘোর অন্ধকার, সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, কেবল মন্দিরের নীচে সঙ্গমস্থল হোতে জলের 'হু' 'হু' শব্দে নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কোরে দিচ্ছে। কম্বলটা মুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে বাইরে এলুম। তখন রাত্রি অনেক এবং আকাশে শুক্লপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্রের উদয় হোয়েছিল। বিজন পার্ব্বত্য প্রদেশ ঘুমন্ত, তার উপর চন্দ্রের মৃদু রশ্মি ব্যাপ্ত হোয়ে পড়েছে। আমি আস্তে আস্তে অতি সাবধানে মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে জলের ধারে এলুম এবং অনেকক্ষণ সেখানে বোসে রইলুম। অতি সুন্দর মধুর রাত্রি, যদি এত শীত না থাকৃতো। ছোট ছোট ধাপে তার নির্ম্মল জল আছড়ে পোড়ছে আর ফেনিল আবর্ত্তের উপর জ্যোৎস্না পোড়েছে, ঠিক একখানা সুন্দর ছবি

মত দেখাতে লাগলো। গভীর রাত্রে এই অবিরাম শব্দ, উচ্ছৃঙ্খল ভাব যেন আকুলভাবে বোলতে লাগলো :—

"এ আবেগ নিয়ে কার কাছে যাব,
নিতে কে পারিবে মোরে!
কে আমারে পারে আঁকড়ি রাখিতে
দুখানি বাহুর ডোরে!
আমি কেবল গাই কাতর গীত!
কেহবা শুনিয়া ঘুমায় নিশীথে,
কেহ জাগে চমকিত!
কত যে বেদনা সে কেহ বোঝে না,
কত যে আকুল আশা,
কত যে তীব্র পিপাসাকাতর ভাষা!"

অনেকক্ষণ এখানে বোসে থাকলুম। যতক্ষণ বসেছিলুম, বোধ হোয়েছিল বুঝি জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছি; যেন মৃত্যুর আবরণ ভেদ কোরে এক মহাজীবনের অমর প্রান্তে এসে লেগেছি। এখন ভাস্‌তে ভাস্‌তে কোথায় যাব কে জানে?

অনেক রাত্রে স্বস্থানে এসে শয়ন কোল্লুম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হোয়ে পোড়লুম।

পাণ্ডুকেশ্বর।

২৮এ মে, বৃহস্পতিবার।—ইতিপূর্ব্বে যে ভয়ানক রাস্তার কথা বলেছি, আজ সেই রাস্তায় চোল্‌তে হবে। এত দিন ত অনেক ভয়ানক পথই দেখে আসা গেল। আরো ভয়ানক! আমার ত তার একটা ধারণাই হোলো না। এখন যদি কোন পথে গাড়ীর চাকার মত গড়িয়ে যাওয়া যায়, তা হোলেই তা একটু নূতন রকমের ভয়ানক হবে বোলে বোধ হয়। যাহোক এই রাস্তার ভয়ানকত্ব জানবার জন্যে মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ আগ্রহও জন্মালো। বিষ্ণু-প্রয়াগ থেকে বদরিনারায়ণ বারো ক্রোশ অর্থাৎ আঠারো মাইল। এ দেশের এক ক্রোশে দেড় মাইল; কিন্তু এইবারের ক্রোশের এক এক ক্রোশকে—"ডালভাঙ্গা" ক্রোশ বলা যেতে পারে। আমাদের সহরাঞ্চলের পাঠকমহাশয়দের বোধ হয় ডাল-ভাঙ্গা ক্রোশের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই। বাঙ্গালার কোন কোন জেলায় পথিকেরা গন্তব্য স্থানে রওনা হবার সময় গাছের ডাল ভেঙ্গে তা হাতে নিয়ে চোল্‌তে থাকে। পথ চোল্‌তে চোল্‌তে রৌদ্রের উত্তাপে যখন এই ডালের পাতাগুলি শুকিয়ে যায়, তখনই এক ক্রোশ পথ চলা হয়। তা আট ক্রোশ যাওয়ার পরই ডাল শুকোক্, কি দশ ক্রোশ চলার পরই শুকোক্। বদরিনারায়ণের এই বার ক্রোশ, আমাদের দেশের "আট বারং ছিয়ানব্বই" ক্রোশের ধাক্কা।

রাস্তায় বের হোয়ে ধীরে চলা আমার শাস্ত্রে লেখে না। যখন দুই সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী ও শ্রী পুরুষোত্তম দর্শনাকাঙ্ক্ষায় যাচ্ছিলেন, সেই সময় শ্রীকে কিছু দ্রুতগামিনী দেখে জয়ন্তী বোলেছিলেন, "ধীরে চ বহিন, তাড়াতাড়ি চোল্লে কি অদৃষ্টকে ছাড়াতে পারবি?"—তাড়াতাড়ি চল্লে যদি অদৃষ্টকে ছাড়ান যেতো, তা হোলে এতদিন এ দগ্ধ অদৃষ্ট অনেক

পেছনে পোড়ে আর কোন পথিকের স্কন্ধাবলম্বনের অবসর খুঁজতো। কিন্তু তা তো হবার নয়; অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গেই ফেরে, এবং তা জেনেও আমি তাড়াতাড়ি চলি; অভিপ্রায়, অদৃষ্টে যা কিছু আছে শীঘ্র শীঘ্র ঘটে যাক্; তার পরে দিন কত একটু বিরাম ভোগ করা যাবে। বৈদান্তিক ভায়াও আমার তাড়াতাড়ি চলার একটা ভাল রকম কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন, সেবার তাঁকে আমি এই কৈফিয়ৎই দিয়েছিলুম; কিন্তু তাতে তিনি আমাকে যে সম্ভাবনা জানিয়েছিলেন, তার মধ্যে কতখানি বেদান্ত ও কতটুকু মায়াবাদ ছিল, তা ঠিক কোর্ত্তে পারি নি। যাই হোক, কিন্তু তাঁর গল্পে একটু নূতনত্ব ছিল এবং পথ চোল্‌তে চোল্‌তে সেই নূতনত্বটুকু বেশ আমোদজনক বোধ হোয়েছিল। আমার সহৃদয় পাঠকগণকে আমি সে রস হোতে বঞ্চিত কোর্ত্তে চাইনে, কারণ সেটা সাধুর লক্ষণ।

বৈদান্তিক ভায়া বোল্লেন, "আমি যে অদৃষ্টের ভোগটা তাড়াতাড়ি কাটিয়ে দিনকতক আরাম ভোগের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় স্ফীত হোচ্ছি, তা আমার মত নূতন বিরক্ত মূঢ় সন্ন্যাসীর কাছে বড় সহজ বোলে বোধ হোলেও, কাজে তা বিলক্ষণ কঠিন। যা ললাটে আরাম ভোগের কক্ষে শূন্য অঙ্ক লেখা আছে, সে কি ঋণ কোরে আরাম ভোগ কোর্‌বে? আরাম বিরামের রাজ্যে দেনা পাওনার কারবার থাক্‌লে অনেক রাজা রাজড়া অতি উচ্চ দাম দিয়ে এই জিনিসকে কিনতেন; কিন্তু ভগবানের মর্জ্জি অন্য রকম।" বাস্তবিক অদৃষ্ট জিনিষটা বড়ই খারাপ, শুধু ইহলোক নয়—পরলোকের পার পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে ছোটে এবং তার জন্যে কোন মুটে বা কুলীর আয়োজন কোর্ত্তে হয় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ভায়া বোল্লেন,—'উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একজন লোকের কাকচরিত্র বিদ্যায় খানিকটা অভিজ্ঞতা ছিল। লোকটা একদিন শ্মশানের কাছ দিয়ে যেতে যেতে দেখ্‌লে, একটা অনেকদিনের পুরাণো মড়ার মাথা পোড়ে রয়েছে।

সেই নর-কপালের সাদা সাদা অক্ষর গুলোর উপর লোকটার নজর পোড়লো ;—কাকচরিত্র বিদ্যাবলে সে পোড়লে—

"ভোজনং যত্র তত্রাপি শয়নং হট্টমন্দিরে,
মরণং গোমতীতীরে অপরং বা কিং ভবিষ্যতি।"

লোকটা শুধু কাকচরিত্রই যে জান্‌তো তা নয়, একটু বুদ্ধিবৃত্তিরও ধার ধারতো। "অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি" পোড়ে তার মনে কৌতূহল হোলো, এর পরে আর কি হয় জান্‌তে হবে। মরে গিয়েছে, শ্মশানে মাথার খুলিটে শুধু পোড়ে রয়েছে, এখনো 'অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি ?" পণ্ডিত মড়ার মাথাটা কুড়িয়ে বাড়ী এনে তা একটা হাঁড়িতে পূরে একটা নির্জ্জন স্থানে টাঙ্গিয়ে রাখ্‌লে। আরও নূতন কিছু হলো কি না পরীক্ষার জন্যে প্রায়ই হাঁড়ির মুখ খুলে দেখে। একদিন পণ্ডিত কার্য্যোপলক্ষে দু চার-দিনের জন্যে বিদেশ যাত্রা কোর্‌লে পর কৌতূহলাবিষ্টা পণ্ডিতপত্নী সেই হাঁড়ির মুখ খুলে দেখ্‌লেন একটা নরকপাল তার মধ্যে পরম সমাদরে রক্ষিত হোয়েছে। পণ্ডিতের যিনি সহধর্ম্মিণী তাঁর পক্ষে এই নরকপাল দেখে তার প্রকৃত তথ্য অনুমান কোরে নেওয়া অবশ্য নিতান্ত সহজ ব্যাপার হবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত কোল্লেন, আর কিছু নয়, পণ্ডিতজীর বোধ হয় কোন প্রিয়তমা ছিল ; তার মৃত্যু হওয়াতে বিরহক্লিষ্ট পণ্ডিতবর তার মস্তকটি কুড়িয়ে এনে এইরূপে সঙ্গোপনে হাঁড়ির মধ্যে রেখে দিয়েছেন, এবং মধ্যে মধ্যে এই কঙ্কালাবশেষখানি দেখেই দুঃসহ বিরহ-জ্বালা প্রশমন করেন। পণ্ডিত-পত্নীর দুর্জ্জয় ক্রোধ এবং অভিমানের উদয় হোলো। পণ্ডিত সশরীরে সেখানে বর্ত্তমান থাক্‌লে বোধ হয় তিনি সম্মুখ যুদ্ধে আহূত হোতেন। সে বিষয়ে আপাততঃ কিঞ্চিৎ বিলম্ব দেখে পণ্ডিত-পত্নী সেই নরকপালখানি হাঁড়ি থেকে বের কোরে ঢেঁকিতে চূর্ণ কোরে, একটা পচা নর্দ্দামার মধ্যে নিক্ষেপ কোল্লেন। পণ্ডিত গৃহে ফিরে সর্ব্বপ্রথমেই হাঁড়ি দেখ্‌তে গিয়ে দেখেন হাঁড়িও নেই কঙ্কালও নেই।

ব্যস্ত সমস্ত হোয়ে গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, হাঁড়ি কোথায় ? পত্নী পণ্ডিত মহাশয়কে বিরহ-ব্যথায় অত্যধিক ব্যাকুল করবার অভিপ্রায়ে সমস্ত কথা সবিস্তারে বোলে তার প্রিয়তমার কপালের দুরবস্থা দেখাইবার জন্যে নর্দ্দামার কাছে হাত ধোরে নিয়ে গেলেন। পণ্ডিতের কিন্তু চক্ষু স্থির !— "অপরং বা কিং ভবিষ্যতি" এই রকম ভাবে ফলবে তা কে জান্‌তো ?

বৈদান্তিক বোল্লেন, মরণের পরও যখন অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, তখন আমার সুখভোগের আশাটা অলীক মাত্র। বৈদান্তিকের আর কোন ক্ষমতা না থাক, তিনি মনটকে বেশ দমিয়ে দিতে পারেন ; কিন্তু আমার তাতে বিশেষ বড় আসে যায় না।

গল্প কোর্ত্তে কোর্ত্তে রাস্তায় বেরিয়ে পড়া গেল। উপক্রমণিকাতেই স্বামীজি আমাকে খুব ধীরে চলবার জন্যে অনুমতি কোল্লেন এবং আজ যদি তাড়াতাড়ি চলি, তা হোলে আমার অসুখ হোতে পারে বোলে ভবিষ্যংবাণী কোর্ত্তেও ছাড়লেন না ; কিন্তু তাঁর এ রকমের সাবধানতা এ নূতন নয়, কাজেই আমার কাছে তার তেমন দর হলো না।

আমরা খানিক দূর অগ্রসর হোয়ে একটা কাঠের সাঁকো দিয়ে অলকানন্দা পার হোলুম। সাঁকোটার উপর দিয়ে যেতে বড়ই ভয় কোর্ত্তে লাগলো। ইংরেজের তৈয়েরী লোহার সাঁকোর উপর দিয়ে বেশ সগর্ব্বে চলে যাওয়া যায় ; কিন্তু পাহাড়ী কারিগরদের তৈয়েরী এই কাঠের সাঁকোর কাছে এসে আমার সে কালের লছমনঝোলার কথা মনে পড়লো। বাস্তবিক এমন খারাপ সাঁকো আমি এ পর্য্যন্ত একটাও দেখি নি। যাহোক অতি সাবধানে ত সাঁকোটা পার হওয়া গেল। খানিক দূর এগিয়ে যখন পেছন ফিরে চাইলুম তখন সঙ্গীদের কাকেও দেখ্‌তে পেলুম না। এই বাঁকা রাস্তায় ৫০ হাত এগিয়ে এলে আর কাকেও বড় দেখবার যো নেই।

সাঁকো পার হোয়ে রাস্তার ভীষণতা বুঝ্‌তে পাল্লুম। এ পর্য্যন্ত

অনেক "চড়াই উৎরাই" দেখেছি, কিন্তু এমন "চড়াই উৎরাই" আর কোন দিন নজরে পড়ে নি। বরাবর শুধু চড়াই আর উৎরাই। বহুকষ্টে আধ মাইল চড়াই উঠলুম; ওঠা যেই শেষ হলো, অমনি আবার উৎরাই আরম্ভ; আবার যেই উৎরাই শেষ হলো অমনি চড়াই আরম্ভ। নাগর-দোলার মত কেবল চড়াই আর উৎরাই। সমান জমি কি সামান্য উচু নীচু রাস্তা মোটেই নেই; এই রকম তিন চারটে চড়াই উৎরাই পার হোলেই মানুষের জীবাত্মা ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়ে। আমি কতবার ক্রমাগত সাত আট মাইল চড়াই উঠেছি, কিন্তু কখন এত কষ্ট হয় নি। একবার উঠা তার পরেই নামা, এতে যে কি কষ্ট তা বুঝান সহজ নয়। বুকের হাড় ও পাঁজরাগুলো যেন চড় চড় কোরে ভেঙ্গে যায়; তার সঙ্গে সঙ্গে আবার সর্ব্বনেশে তৃষ্ণা; এই মাত্র ঝরণার জল খাওয়া গেল, পরক্ষণেই মুখ নীরস, গলা শুক্‌নো, যেন কতকাল জল খাওয়া হয় নি; বুকের মধ্যে কে যেন মরুভূমি সৃষ্টি কোরে রেখেছে। তবে সুখের মধ্যে এই পথে যত ঝরণা, এত ঝরণা আর এ পাহাড় রাজ্যের কুত্রাপি দেখি নি; আর এত ঝরণা আছে বলেই এ পথে মানুষ চলাচল কোর্‌তে পারে।

রাস্তায় চোল্‌তে আরম্ভ কোরে গন্তব্য স্থানে না পৌঁছিয়ে আর আমি কখন বিশ্রাম করিনে; কিন্তু এই ভয়ানক পথে এ রকম জিদ বজায় থাকলো না। চলি আর বসি এবং ঝরণা দেখ্‌লেই সেখানে গিয়ে অঞ্জলি পূরে জল খাই। রাস্তায় চার পাঁচবার বিশ্রাম কোরে এবং দশ বারো বার জল খেয়ে শরীরের সঙ্গে শক্তির সঙ্গে, আর এই বিষম পথের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ কোরতে কোরতে আট মাইল দূর পাণ্ডুকেশ্বরে উপস্থিত হোলুম। বেলা তখন প্রায় ৯টা। এতখানি রাস্তা আমি তিন ঘণ্টায় এসেছি। শুনলুম, যে সকল সন্ন্যাসী পাহাড় ভ্রমণে অত্যন্ত অভ্যস্ত তাঁহারাও পাঁচ ছয় ঘণ্টার কম বিষ্ণুপ্রয়াগ হোতে পাণ্ডুকেশ্বরে আস্‌তে

পারেন না। খুব অল্প সংখ্যক পাহাড়ী জোয়ানেরাই তিন ঘণ্টায় এ রাস্তা হাঁটতে পারে। আজ এই ভয়ানক দুর্গম রাস্তা অতিক্রম কোর্ত্তে একজন দুর্ব্বল বঙ্গ-সন্তান, প্রবল বিক্রম, বলিষ্ঠ দেহ, পাহাড়ীর সমকক্ষ হয়ে উঠেছে মনে কোরে অহঙ্কারে আমার বুকখানা দশ হাত হোয়ে উঠ্‌লো এবং নিজেকে অদ্বিতীয় বঙ্গবীর স্থির কোরে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ ভোগ করা গেল। কিন্তু হায়, সকলে আমার মত বঙ্গবীর নয়ঃ বঙ্গভূমির মুখ উজ্জলও সকলের দ্বারা সম্ভব নয়; আমি অমিত পরাক্রমে তিন ঘণ্টায় বিষ্ণুপ্রয়াগ হোতে পাণ্ডুকেশ্বরে এলুম বটে, কিন্তু স্বামীজি ও বৈদান্তিক কারো দেখা নেই; এ বেলা যে তাঁরা আসতে পারেন সে বিষয়েও আমার সন্দেহ হোল। তাঁরা দেখ্‌ছি বাঙ্গালীর নাম রাখ্‌তে পাল্লেন না।

কি করা যায়; পাণ্ডুকেশ্বরে এসে একটু ঘুরে বেড়ান্ গেল। প্রথমেই পাণ্ডুকেশ্বরের নাম-রহস্য জানবার জন্য কৌতূহল হোলো। শুনলুম, এখানে মহারাজ পাণ্ডু দীর্ঘকাল যাবৎ তপস্যা কোরেছিলেন, তাই এস্থানের নাম "পাণ্ডুকেশ্বর"। এখানে একটা খুব প্রাচীন মন্দির দেখ্‌তে পেলুম। বদরিকাশ্রমের রাস্তায় এ পর্য্যন্ত যতগুলি মন্দির দেখেছি, তার মধ্যে দুটির মত প্রাচীন মন্দির আর আমার নজরে পড়ে নি, একটি হৃষীকেশে, আর একটি এই পাণ্ডুকেশ্বরে। অনেক কালের পুরাণো বোলে মন্দিরটার খানিক অংশ মাটীর মধ্যে বোসে গিয়েছে। মন্দিরের পাশে ছোট ছোট চার পাঁচটা পাথরের কোটা বাড়ী আছে, সেগুলিরও জীর্ণ অবস্থা; নানা রকমের গাছ পালা তাদের মাথার উপর সগর্ব্বে দাঁড়িয়ে রোয়েছে। গাছগুলোই কি অল্প দিনের? তাদের মোটা মোটা শিকড়গুলি পাথরের মধ্যে প্রবেশ কোর্ত্তে কত কাল লেগেছে! এই সকল মন্দিরের সংস্কারের কোন সম্ভাবনা নেই, আর বিশ পঁচিশ বছর পরে সমস্ত ভেঙ্গে পোড়ে যাবে, এবং এগুলি কি ছিল তা জান-

বার পর্য্যন্ত উপায় থাকবে না। এ রকম ভাঙ্গা স্তূপ আমরা এ পর্য্যন্ত কত দেখেছি; সেগুলি উদাসীন চোখের সাম্‌নে দুদণ্ডের বেশী স্থায়িত্ব লাভ করে নি; কিন্তু এককালে সে সকল স্তূপ যে কত গৌরব, কত পবিত্রতা এবং মহিমার অখণ্ড বাসস্থান ছিল, তা ভাব্‌লে মনের মধ্যে একটা সঙ্কোচপূর্ণ ভক্তির আবির্ভাব হয়। মনে হয় জীবন ও মৃত্যু শুধু জীব জগৎকেই যে আচ্ছন্ন কোরে আছে তা নয়, এই জড় জগতের বহু দ্রব্যও জীবিতের ন্যায় উচ্চ সম্মান এবং প্রবল খ্যাতি লাভ করে; কিন্তু কালক্রমে তাদের মৃত্যু হোলে, তখন তাদের মান সম্ভ্রম, খ্যাতি প্রতিপত্তি সমস্তই শৈবালাচ্ছাদিত ইষ্টক বা প্রস্তর স্তূপের নিম্নে সমাহিত হোয়ে যায় এবং দর্শকগণ কদাচিৎ তাদের দিকে একবার চক্ষু ফিরিয়ে অতীত গৌরবের কথা চিন্তা করে।

পাণ্ডুকেশ্বরের বাজারটী নিতান্ত ছোট নয়; কিন্তু যদি বার মাস এখানে লোক বাস কোরতে পারতো, তা হোলে বাজারটি আরও ভাল হোতো। গ্রীষ্মের চার পাঁচ মাস কেবল এখানে বসবাস কোর্ত্তে পারে, দোকানেও কেবল সেই কয় মাস খরিদ বিক্রী হয়। শীত পড়্‌তে আরম্ভ হোলে দোকানী পসারী এবং বাসিন্দা লোকজন বিষ্ণুপ্রয়াগ যোশীমঠ প্রভৃতি স্থানে উঠে যায়; গ্রীষ্মের প্রারম্ভে আবার সকলে ফেরে এসে নিজ নিজ আড্ডা দখল কোরে বসে। এতদিন এ স্থানটা জনসমাগম-শূন্য ছিল, আজ কয়েক দিন হোতে আবার লোক জুট্‌তে আরম্ভ হোয়েছে। কারণ এখানে গ্রীষ্মের সূত্রপাত মাত্র। গ্রীষ্মের সূত্রপাত শুনে পাঠক মনে কোর্‌বেন না, আমাদের দেশে ফাল্গুন মাসের শেষে যে অবস্থা হয় এখানেও সেই রকম। মাঘমাসের শীতের তিন গুণ শীত কল্পনা কোরে নিলে এ শীতের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু শীতকালের অবস্থা আমরা কিছুতেই কল্পনা কোরে উঠ্‌তে পারিনে—তা আমাদের কল্পনাশক্তি যতই প্রবল হোক্। এখন বরফ গল্‌ছে, আর

সহরগুলি বরফের মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হোচ্ছে। এ দৃশ্য বড়ই সুন্দর। শীতকালে সমস্ত বরফে ঢাকা থাকে। একটা স্থান দেখ্‌লুম, সমস্ত বরফে ঢাকা, একদিন পরেই দেখা গেল বরফ গোলে গোলে তার মধ্য হোতে একটা দীর্ঘচূড় প্রকাণ্ড মন্দির বের হোয়ে পড়েছে; হঠাৎ এই রকম পরিবর্ত্তন দেখ্‌লে মনে ভারি আনন্দ হয়। আমি চোল্‌তে চোল্‌তে দেখ্‌চি সহরের অনেক স্থান এবং অনেক পথ এখনো বরফে ঢাকা রয়েছে; স্থানে স্থানে বা বরফ গোল্‌ছে আর তার ভিতর থেকে ঘাস বেরিয়ে পড়ছে; চারিদিক্ সাদা, মধ্যে মধ্যে নবীন তৃণ মাথা তুলে দিয়ে চারিদিকের তুষার-ধবল স্তূপের মধ্যে অনেকখানি নূতনত্ব বিস্তার কোরছে।

ঘূরে ঘূরে একটা দোকান ঘরে এসে বোসলুম। দশটা বেজে গিয়েছে; এখনও সঙ্গীদের দেখা নেই; এই অপরিচিত জন-বিরল স্থানে একা বড়ই কষ্ট বোধ হোতে লাগ্‌লো; সঙ্গীদের জন্যও ভাবনা হোতে লাগ্‌লো।

ক্রমে যত বেলা বাড়তে লাগ্‌লো, ততই শরীরের মধ্যে গরম বোধ কোর্ত্তে লাগ্‌লুম। বোধ হোতে লাগ্‌লো যেন শরীরের মধ্য দিয়ে আগুন ছুটে বেরোচ্ছে; আমি আর বোসে থাক্‌তে পাল্লুম না, কম্বল মুড়ি দিয়ে সেই দোকানেই শুয়ে পড়লুম! ক্রমে এমন মাথা ধোর্‌লো যে তা আর বল্‌বার নয়; মনে হোলো মাথার মধ্যে কে ক্রমাগত হাতুড়ীর বাড়ি মার্‌ছে। চোক দুটি ছুটে বের হবার উপক্রম হোলো এবং বুকের মধ্যে এমন যন্ত্রণা যে শ্বাসরোধের আশঙ্কা হোতে লাগ্‌লো। স্থির হোয়ে থাক্‌তে পাল্লুম না, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ কোর্ত্তে লাগ্‌লুম। শুয়ে থাকি তাতেও কষ্ট, উঠে বসি তারও উপায় নেই; তার উপর এমন জায়গায় এসে পোড়েছি যে, আমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে এ রকম লোকও একটী নেই! যে দোকানে পোড়ে রয়েছি, সে দোকানদার

এখনও নীচে হোতে এসে পৌঁছে নি। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, অদূরে ঝরণা, কিন্তু সাধ্য নেই উঠে গিয়ে একটু জল খেয়ে আসি। অল্পক্ষণ পরে বমি আরম্ভ হোলো, সঙ্গে সঙ্গে পিপাসারও বৃদ্ধি হলো। এই দারুণ পথে বেড়াতে বেড়াতে অনেকবারই আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছি, কিন্তু মনে হলো যেন আজ আর অব্যাহতি নেই। এই মহাপ্রস্থানের পথে একটা ব্যর্থজীবন তার অলস মধ্যাহ্নেই কি আয়ুর শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হলো। হায়, আজ সকালেও জানতুম না এই নির্জ্জন স্থানে, সঙ্গীহীন অবস্থায় এ রকম ভাবে প্রাণবিয়োগ হবে! শারীরিক যাতনার সঙ্গে এইরূপ মানসিক চিন্তার উদয় হওয়ায় প্রাণ আরো ছট্ ফট্ কোর্ত্তে লাগ্‌লো। মৃত্যুভয়ে যে বেশী কাতর হোয়েছিলুম এমনও বল্‌তে পারিনে। দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি, যন্ত্রণা কিসের অভাব আছে, যার জন্যে মৃত্যুর শান্তি এবং নিরুদ্বেগ তুচ্ছজ্ঞান কোর্‌বো? তবে এত যন্ত্রণাতেও যে বেঁচে থাক্‌তে ইচ্ছা হোচ্ছিল, এটাও অস্বীকার কোর্‌তে পার্‌ছিনে। আসল কথা, আমাদের জীবনের প্রতিদিনের এই অভ্যস্ত স্রোত এবং সুখ দুঃখ হাসি কান্নার চক্রের মধ্যে হঠাৎ যে, অজ্ঞাত, পরীক্ষাতীত, রহস্যসঙ্কুল ঘটনার নূতনত্ব এসে সমস্ত গোল কোরে দেবে এবং বর্ত্তমানের সমাপ্তি হোয়ে যাবে, এ দেখ্‌তে আমরা রাজী নই; তাই হাজার দুঃখেও আমরা মৃত্যু চাইনে। কে জানে মৃত্যুর পর আমাদের প্রাণ বর্ত্তমানের আকাঙ্ক্ষা, অভাব ও কষ্টের প্রাবল্যকেই কত সুমধুর বোলে পুনর্ব্বার তা পাবার জন্যে আগ্রহ করে কি না?

বেলা যখন দ্বিপ্রহর হোয়ে গেছে, তখন আমার সঙ্গীদ্বয় এসে পৌঁছুলেন। তাঁরা পথশ্রমে দুই জনে মরার মত হোয়ে এসেছিলেন, কিন্তু আমার অবস্থা দেখে তাঁরা নিজের কষ্ট ভুলে অবাক্ হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার পরেই স্বামীজী ব্যস্ত সমস্ত হোয়ে আমাকে কোলে

তুলে বাতাস কোর্ত্তে লাগ্‌লেন এবং ব্যাকুল ভাবে আমাকে কত স্নেহের ভর্ৎসনা কোর্লেন! অচ্যুত ভায়া আমার সর্ব্বশরীরে হাত বুলাতে লাগ-লেন। আমার মাথাটা যাতে একটু ভাল থাকে, এজন্যে সহস্র চেষ্টা হোতে লাগ্‌লো। আমার আরোগ্যের জন্যে এঁদের দুজনের প্রাণের সমগ্র আগ্রহ এবং হৃদয়ের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হোলো; কিন্তু তাঁদের চেষ্টার ফল হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। আমি অবশেষে অবসন্ন হোয়ে পড়লুম; নিরুপায় দেখে স্বামীজি ও অচ্যুত ভায়া একজন লোককে জল গরম কোর্‌তে অনুমতি দিলেন। সে ক্রমাগত জল গরম কোরে আমার পায়ে ঢাল্‌তে লাগলো। জলই কি শীঘ্র গরম হয়? অনেক চেষ্টাতে জল খানিকটে গরম হোলো, টগ্‌বগ্‌ কোরে ফুট্‌চে, হুহু কোরে তাপ উঠ্‌ছে; উনোন হতে নামিয়ে যেমনি পায়ে ঢালা অমনি ঠাণ্ডা; আমাদের দেশে শীতকালে কলসীর জল যে রকম ঠাণ্ডা হয় সেই রকম। অনেকক্ষণ এই রকম জল ঢাল্‌তে ঢাল্‌তে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হোলো। তখন তাঁরা আমাকে ধরাধরি কোরে চারিদিকে বন্ধ একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে শোয়ালেন। ক্রমে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম।

শেষ বেলা জেগে উঠে দেখি, অচ্যুতানন্দ ও স্বামীজি আমার পাশে বসে আছেন, আর আমার সম্মুখে একখানি আসনে একজন গায়ে জামা-জোড়া, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি ভদ্রলোক ঘরখানা জমকে নিয়ে বোসে রয়েছেন। লোকটির চেহারা দেখেই একজন বড় লোক বলে বোধ হোলো! হঠাৎ এখানে তাঁর কি রকমে আবির্ভাব হোলো ভেবে আমি একটু আশ্চর্য্য হোয়ে গেলুম! এদিকে ওদিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, তাঁর সঙ্গে অন্য দুই চারজন লোকও আছে। এঁদের পরিচয় জানবার জন্য আমার ভারী কৌতূহল হোলো। আমার কিন্তু ক্ষুধার প্রবৃত্তিটা আরো প্রবল হোয়ে ওঠায়, আগে ভাগে আহারের চেষ্টাতেই প্রবৃত্ত হোতে হোলো।

আমি নিদ্রিত হোলে স্বামীজি ও অচ্যুতভায়া রুটি তৈয়েরী কোরে নিজেরা খেয়ে আমার জন্যে কতক ভাগ রেখে দিয়েছিলেন, আমি উঠে বসে পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে সেগুলি উদরস্থ কোল্লুম। আহারান্তে এক লোটা জল খেয়েই সমস্ত ক্লান্তি ও পরিশ্রম যেন দূর হোয়ে গেল।

একটু সুস্থ হোয়ে এই অভ্যাগত ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ কোল্লুম; এঁর নাম পণ্ডিত কাশীনাথ জ্যোতিষী, জন্মস্থান গুজরাট্; সম্প্রতি কলিকাতা হোতে আসছেন। কলিকাতায় ইনি মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের বাড়ীতে বাস করেন। শুনলুম মহারাজ বাহাদুর এঁকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। বাঙ্গালা দেশের কোন সংবাদই অনেকদিন পাইনি, জ্যোতিষী মহাশয়ের সঙ্গে বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে অনেক কথা হোলো; তিনি কলিকাতার অনেক বড় বড় ঘরের কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন; দেখলুম লোকটি শুধু জ্যোতিষের রহস্য পর্য্যালোচনাতেই যে সময় ক্ষেপ করেন তা নয়, রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর স্বাধীন মতামতের পরিচয় পাওয়া গেল; আর বাস্তবিক এতে আশ্চর্য্য হবার বিশেষ কিছু নেই। লোকতত্ত্বে যাঁদের অসাধারণ কৃতিত্ব আছে—রাজনীতি,সমাজনীতি তাঁদের সহজে বোঝাই সম্ভব।

এতক্ষণ পরে জ্যোতিষী মহাশয় নিজের কথা পাড়্‌লেন। কলিকাতার ধনকুবের এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কার কি রকম অদৃষ্ট গণনা কোরেছেন, কার কি কি ফলেছে এবং কে তাঁকে কি রকম শ্রদ্ধা ভক্তি করেন, সেই সকল কথা পুনঃ পুনঃ বোলতে লাগ্‌লেন। নিজমুখে যদি কাকেও আত্মপ্রশংসা কোর্‌তে শোনা যায়—তবে সে হাজার ভাল লোকের মুখে হোলেও ভাল লাগে না। জ্যোতিষী মহাশয় খুব বিজ্ঞ,বিচক্ষণ,ধার্ম্মিকলোক হোতে পারেন, কিন্তু তাঁর এইরূপ আত্মপ্রশংসায় আমি অতি কষ্টে ধৈর্য্য রক্ষা কোর্‌তে পেরেছিলুম, বিশেষ এই অসুস্থ শরীরে। যা হউক আমার এই ধৈর্য্যাতিশয্যে জ্যোতিষী মহাশয়ের উৎসাহ বা সাহস বোধ হয় বেড়ে

গেল, হয় ত এমন নির্ব্বিবাদ শ্রোতা বহুদিন তাঁর ভাগ্যে জোটে নি! তিনি একজন ভৃত্যকে ডেকে তাঁর বাক্স আন্‌তে বল্‌লেন। বাক্স আনা হোলে তিনি তার মধ্য হ'তে কতকগুলি খাতা পত্র বের কর্‌লেন। আমার বড়ই আশঙ্কা উপস্থিত হোলো; বিবেচনা কোল্লুম এখনি বা আমার অদৃষ্টই গণনা কোরে আমার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব নখদর্পণে দেখিয়ে দেন। আমার ভবিষ্যৎ জানবার জন্যে কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না; জানি সেখানে আমার জন্যে অনেক দুঃখ জমান আছে, আলাদা আলাদা কোরে ফর্দ্দ মাফিক সে সমস্ত দুঃখ জেনে আর কি ফল হবে?—মনে মনে এই রকম তর্ক কর্‌চি, এমন সময় জ্যোতিষী মহাশয় আমার হাতে কতকগুলি কাগজ পত্র দান কোল্লেন। ও হরি, এ গুলো জ্যোতিষের কোন পুঁথি নয়,—ইংরেজী পারসীতে লেখা কতকগুলি প্রশংসাপত্র। সে সমস্ত আমার দেখ্‌বার কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না এবং সে জন্যে আমার মনে একটুও কৌতূহলের উদ্রেক হয় নি; কিন্তু জ্যোতিষী মহাশয় ছাড়বার পাত্র নন, ইংরেজীগুলো পোড়ে তাঁকে তার অর্থ বোঝাবার জন্যে আমাকে অনুরোধ কোল্লেন, এবং আমি পারসী জানিনে বোলে দুঃখ কোরে, তিনিই পারসী প্রশংসাপত্রগুলি পোড়ে আমাকে তার অর্থ বোঝাতে লাগলেন। পড়ার ভঙ্গিমাই বা কি! আমি বলি আমার অর্থ বোঝবার দরকার নেই, কিন্তু তিনি যদি কিছুতে ছাড়েন! দেখ্‌লুম ভারতবর্ষের বহু প্রদেশ হোতে তিনি প্রশংসাপত্র পেয়েছেন, এবং সকল প্রশংসাপত্রেই তাঁর প্রধান জ্যোতিষী বোলে খ্যাতি আছে। দেশে মহারাষ্ট্রাদের প্রদত্ত অনেক জায়গীর আছে; তা হোতে জ্যোতিষীজির প্রচুর অর্থাগম হয়। ইনি নিজের অর্থে তীর্থ পর্য্যটনে এসেছেন। যেখানে যান সেখানে অনেক অতিথি সেবা করান; সঙ্গে অনেক সাধু সন্ন্যাসী ও চাকর বাকর আছে। এই দুরারোহ পাহাড় কি হেঁটে পার হওয়া যায়?—তাই পাহাড়ীদের কাঁধে চোড়ে তীর্থ ভ্রমণ কোর্‌চেন, ইত্যাদি নানা কথা বোল্‌তে লাগ্‌লেন। লোকটার লেখা পড়াও জানা

আছে; কিন্তু নিজের গরিমা, বিদ্যার গরিমা, দা[illegible]রিমা, মানসম্ভ্রমের গরিমা প্রকাশ করবার জন্যে লোকটা মহাব্যস্ত। [illegible]আশ্চর্য্য মনে হয় যে, এই রকম গরিমা প্রকাশ করাটা নিতান্তই অনুচিত কাজ, এবং এতে মানুষের কাছে বরঞ্চ আরো লঘু হোয়ে পড়তে হয়, এতটুকু সাধারণ জ্ঞানও কেন এঁদের নেই? যাহা হউক সুবিধার বিষয় এই, যাঁরা ঐরূপ প্রশংসা-প্রিয় তাঁদের খোসামোদের দ্বারা সময়ে ঢের কাজ বাগান যায়। এই প্রসঙ্গে আমার একটী বন্ধুর কথা মনে পোড়েছে। বন্ধুটী কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত লোক, তাঁর অর্থ অনেক। কিন্তু আমাদের ন্যায় বন্ধুগণের ভোজে সে অর্থের সংব্যয় কদাচিৎ মাত্র হোয়ে থাকে। আমরা একদিন তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করায় তাঁর ভ্রাতা একটা খুব বড় রকমের মাছ এনে একটু ভাল রকম খাওয়ার আয়োজন করেন। বন্ধুটী ভ্রাতার এই কার্য্যে একেবারে খড়্গহস্ত; রাগে কত কথাই বোল্লেন, "একালের ছোঁড়াগুলা কর্ত্তাব্যক্তিদের গ্রাহ্যই কোর্ত্তে চায় না, (তাঁর অনুমতি না নিয়ে মাছ আনা হোয়েছিল তাই বোধ করি এ কথা), আবার এ কালের ছেলেগুলো ভারি অমিতব্যয়ী, বাজে পয়সা খরচ না কোল্লে এদের হাত যেন শুড় শুড় করে" (২৷০ সিকি দিয়ে মাছ কেনা হোয়েছে সে কি সহ্য হয়?)। আহারান্তে বোল্‌লেন "ছেলেগুলো ইংরেজী শিখে দেশটা উচ্ছন্ন দিলে" (নিজে ইংরেজী জানেন না)। এই ঘটনার পরদিন আমি আর উল্লিখিত মিতব্যয়ী বন্ধু এই দুজনে বেলা আটটার সময় ট্রামে চেপে চৌরঙ্গীর দিক হতে ফিরে আসচি। জোড়া-সাঁকোর কাছে এসে আমাদের খাওয়া দাওয়ার গল্প আরম্ভ হোলো। আমি বল্লুম "আগে আগে কল্‌কাতায় এসে ভাল খাওয়া পাওয়া যেতো, এখন সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। যারা খাওয়াবে তারা সকলেই এখন কলিকাতা ছাড়া, তবু যে মধ্যে মধ্যে এখানে এলে ভাল খাওয়া যায়, সে কেবল এক তোমার জন্যে, তুমি ত আর কিছু বন্ধুবান্ধবকে খারাপ খাওয়াতে পার না; এজন্যে পয়সা ব্যয় কর্‌তেও তোমার আপত্তি নেই।

নিজেই ভাল জিনিস সন্ধান কোরে খাওয়া দাওয়ার উদ্যোগ করা এ গুণটী তোমার যেমন, আর কারো সে রকম দেখ্‌তে পাইনে।" বন্ধু যেন স্বর্গ হাতে পেলেন; অমনি তাঁর মুখ খুলে গেল, আমার হাত দুটি ধোরে সবিনয়ে বোল্লেন, "দেখ ভাই, তোমাদের খাওয়ানের জন্যে আমার বড়ই আগ্রহ হয়। এক সঙ্গে যে পাঁচ দিন আমোদে কাটান যায়, সেও পরম সুখের কথা। টাকা কড়ি আর ত সঙ্গে যাবে না, কিন্তু এ কথা বোঝে ক'জন?"—দেখ্‌তে দেখ্‌তে ট্রাম গাড়ি ঘড় ঘড় শব্দে নূতন বাজারে এসে পড়লো। বন্ধুবর চীৎকার কোরে বল্লেন, "বাঁধো"? গাড়ি না বাঁধ্‌লে ভায়া নামতে পারতেন না, সুতরাং তাঁর নামবার আবশ্যক হোলে তার জন্যে অনেকখানি আয়োজন কোর্ত্তে হোতো। অনেক সোর গোল কোরে তিনি নেমে পড়লেন; তারপর আমার হাত ধোরে টানাটানি। আমি বল্লুম "নাম্‌তে হবে শোভাবাজারের মোড়ে, এখানে হঠাৎ তোমার কি কাজ পোড়ে গেল? ভায়া কোন দিকে কাণ না দিয়ে আমার হাত ধোরে বাজারের ভিতর প্রবেশ কল্লেন, এবং খেজুরগাছের মাথার মত মাথাওয়ালা এক ডজন গল্লাচিংড়ি, দুর্ম্মূল্য ফুলকপি এবং কড়াইশুঁটী প্রভৃতিতে তিন টাকার বাজার নিয়ে বাসার দিকে চল্লেন। শুধু আমি অবাক্ নই, বাসায় উপস্থিত হোলে সকলেই অবাক্ হোয়ে গেলেন! রাত্রে মহাধূমে পোলাও কালিয়ার বন্দোবস্ত হলো। সেদিন দাদার মিতব্যয়িতার পরিচয় পেয়ে অমিতব্যয়ী ছোট ভাইটী যে সকল স্বগত উক্তি কোরেছিল, তা প্রকাশ্যে বল্লে বোধ হয় আমোদ আর একটু বেশী হোতো। যাহোক ইংরাজী না শিখ্‌লে দেশ কি রকম কোরে উদ্ধার হয়, রাত্রে দাদার কাছে সে তার অতি সুন্দর পরিচয় পেয়েছিল। সেই অনেক দিনের পুরাণো কথা আজ খুলে লিখলুম, এখন বন্ধুবিচ্ছেদ না হোলে বাঁচি।

যা হোক শতশত প্রশংসা-পত্র দেখিয়েও জ্যোতিষী মহাশয়ের আশ মিটলো না। শেষে বাক্সের ভিতর হোতে দু তিন খানা "অমৃতবাজার" বের কোরে আমাকে দুই তিনটে জায়গা পোড়তে দিলেন। পাশে লাল

দাগ দেওয়া-- দেখ্‌লুম, হরিদ্বারে কুম্ভ মেলার সময় ইনি নিজে খরচ পত্র কোরে অনেক গরীব সাধু সন্ন্যাসীকে আহার দিয়েছিলেন ও এতদ্ভিন্ন প্রচুর বস্ত্র অর্থাদিও দান করেছিলেন, এই কথা কে অমৃতবাজারে টেলি-গ্রাম কোরেছে ; ইনি সেই সমস্ত টেলিগ্রাম সংগ্রহ কোরে রেখেছেন।

জ্যোতিষীর কাছে মহারাজ ঠাকুর বাহাদুর ও কুমার বাহাদুরের ফটো দেখ্‌তে পেলুম ; উজ্জ্বল, প্রসন্ন, শান্তিপূর্ণ বদন এবং তাতে পুরুষ সুলভ কাঠিন্যের অভাব দেখে মনে আপনি একটা প্রীতি এবং শ্রদ্ধা ভক্তির ভাব এসে উপস্থিত হোলো। কত দিন স্বদেশ দেখি নি—স্বদেশীর মুখ পর্য্যন্ত যেন ভুলে গিয়েছি। আজ এই ছবি দুখানি দেখে ভারি আনন্দ লাভ কোল্লুম। এই প্রবাসের মধ্যে বোধ হোলো এঁরা আমার পরম আত্মীয়। কোথায় মহৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত রাজপরিবার, আর কোথায় সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ; আমি কিন্তু আমাদের মধ্যে এই গভীর ব্যবধান ভুলে গেলুম। শুনেছি স্বর্গে মানুষে মানুষে ব্যবধান নেই ; এই দ্বারদেশে কি তারই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে ?

সন্ধ্যার সময় একটু বাইরে বেড়াতে গেলুম। সন্ধ্যার বাতাসে এবং স্নিগ্ধ-তার মধ্যে শরীর অনেকটা ভাল বোধ হোলো; আস্তে আস্তে পাণ্ডুকেশ্বর মন্দির এবং আরও গোটাকতক ভাল মন্দির দেখে এলুম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আকাশে মেঘ কোরে এল ; আমরা কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিলুম। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভয়ানক শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হলো, শীতে আমরা আড়ষ্ট হোয়ে পড়লুম—ভাগ্যি আমরা আগেকার সেই দোকান ঘরটা ছেড়ে এসেছি তাই রক্ষা, নতুবা আজ মারা পড়ার আটক ছিল না। যতক্ষণ জেগেছিলুম বৃষ্টি একবারও থামেনি। রাত্রে আর কিছু আহারাদি হোলো না, বেশ আরামের সঙ্গে রাত কাটান গেল। স্বামীজি বোলে-ছিলেন, আগামী কল্যই আমরা বদরিকাশ্রমে পৌঁছুতে পার্‌বো। সেই কথা শুনে পর্য্যন্ত আমার বড় আনন্দ হোয়েছিল ! এত কষ্ট, এত পরিশ্রম,

এত কঠোর উদ্যম কাল সমস্ত সার্থক হবে ! যাঁরা নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক, ভগবানের চিরপ্রসন্নতাই যাঁদের লক্ষ্য, এবং ভক্তিকেই যাঁরা জীবনপথের অমূল্য পাথেয় বোলে ধ্রুব জেনেছেন, তাঁদের শান্তিলাভ অসম্ভব কথা নয়। কিন্তু আমার লক্ষ্য, আমার উদ্দেশ্য যে কিছুই নেই ! বদরিনারায়ণের মধুর সত্তা কি আমার হৃদয়ের দারুণ পিপাসা নিবারণ কোর্ত্তে পারবে ? দেখি যদি সাধুর এই অভীষ্ট মন্দিরে, এই সনাতন ধর্ম্মের পীঠতলে একটু শান্তি, একটু তৃপ্তি যুগান্তব্যাপী মহাত্মার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে ! আশা, উৎসাহে এবং স্বপ্ন-জাগরণে সমস্ত রাত্রি কেটে গেল ।

বদরিকাশ্রমে

২৯ মে শুক্রবার,—মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা ছিল, খুব ভোরে বের হোয়ে পোড়তে হবে, তাই রাত থাকতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখনই আমরা যাত্রার আয়োজন কোরে নিলুম। আজ আমাদের যাত্রার অবসান। আনন্দে, উৎসাহে এবং সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা নিরাশায় হৃদয় পূর্ণ হোয়ে যাচ্ছিল। কোন কবি লিখেছেন, "আশা যার নাই তার কিসের বিষাদ"— আমারও কোন বিষাদ ছিল না, কিন্তু যোগী ঋষিগণ যে সুখের আস্বাদনে বিমুগ্ধ, আমার সে সুখ কোথা ?—আজ হিমালয়ের পাষাণমণ্ডিত স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের শস্যশ্যামল, নদনদী-শোভিত, সমতল মাতৃভূমির দিকে চক্ষু ফিরিয়ে মনে মনে ভাবলুম, "কোথা সুখ, কোথা তুমি ? মাতা বঙ্গভূমি, তোমাকে ত্যাগ কোরে আজ ভূতলে অতুলতীর্থ বদরিকাশ্রমের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে আছি। সুখের সন্ধানেই এতদূর এসেছি ; সুখ নাই মিলুক, শান্তি কৈ ?" হায়, মনে সে পবিত্রতা নেই, চিত্তের সে দৃঢ়তা নেই, প্রাণের সে একাগ্রতা নেই, কিসে হৃদয়ে শান্তি পাব ? এত পরিশ্রম, জীবনের এই কঠোর ব্রত সমস্ত নিষ্ফল হোলো।

আমাদের আগে আগে কয়েকজন সাধু অগ্রসর হোচ্ছিলেন, তাঁদের আনন্দ, তাঁদের প্রাণের উচ্ছ্বাস দেখে আমার হিংসা হোতে লাগ্‌লো। বদরিনারায়ণের উপর পূর্ণ বিশ্বাসে সোৎসাহে তাঁরা অগ্রসর হোচ্চেন, বিশ্বাসরত্ন-অপহৃত হতভাগ্য আমি তাঁদের সেই সুখস্বর্গ-চ্যুত! সত্য বটে জীবনে একদিন এমন সুখ ছিল, যার তুলনায় অন্য সুখ কামনা কোর্ত্তুম না, কিন্তু তা হারিয়েছি বোলেই কক্ষচ্যুত গ্রহের মত দেশে দেশে ঘুরে আজ গিরিরাজ্যে অনন্ত হিমানীর মধ্যে প্রাণের যাতনা বিসর্জ্জন দিতে এসেছি; দেবতায় ভক্তি নেই, চির প্রেমময়ের মঙ্গলময়ত্বেও বিশ্বাস নেই, তবু আশা, যদি প্রাণ শীতল হয়! জানি ধর্ম্মরাজ্যে, প্রেমের রাজ্যে, স্বর্গরাজ্যে 'যদি'র প্রবেশ নিষেধ; তাই আশার মধ্যে নিরাশা, আনন্দের মধ্যেও নিরানন্দ ভাব প্রবেশ কোর্‌তে লাগ্‌লো; তবুও স্বামীজীর আনন্দ, বৈদান্তিকের উৎসাহ এবং অন্যান্য যাত্রীদের প্রফুল্ল মুখ দেখে হৃদয় প্রসন্ন হোয়ে উঠলো, প্রাণের দীনতা ও আশার ক্ষীণতায় এই রকম ধার করা উৎসাহ ও আমোদ ঢেকে খুব স্ফূর্ত্তি কোরে অগ্রসর হোতে লাগ্‌লুম।

আমাদের আগে পিছে আরও যাত্রী যাচ্ছিল; কিন্তু আমরা তিনটিতে একদল। পথে যেতে অনেকগুলি কুঁড়ে ঘর রাস্তার ধারে নজরে পড়লো; এ সকল ঘর পাহাড়ী লোকের বাঁধা, তারা এ সকল জায়গা হোতে কাঠ দুধ প্রভৃতি নিয়ে বদরিনারায়ণে বিক্রী কোরে আসে; এতে তাদের বেশ উপার্জ্জন হয়। পাণ্ডুকেশ্বর ছেড়ে আর এক মাইল উপরে এখনও বাস কর্‌বার যো হয় নি, সমস্ত বরফে ঢাকা। এতদিন দূর হোতেই পর্ব্বতের গায়ে চূড়ায় বরফের স্তূপ দেখে এসেছি, সময়ে সময়ে বরফের ভিতর দিয়ে যেতে হোয়েছে বটে, কিন্তু সে অল্প সময়ের জন্য, এবং তাতে বরফের ভিতর দিয়ে চলার অসুবিধা ভোগ কোরতে হয় নি! আজ দিগন্তবিস্তৃত শ্বেত তুষারের রাজ্য দিয়ে যেতে লাগলুম;

ইতিপূর্ব্বে যে পথ দিয়ে চোলেছিলুম, কিছুদিন আগে যে সকল জায়গা বরফে ঢাকা ছিল, গ্রীষ্মকাল আসায় তা গোলে পথঘাট সব বেরিয়ে পোড়েছে ; কিন্তু এ স্থানটি অনেক উচ্চ, তাই এখানকার বরফ আজও গলে নি। পায়ের নীচে কতক জায়গায় বরফ কর্দ্দমময় হোয়েছে মাত্র। শীতের প্রারম্ভে নারিকেল তৈল যে রকম জমে, অনেকটা সে রকম; কিন্তু খানিক উপর হোতে ঊর্দ্ধতম প্রদেশে যে বরফ আছে, তা জমাট পাষাণ স্তূপের মত। সৃষ্টির শেষ দিন পর্য্যন্ত তা সেই এক ভাবেই থাক্‌বে বোলে বোধ হয়। শীতের সময় বিষ্ণুপ্রয়াগ, কোন কোন বার যোশীমঠ পর্য্যন্ত, বরফের মধ্যে ডুবে থাকে, গ্রীষ্মকালে নীচের বরফ জল হোয়ে নদীস্রোতের বৃদ্ধি করে ; সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির একটা নবজীবন, একটা নূতন মাধুরী পরিস্ফুট হোয়ে উঠে।

পাণ্ডুকেশ্বরের একটু উপরের বরফ এখনও গলেনি, আরও পরে জায়গায় জায়গায় গোলে পথ দেখিয়ে দেবে ; তাতে সমস্ত পথ যে বেশ সুগম হবে তা নয়, তবে এই শ্বেতরাজ্যের মধ্যে পথের একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যাবে। মরুভূমির মধ্যে দিয়ে চোল্‌তে শুনেছি পথভ্রান্ত হোতে হয় ; আমি তেমন নামজাদা মরুভূমির মধ্যে কখন পড়ি নি, কিন্তু এই রকম রাজ্যের মধ্যেও পথহারা হবার সম্ভাবনা কম নয়। যে দিকে তাকান যায় শুধু শাদা, এক রকম বরফ-মণ্ডিত, কোন্ দিক দিয়ে কোথায় পথ গেল একে ত তা ঠিক কোরে নেওয়াই মহাবিপদের কথা, তার উপর এমন অসংলগ্ন পথ যে পদে পদে পথ ভ্রান্তির সম্ভাবনা। অন্য কারও পথের ঠিক থাকে কিনা তা বল্‌তে পারিনে, কিন্তু আমরা তিনটি প্রাণী ত প্রতি মুহূর্ত্তে ভাব্‌তে লাগ্‌লুম, এইবার বুঝি পথ হারিয়েছি। এমন কি অন্যান্য চিন্তা দূর হোয়ে এই দুর্ভাবনাটাই বেশী হোয়ে উঠ্‌লো।

স্বামীজি ও অচ্যুত ভায়া কথাবার্ত্তা চালাতে লাগ্‌লেন। আমার

কিন্তু সেদিকে মন ছিল না। আমি তখন ঘোর চিন্তায় অভিভূত হোয়ে চোল্‌ছিলুম, বরফের এই অভিনব রাজ্যে এসে আমি একেবারে অবাক্‌ হোয়ে গিয়েছি; সঙ্গে সঙ্গে আমার অতীত জীবনের দুই একটি কথা মনে পড়েছিল। শৈশবের সেই কোমল হৃদয়, সরল মন, অকপট বন্ধুত্ব এবং সকলের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভালবাসা, সে কেমন সুন্দর কেমন মোহময় ছিল। তখন আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানি আমার পৃথিবী ছিল; তার প্রত্যেক বৃক্ষপত্র, উন্মুক্ত ক্ষেত্রে ভারাবনত শস্যশীর্ষ এবং দূর প্রবাহিত বায়ু-তরঙ্গের অবিরাম গতি যেন কতই স্নেহ ঢেলে দিত। ক্রমে বড় হোয়ে বিদেশে কলিকাতায় পোড়তে গেলুম, পবিত্রচেতা মধুর-হৃদয় কত সঙ্গী লাভ হলো এবং একখানি প্রেমপূর্ণ নিতান্ত নির্ভরতাপূর্ণ হৃদয় আমার জীবনের সুখ দুঃখের সঙ্গে তার জীবনের সুখ দুঃখ মিশিয়ে নিলে। নয়ন সমক্ষে পৃথিবীর নূতন শোভা দেখ্‌তে পেলুম, এবং তার অভিনব মাধুর্য্য হৃদয় পূর্ণ কোরে দিলে! তখন হৃদয়ে কত বল, মনে কত সাহস, প্রাণে কত বিশ্বাস। মনে হোতো পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা মানুষের এই দুখানি হা[illegible] সুসম্পন্ন কোর্‌তে না পারে। জীবনের সেই পূর্ণবসন্ত কো[illegible]?—বসন্তের জ্যোৎস্নাধৌত রাত্রে আম্রমুকুলের সৌরভে পরিপূর্ণ একটি ক্ষুদ্র উপবন প্রান্তে প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর কোমল মিলন, সেই অভিমান ও আদর, হাসি ও অশ্রু, সে সকল কোথায়? কার্য্যক্ষেত্রে বিপুল পরিশ্রম, লোক-হিতে গভীর একাগ্রতা—সে এখন স্বপ্ন বোলে মনে হয়! ইহজীবনের মধ্যেই যেন একটা বৃহৎ ব্যবধান। তারই এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আজ হা হুতাশ কোচ্ছি! তখন এক দিনও কি কল্পনা কোরেছি আজ যেখানে এসেছি, জীবনে একদিন এমন স্থানে আমার পদধূলি পোড়বে। কিন্তু আজ এই অভিনব প্রদেশে, স্বর্গের শূন্য সোপানতলে পদার্পণ কোরে আমার সুখময় শৈশব ও যৌবনের মধুর স্মৃতি দুদণ্ডের জন্যে মনে

পোড়ে গেল। আমার চিরনির্ব্বাসিত অশান্ত হৃদয় সেই কুসুমকুঞ্জ-বেষ্টিত শান্তিময় আলয়ের কথা ভেবে চঞ্চল হোয়ে উঠ্‌লো; অন্যের অলক্ষিতে দু বিন্দু অশ্রু মুছে গাছপালাবর্জ্জিত দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে তুষারাবৃত অলকনন্দার ধারে ধারে চোল্‌তে লাগ্‌লুম।

পাণ্ডুকেশ্বর ছেড়ে যে সব কুটীর দেখ্‌তে দেখ্‌তে এলুম, সেগুলি বুঝি আমার সুকোমল প্রভাত-জীবনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। বাস্তবিক কুটীরগুলি আনন্দপূর্ণ, প্রকৃত সুখের বাসস্থান; পাহাড়ীরা এখানে সপরিবারে বাস কোচ্ছে। সকালে কেহ কাঠ কাট্‌ছে, কেহ আটি বাঁধ্‌ছে, কেহ রুটি তৈয়েরী কোর্‌তে ব্যস্ত, কেহ বা উদরের তৃপ্তি-সাধনে নিবিষ্টচিত্ত। পাহাড়ী যুবতীরা কেহ গান গাচ্ছে, কেহ ছোট ছোট ছেলে মেয়ের কাছে দাঁড়িয়ে যাত্রীর দল দেখ্‌ছে; সরল, উন্নত-দেহ, প্রফুল্লমুখে কোমল হাসি। যাত্রীর দল দেখে বালিকা, যুবতী, এমন কি নিতান্ত শিশুর দলও "জয় বদরি বিশাল কি জয়!" বোলে আনন্দধ্বনি কোর্‌ছে, এবং যাত্রীদের কাছে এসে কেহ বা একটা পয়সা, কেহ বা কিছু স্চ সূতা চাচ্ছে। দেখলুম এরা অনেকেই স্চ সূতার প্রার্থী; বোধ হয় এই দুটি জিনিষের এরা বেশী ভক্ত। সকল বালক বালিকাই হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ; যুবতিগণের দেহ সবল ও দীর্ঘ। প্রকৃতি যেন নিজ হস্তে অতি সহজ ভাবে সমস্ত অঙ্গের পূর্ণতা সম্পাদন কোরেছেন। বিশেষ তাদের মধ্যে এমন একটা জীবন্ত ভাব দেখ্‌লুম, যা আমাদের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বঙ্গদেশের প্লীহা ও যকৃৎ প্রপীড়িত অন্তঃপুরে কখনই দৃষ্টিগোচর হয় না। বোধ হোলো এদেশে কোন রকম পীড়ার প্রবেশা-ধিকার নেই। এমন যে মলিন বস্ত্র ও ছিন্ন কম্বল পরিহিত ছেলে মেয়ের দল, তবু তাদের গোলাপী আভাযুক্ত সুন্দর মুখ দেখ্‌লে কোলে তুলে নিতে ইচ্ছে হয়। কতবার সতৃষ্ণ নয়নে তাদের মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম। এখানে আর একটু তফাৎ দেখ; দেশে থাকৃতে যখন আমরা

রেলের গাড়ীতে কি নৌকাযোগে কোথাও যেতুম, প্রায়ই দেখা যেত, পথের দু পাশে রাখাল বালকেরা "পাঁচনবাড়ী" তুলে আমাদের শাসাচ্ছে, কখন বা ছোট হাতের মুষ্টি তুলে, কখন কখন বিকট মুখভঙ্গী কোরে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে; কিন্তু এ দেশে চাষার ছেলের সে রকম কোন উপসর্গ দেখা গেল না; ছেলেমেয়েগুলি সকলেই কেমন ধীর, শান্ত। কেহই কালীঘাটের কাঙালীর মত কাহাকেও জড়িয়ে ধরে না, কিম্বা গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চৌরঙ্গীর মোড় পর্য্যন্ত ছুটে আসে না। কেহ একটি পয়সা চাহিতেও সঙ্কোচ বোধ করে; হয় ত মুখের দিকে একটী বার চেয়ে ঘাড় নীচু কোর্‌লে। যদি তার মনের ভাব বুঝে তার হাতে একটি পয়সা দেও ত উত্তম, না দেও দাঁড়িয়ে থেকে চলে যাবে। আমাদের বঙ্গভূমি ভিক্ষুকের আর্ত্তনাদে ও কাতর প্রার্থনায় পরিপূর্ণ; তাতে দাতাদিগের কর্ণও বধির কোরে ফেলে, সুতরাং আমাদের বঙ্গীয় দাতাগণ যদি এদেশে আসেন ত এইসব বুভুক্ষিত বালক বালিকাদের নীরব প্রার্থনা প্রতিপদেই অনাদৃত হয়! কিন্তু যে সকল বাবু সন্ন্যাসী এ পথে পদার্পণ করেন, তাঁদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা নিতান্ত কম, এবং তাঁরা গরীবের কাতর প্রার্থনা শুন্‌বার আগেই যথাসাধ্য দান করেন। অতএব দাতার দানে যেমন বিরক্তি নেই, গ্রহীতার ভিক্ষা গ্রহণেও সেইরূপ অপ্রসন্নতার সম্পূর্ণ অভাব দেখা গেল। যে নিতান্ত ভিখারী, যার পয়সার অত্যন্ত প্রয়োজন, সেও একবারের বেশী দু বার চায় না। তবু আমাদের দেশে দুষ্টুমি-জ্ঞাপক বিশেষণ যোগ কোর্ত্তে হোলেই লোকে বলে "পাহাড়ে মেয়ে" "পাহাড়ে সয়তান" ইত্যাদি। এই পাহাড়ের বুকের মধ্যে এসে, পাহাড়ে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ কোরে পাহাড়ীর প্রতি এরকম কোপকটাক্ষ অকারণ বোলে মনে হোলো।

আরও কিছু অগ্রসর হোতেই দেখি যে পাহাড়ের দেবকুটীরের চিহ্ন একেবারে অদৃশ্য হোয়ে গেছে। চারিদিকে সাদা চিহ্ন ছাড়া আর কিছু

দেখবার নেই ; কে যেন সমস্ত প্রকৃতিকে দুগ্ধফেননিভ বস্ত্রখণ্ডে মুড়ে রেখেছে ; পায়ের নীচে পুরু বরফ তেমন কঠিন নয় ; তার মধ্যে কদাচিৎ দুটো একটা জায়গায় বরফ গলাতে পাথরের কৃষ্ণবর্ণ বেরিয়ে পড়েছে ; সেই গুলি লক্ষ্য কোরে পথ চল্‌তে লাগলুম। ইচ্ছা তাড়াতাড়ি চলি,— কিন্তু ভয়ানক কাদার মধ্যে দিয়ে যেতে যেমন জোর পাওয়া যায় না, এক পা তুল্‌তে আর এক পা বোসে যায়, আমাদের অবস্থা তদ্রূপ ; তবে এই যে, কাদার মধ্যে থেকে পা তুলতে ভারি ও আটালো বোধ হয়—বরফে সে রকম কোন উপসর্গ নেই। প্রথমে মনে হোলো আমরা দইয়ের উপর দিয়ে চোলছি ; ইচ্ছে হোলো খানিকটে তুলে গালে ফেলে দিই। কিন্তু স্বামিজীর কাছে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত কোরতেই তিনি এ রকম অশিষ্টাচরণ করার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি প্রদর্শন কোরে "প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ" এই চাণক্য-নীতির মর্যাদা রক্ষা কোল্লেন, এবং পাছে বরফ খাওয়া অন্যায় বোল্লে এ যুক্তি তর্কের দিনে তাঁর "মিত্রবদাচরেৎ" এর প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন না করি, এই ভয়ে তিনি বোল্লেন "বরফ খেলে পেটের ব্যারাম হয় !" এই অদ্ভুত মত শুনে আমার হাসি এল ; মনে হোলো আজকাল আমাদের দেশে যুক্তির আধিক্যের মধ্যে বড় একটা নূতনতর জিনিব প্রবেশ করেছে—সেটা হোচ্ছে শরীরতত্ত্ব ! ছেলে বেলায় শুনতুম, একাদশীতে নিরম্বু উপবাস কোল্লে পুণ্যসঞ্চয় হয়, এখন শুনি একাদশীতে উপবাস কোল্লে শরীরের রস অনেকটা শুষ্ক হয় সুতরাং জ্বরের আর ভয় থাকে না ; আগে শুনতুম, কুশাসন পবিত্র জিনিষ সুতরাং কোন ধর্ম্মকর্ম্ম উপলক্ষ্যে কুশাসন বসাই যুক্তিসঙ্গত, এখন শুন্‌তে পাই, কুশাসন অপরিচালক—তাই শরীরজ বিদ্যুতের সঙ্গে ভূমিজ বিদ্যুৎ একীভূত হয়ে শরীরের অনিষ্টসাধন কোর্‌তে পারে না। এইরূপে টিকি রাখা 'হাতে আচমন করা পর্য্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠানেরই এমন এক অভিনব ব্যাখ্যা বের হোয়েছে, যাতে প্রমাণ করে দেহরক্ষার চেয়ে আর ধর্ম্ম নেই এবং যা কিছু আমাদের ক্রিয়া-

কর্ম্ম সকলই এই দেহরক্ষার জন্যে। এতে ফল হয়েছে এই যে, যুক্তিগুলি নিতান্ত উপহাসাস্পদ হোয়ে পোড়ছে। অবশ্যই স্বামীজির প্রদর্শিত উদরাময়ের আশঙ্কা সম্বন্ধে এত কথা খাটে না; তিনি বৃদ্ধ, পরিপাক শক্তির প্রতি হয় ত তাঁর আর তেমন বিশ্বাস নেই এবং "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং" এই কথাটার উপর হয় ত অবিচল বিশ্বাস। স্বামীজি আমাকে অনেক অন্যায় কাজ কোরতে বহুবার নিষেধ কোরেছেন, এবং তাঁর নিষেধ সত্ত্বেও সেই সকল অন্যায় কাজ কোরে দু বার বেশ ফলভোগও করেছি; কিন্তু বৃদ্ধের অতি সতর্কতা অনুসারে চলাটা সর্ব্বদা আমাদের পুষিয়ে ওঠে না। অতএব স্বামীজির নিষেধ বাক্যে মনযোগ না দিয়ে দুই এক দলা বরফ তুলে গালে ফেলে দিলুম; দুর্ভাগাবশতঃ তৃপ্তিলাভ কোর্ত্তে পাল্লুম না। সেই বাল্যকালে যখন কলিকাতায় পড়তুম, তখন বৈশাখের দারুণ গ্রীষ্মে গলদ্ঘর্ম্ম হোয়ে কখন কখন দুই এক পয়সার বরফ কিনে প্রবল পিপাসার নিবৃত্তি করা যেত। পিপাসা এখনও তেমনই প্রবল আছে, কিন্তু বরফে ত আর তেমন তৃপ্তি বোধ হয় না।

এই রকম ভাবে চার পাঁচ মাইল চলার পর আমরা "হনুমান চটি"তে উপস্থিত হোলুম। এর নাম কেন যে 'হনুমান চটি' হোলো তা বোলতে পারিনে। দোকানদার আজ মোটে চার পাঁচ দিন হোলো এসে এখানে দোকান খুলেছে; তার আগে এ চটি বরফে ঢাকা ছিল। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করায়, সে এই নামের রহস্য ভেদ কোরতে পাল্লে না, কিন্তু চটিওয়ালা যে জবাব দিলে তাতে হাসি এল। সে বোল্লে, সে ছেলেমানুষ (বয়স চল্লিশের কাছাকাছি!) তার এ সকল শাস্ত্রকথা জানবার বা বুঝবার সময় হয় নি; বয়োবৃদ্ধ সাধুদের জিজ্ঞাসা কোল্লে ঠিক উত্তর মিলিতে পারে। এই চটি পর্ণকুটীর নয়। এই দারুণ বরফের রাজ্যে পাতার কুটীরে বাস রক্তমাংসধারীদের পক্ষে অসম্ভব, এবং সে রকম সম্ভাবনা উপস্থিত হোলে প্রাণ নামক পদার্থটি দেহকে আগেই জবাব দিয়ে বোসে থাকে। চটিতে

ছোট পাথরের ঘর, তার একটা বারান্দা বের করা ; আর তার পাশেই সম্মুখ দিক খোলা আর একটা ছোট ঘর। শুনলুম, এ ঘর চটিওয়ালার নয়; সে এক দেবতার ঘর। দু চার দিনের মধ্যেই দেবতাটি নীচে হোতে এখানে এসে তাঁর সিংহাসন দখল কোরে বোসবেন এবং পুণ্যপ্রয়াসী যাত্রী-দের আর এক দফা খরচ বাড়বে। এই চটিতে বেশী ঘর না থাকার কারণ জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লুম যে, এখানে কোন যাত্রীই থাক্‌তে চায় না। বদরিকাশ্রম এখান হোতে মোটে চার মাইল ; বদরিনারায়ণ ছেড়ে এই সামান্ত দূরে এসে কে আরাম বিরাম বা আহারাদি কোর্‌বে ? আর নারা-য়ণ দর্শনার্থীর মধ্যেই বা কে সাত সমুদ্র তের নদী পার হোয়ে এসে এই চার মাইলের জন্তে এখানে বোসে থাকবে ? তীর্থযাত্রীদের মধ্যে এমন প্রায়ই দেখা যায় না, যারা মন্দিরের দ্বারে এসে দেবতার শ্রীমুখপঙ্কজ না দেখে সিঁড়ির উপর বোসে অপেক্ষা করে স্বতরাং এখানে বেশী দোকান থাকার বিশেষ কোন দরকার নেই ; একখানা দোকান, তাই ভাল রকম চলে না। আর এই জন্তেই দোকানী তার দোকানে চাল ডাল বড় একটা রাখে না, কিছু পেড়া (সন্দেশ) বা পুরী সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখে এবং দরকার হোলে প্রস্তুত কোরেও দিতে পারে ; যাত্রীরা প্রায়ই এখানে ছোলাভাজা পুরী ইত্যাদি জলখাবার কিনে নেয়। আমরাই বা এ স্বযোগ ছাড়ি কেন ? এই দোকানে টাট্‌কা ভাজা পুরীর স্বগোল পরিধি দর্শনে বৈজ্ঞানিক ভায়া বিশেষ লোলুপ হোয়ে উঠলেন। স্বামীজি বোল্লেন, "অচ্যুত, আজ আমাদের মহা আনন্দের দিন ; এমন দিন মানুষের ভাগ্যে বড় কম ঘটে, আর অল্প-ক্ষণ পরেই আমাদের জীবন সার্থক হবে। আজ মনের আনন্দে এখানে আহারাদির আয়োজন কর।" অচ্যুত ভায়াকে এ কথা বলাই বাহুল্য ; একে নিজের যোল আনা ইচ্ছা, তার উপর স্বামীজির অনুমতি, ভায়া উৎসাহে হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন। তাঁর সে দিনের সেই উৎসাহ দেখে মনে হোয়েছিল ভায়া যদি ধর্ম্মকর্ম্মে সর্ব্বদা এমন উৎসাহ প্রকাশ কোর্‌তেন

তা হোলে যতদিন তিনি দণ্ড ছেড়েছেন তাতে এতদিন কৃষ্ণ বিষ্ণুর মধ্যে একজন হোতে পার্তেন, কিন্তু তাঁর সে দিকে নজর নেই।

দীর্ঘকাল অনাহারে থাকায় এবং পথ পর্য্যটনে ক্ষুধা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি হোয়েছিল। যথাবিহিত ক্ষুধা শান্তি কোরে এবং এক ঘণ্টার জায়গায় তিন ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করার পর বদরিনারায়ণের পথের শেষ আড্ডা ত্যাগ কল্লুম।

একটু অগ্রসর হোয়েই সম্মুখে একটা প্রশস্ত-দুরারোহ পাহাড় দেখলুম। আগাগোড়া কঠিন বরফরাশিতে আবৃত; যেন বিভূতিভূষিত যোগীশ্রেষ্ঠ; সরল, উন্নত, শুভ্র দেহ, ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের যেন অখণ্ড আদর্শ। মস্তক আকাশ স্পর্শ কোরছে, মধ্যাহ্নসূর্য্যের কিরণ তাতে প্রতিফলিত হোয়ে কিরীটের ন্যায় শোভা পাচ্ছে, নিম্নে স্তূপে স্তূপে বরফ সঞ্চিত হোয়ে পাদদেশ আবৃত কোরেছে। আমরা যেন বিস্ময় ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দেবার জন্যই তার পদতলে এসে দাঁড়ালুম।

কিন্তু আমাদের এই বিস্ময় ও ভক্তি শীঘ্রই ভয়ে পরিণত হোলো। শুনলুম, এই উন্নতপাহাড়ের পর প্রান্তে বদরিকাশ্রম। এ পাহাড় উল্লঙ্ঘন না কোরে আমাদের সেই পুণ্যাশ্রম দেখবার অধি[illegible] নেই; কিন্তু এ পাহাড় অতিক্রম করা বড় সহজ কথা নয়। যাত্রার আরম্ভে সন্ন্যাস গ্রহণের প্রথম উদ্যমেই যদি এমন একটা বিশাল পর্ব্বত আমার অভীষ্ট সাধনের পথ আট্‌কে এই রকম ভাবে দাঁড়াতো, তবে এই সন্ন্যাসব্রত— কঠোরতাই যার সাধনার অঙ্গ —তা গ্রহণ কোরতে সাহস কোর্ত্তুম কিনা সন্দেহ।

একে ত ক্রমাগত সোজা উপরের দিকে উঠা, প্রতিপদে পা ভেঙ্গে এবং নিশ্বাস আট্‌কে আসে, তার উপর পায়ের নীচে বরফের স্তূপ! যেখানে বরফ একটু গোলছে সেখানে যেন বালি রাশির উপর দিয়ে যাচ্ছি; প্রতি পদক্ষেপেই পা ডুবে যাচ্ছে। আবার যেখানে জমাট কঠিন বরফ,

সেখানে ভয়ানক পিছল ; একটু অসাবধান হোয়ে পা ফেল্লেই আর কি ? মুহূর্ত্তের মধ্যে ইহজীবনটা ডিঙ্গিয়ে পরলোকের প্রান্তে উপস্থিত হওয়া যায়।

চোল্‌তে চোল্‌তে পায়ের যাতনা ক্রমে অনেকটা কমে এল দেখ্‌লুম। আস্তে আস্তে পা দুখানি অসাড় হোয়ে পড়লো ; তখন সেই তুষারশীতল স্পর্শ আর তাদের কাতর কোর্‌তে পার্‌লে না বেশ বেগের সঙ্গেই চোল্‌তে লাগ্‌লুম। সময়ে সময়ে দুই এক দলা বরফ তুলে নিয়ে গোলাকার কোরে দূরে ছুঁড়ে ফেলি, দেখ্‌তে দেখ্‌তে তা ধুলোর মত গুঁড়ো হোয়ে যায়।

পা অবশ হোয়ে ক্রমে ক্রমে ভারি হোয়ে এল তবু প্রাণপণ শক্তিতে এ পথটুকু চোল্‌তে লাগ্‌লুম ; খানিক পরে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে পৌছুলুম। বেলা তখন শেষ হোয়ে এসেছে।

এখানে এসে চেয়ে দেখ্‌লুম অপর পাশে খানিকটে নীচে কিছুদূর বিস্তৃত একটা সমতল ক্ষেত্র। দুই পাশে দুটি অভ্রভেদী পাহাড় ধনুকের মত সেই সমতলভূমিকে কোলে নিয়ে বোসে রোয়েছে ; অলকনন্দা দূরে দূরে আঁকাবাঁকা দেহে অতি ধীর গতিতে চোলে যাচ্ছে। কোথাও সামান্য স্রোত দেখা যাচ্ছে ; জল দেখ্‌বার যো নেই, পাতলা বরফগুলি ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছে, তাই দেখে স্রোতের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, কোথাও বা স্রোতের সম্পর্ক মাত্র নেই, আগাগোড়া জমে গিয়েছে, কেবল নদীগর্ভের নিম্নতায় নদীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যাচ্ছে। সেই দুগ্ধফেননিভ বহুদূর বিস্তৃত তুষার রাশির উপর অস্তোন্মুখ তপনের লাল রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে এমন বিচিত্র শোভা হোয়েছিল যে বোধ হলো সে যেন পৃথিবীর শোভা নয়, সে দৃশ্য অলৌকিক। আমি মনে মনে কল্পনা কল্লুম শান্তিহারা অধীর হৃদয়ে ঘুরতে ঘুরতে আজ বুঝি বিধাতার আশীর্ব্বাদে দুঃখ-কোলাহলময় পৃথিবীর অনেক উর্দ্ধেবরণীয় স্বর্গরাজ্যের দ্বারে উপনীত হয়েছি,

দেখকে মালুম হুয়া আপ বহুত বড় আদমী, এইসা আদমী নারায়ণ দর্শন করনেকো ওয়াস্তে কভি নেহি আয়া"—আর একজন গল্প জুড়ে দিলে, সে গল্পের কতখানি সত্য এবং কতটা বা তার কল্পনাপ্রসূত,তা অবশ্য আমি ঠিক করে উঠতে পারি নি—আর সে জন্যে আমার কিছু আগ্রহও ছিল না—কিন্তু সে যা বল্লে তার মোদ্দাটা এখানে একটু লেখা যেতে পারে। সে বল্লে, কয়েক বছর আগে এখানে এক যুবক সাধুর শুভাগমন হয়েছিল। তার আকার প্রকার এবং অবয়বাদি সমস্ত অবিকল আমারই মত; কেবল সে ব্যক্তি আমার চেয়ে কিছু লম্বা ও গৌরবর্ণ, আমার চেয়ে কিছু মোটা এবং দাড়ী গোঁপ খানিক বড়, বয়সও আমার চেয়ে কিছু কম বা বেশী হতে পারে; (সুতরাং বলা বাহুল্য আমার সঙ্গে সেই গল্পোক্ত ভদ্রলোকের সবই মিলে গেল!) আমারই মত তাঁর গায়ে একখান কম্বল ছিল—তবে সেখানি মূল্যবান বিলাতী কম্বল। কত লোক কত সময় কত ভাবে এখানে আসে, কে তার হিসাব রাখে? তবে যারা জাঁকজমকে অনেক লোক জন সঙ্গে নিয়ে আসে তাদেরই কাছে লোকের কিছু গতিবিধি হয়। উপরোক্ত লোকটীর সঙ্গে কোন লোকজন ছিল না সুতরাং তার দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি; বিশেষ এ লোকটী এসে কোন দোকানে কি পাণ্ডার ঘরে আশ্রয় নেয় নি। নারায়ণের মন্দিরের বাইরে একটা খোলা জায়গায় বোসে থাকতো কদাচ এক আধবার কোথাও উঠে যেত। তাকে এই রকম নিতান্ত অনাথের ন্যায় দীনবেশে অন্যের অনাহূতভাবে পোড়ে থাকতে দেখে মোহন্ত মহাশয়ের তার প্রতি দয়া হলো,তিনি তাঁকে ডেকে পরিচয় জিজ্ঞাসা কল্লেন, কিন্তু সে কোন কথার ভাল একটা জবাব দিলে না সাধু সন্ন্যাসীর যেমন সকল অনুসন্ধান উড়িয়ে দিতে চান, এও সেই রকম ভাব দেখালে। যাহোক সঙ্গে কিছু খাবার সংস্থান নেই, অথচ বদরিনারায়ণে এসে ভদ্র-লোক অনাহারে মারা পড়বে, ইহা অনুচিত মনে কোরে, মোহন্ত মহাশয় দুবেলা তাঁকে ঠাকুরদের প্রসাদ খেতে দিতেন। সে কোন দিন প্রসাদ

খেতো, কোন দিন স্পর্শও কর্ত্তো না, যেমন প্রসাদ তেমনি পোড়ে থাকতো। লোকটীর আর একটু বিশেষত্ব ছিল— দিবসের অধিকাংশ সময়ই কম্বল মুড়ি দিয়ে পোড়ে থাকৃত, নীরবে পোড়ে থাকতেই ভালবাসত এবং কেহ আলাপ কর্ত্তে গেলে বরং একটু বিরক্তিই প্রকাশ কর্ত্তো।

এই ভাবে দশ পনর দিন যায়। নারায়ণ দর্শন কোরে যে সকল যাত্রী ফিরে যায়, তারা সকলেই কৌতুহলপূর্ণদৃষ্টিতে একবার সেই সুন্দর যুবক সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে চলে যায়। কেহ বা তার সেখানে বোসে থাকবার কারণ জিজ্ঞাসা করে—কিন্তু কোন সদুত্তর পায় না, হঠাৎ একদিন সন্ধ্যা-বেলা পেয়াদা সিপাহী চাকর বাকর সঙ্গে খুব জমকালো পোষাক আঁটা, অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত ৪।৫ জন শেঠ এসে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হলো, তারা এখানে কাকেও কিছু না বোলে, চারিদিকে কার যেন অনুসন্ধান কোরে ফিরতে লাগলো। শেঠজিদের এই ব্যবহারে নারায়ণের পাণ্ডারা কিঞ্চিৎ ভীত ও বিস্মিত হয়ে পড়লো, এবং ব্যাপার কি জান্‌বার জন্যে তাদের পিছে যাত্রীর ভিড় জমে গেল। যাহোক তারা খুঁজতে খুঁজতে মন্দিরদ্বারে এসে দেখে, একজন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। এ ব্যক্তি আর কেহ নয়, পূর্ব্ব কথিত সন্ন্যাসী! কম্বল মুড়ি দিয়ে থাক্‌তে দেখে একজন "কোন হায় রে!" বলে সজোরে তাকে ধাক্কা মার্‌লে; ধাক্কা খেয়ে সন্ন্যাসী মুখাবরণ উন্মুক্ত করে উঠে বসতেই সেই জামাজোড়া পরিহিত লোকগুলি তার সম্মুখে নতজানু হয়ে বোসে পড়লো, ও বল্লে, কসুর মাপ কি জিয়ে, মহারাজ, আপ হিয়া,হামলোক তামাম দেশ ঢুরকে হিয়া আয়।" যে সকল পাণ্ডা এই ব্যাপার দেখেছিল, তারা একে বারে অবাক্! তাদের অপরাধ কি? সে বিচারীদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এমন একটী সন্ন্যাসী মহারাজ কখন দৃষ্ট হয় নি। পৌরাণিক গল্পে বা উপন্যাসে কখন কখন এরকম লোকের কথা শুনেছে বটে; কিন্তু এই কলিযুগের শেষ ভাগে যে এমন ঘটনা ঘট্‌তে পারে, তা তারা কি রকম কোরে বিশ্বাস কোরে? এদিকে মহারাজের ছদ্ম-

বেশ যখন প্রকাশিত হয়ে পড়লো, তখন "চুপ চুপ গোল মৎ করো" রবে চারিদিকে গোল বেড়ে গেল, সুতরাং মহারাজ আর আত্মগোপন কর্ত্তে পাল্লেন না; শেষে অনেক দান ধ্যান হলো, ব্রাহ্মণ লোকেরাও বহুত জিনিস লাভ কল্লে; অবশেষে মহারাজ স্বস্থানে প্রস্থান কল্লেন। পাণ্ডাজীর গল্প শেষ হতে না হতে আর একজন পাণ্ডা আর এক গল্প আরম্ভ কল্লে, তার গল্পটা এই রকম, তবে প্রভেদের মধ্যে যে এতে যেমন মহারাজের অমাত্যগণ এসে তাঁকে নিয়ে চল্লেন, তাতে সে রকম কেহ আসেন নি, মহারাণী স্বয়ং এসেছিলেন, কিন্তু তিনি মহারাজের মৃতদেহ ভিন্ন তাঁকে জীবিত দেখতে পান নি, সুতরাং এখানে শ্রাদ্ধ দান ধ্যানাদি সমাপ্ত কোরে, হরকোপানলে মদন ভস্ম হলে রতি যেমন শূন্য প্রাণে পতির মৃতদেহ ত্যাগ কোরে বিলাপ করতে করতে সুরপুরে ফিরে গিয়েছিলেন, রাণী তেমনি স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন। পাণ্ডা ও ব্রাহ্মণেরা যে এই রকম কোরে মধ্যে মধ্যে চর্ব্বা চোষ্য আহার ও প্রচুর দক্ষিণা লাভ করে তারা তা আমাকে জানাতে ক্রটী কল্লে না। আমি ত তাদের কথায় এই বুঝলুম যে 'তুমি এক জন ছদ্মদেশী মহারাজা, আমরা নারায়ণের কৃপাবেলে তোমায় চিনেছি, আর গোপন কর্ত্তে পারবে না, এখন আমাদের কি দেবে তা ও।"

আমি কিন্তু এদের অতি স্তুতিবাদে ভারি বিপন্ন হয়ে পড়েছিলুম। আমার সেই অপরিচ্ছন্ন ঝাঁকড়া চুল, ছিন্নবস্ত্র ও জীর্ণ কম্বলের মধ্যে হতে তারা কিরূপে যে রাজা রাজড়ার গন্ধ আবিষ্কার কল্লে, তা আমি অনুমান কর্ত্তে পাল্লুম না। তার চেয়ে বরং স্বামীজির তেজোময় শরীর, আভূমি-চুম্বিত দাড়ি, গৈরিক বসন, গৈরিক আলখেলা এবং গৈরিক থানের প্রকাণ্ড পাগড়ীতে আবৃত মস্তক দেখলে তার মধ্যে একটা মহারাজা সংগুপ্ত আছে এমন বিবেচনা করা নিতান্ত অসঙ্গত হতো না। যাহোক ক্রমে যখন আমরা বদরিকাশ্রমের অত্যন্ত কাছে এলুম, তখন ধীরে ধীরে পাণ্ডার দল পুষ্টি হতে লাগলো এবং তারা নিজেদের বাহাদুরী দেখিয়ে আমাকে কাড়াকাড়ি

কাড়ি করবার উপক্রম করে; ক্রমে তাদের মধ্যে মুখোমুখী ছেড়ে শেষে হাতাহাতি হয় দেখে আমার ভারি ভয় হলো। আমি তখন উপায়ান্তর না দেখে আমার মুষ্টিযোগ ত্যাগ কল্লুম; বোল্লুম আমার পাণ্ডা লছমীনারায়ণ। জানতুম লছমীনারায়ণ বয়সে প্রায় সকল পাণ্ডা অপেক্ষা ছোট হলেও সম্মানে, অর্থগৌরবে অন্য সকল পাণ্ডাকে ছাড়িয়ে উঠেছিল। লছমীনারায়ণই এই মহাধর্ম্মাশ্রমের আখড়াধারী, এ সাগরে সেই কর্ণধার; সুতরাং তার নাম বলবামাত্র অন্যান্য পাণ্ডাদের উৎসাহ একেবারে নিবে গেল। তখন তারা অন্য উপায় না দেখে, 'ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ কোরবে তাতে মঙ্গল হবে' ইত্যাকার ধূয়া ধরে কিঞ্চিৎ আদায়ের চেষ্টা দেখতে লাগলো। আজ এই মহাতীর্থে প্রবেশ করবার সময় এতগুলি ব্রাহ্মণকে নিতান্ত নিরাশ করা বড় ভাল দেখায় না মনে কোরে মিষ্ট বাক্যে তাদের কিঞ্চিৎ আশা দিয়ে পুরী প্রবেশ কোল্লুম।

বদরিনাথ।

২৯শে মে, শুক্রবার—কাঠের একটা সাঁকো দিয়ে অলকানন্দা পার হোয়ে ধীরে ধীরে বদরিনাথে প্রবেশ কল্লুম। আঘাতের পর প্রতিঘাত স্বাভাবিক নিয়ম; বদরিনাথের পথে যখন চলছিলুম, তখনকার সেই উৎসাহ, আগ্রহ, মনের ভয়ানক আবেগ, অভীষ্ট স্থানে এসে সে সমস্তই যেন সংযত হোয়ে গেল। এই রকমই হোয়ে থাকে।

পথে যখন অবিশ্রান্ত সংগ্রাম কোরতে হোয়েছে, তখন মনে হোয়েছিল, এই নিদারুণ যুদ্ধের অবসানে এমন একটা কর্ম্মশীলতার মধ্যে গিয়ে পড়বো, যেখানে পূজার্চ্চনার অবিরাম কলরবে, মানব-হৃদয়ের সুখ-দুঃখ ও হর্ষ-শোকের বিপুল উচ্ছ্বাসে এক সুগভীর কল্লোল উত্থিত হোচ্ছে। নদীর জলপ্রবাহ সমুদ্রের ফেনিল উর্ম্মিরাশির নির্ব্বাধ নৃত্যের মধ্যে মিশে যেমন হারিয়ে যায়, সেইরূপ হিন্দুর মহাতীর্থে নারায়ণের পুণ্য পীঠতলে,

দেবমহিমার এক অনন্ত প্রশান্তির মধ্যে, আমার এইক্ষুদ্র-জীবনের ব্যাকুল বাসনা ও অশান্ত উদ্বেগও সমাহিত হবে। কিন্তু এখানে পৌঁছে কেমন নিরাশ হোয়ে পোড়লুম।

বদরিনাথে প্রথম প্রবেশ কোরই চারিদিকে একটা নিরুদ্যম, একটা উদাসীন ভাব চোখের সম্মুখে পড়লো। মনে হোলো এ উদাসীনতা বুঝি হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মে মর্ম্মে বিজড়িত। তীর্থযাত্রীদের উদ্যম উৎসাহে কি হবে, একটা অলস কর্ম্মহীনতা তীর্থস্থানে যেন চিরস্থায়ী রকমের আড্ডা বেঁধেছে। অলকানন্দা অতি নিরুদ্বেগে মন্থর-গমনে বরফরাশির নীচে দিয়ে চোলে যাচ্ছে; সহরের অধিকাংশ ঘর বাড়ী এখন পর্য্যন্তও বরফের তলায় পড়ে আছে। যে কয়খানা ঘর দেখা যাচ্ছে, তাদের অবস্থাও অতি শোচনীয়। তাহা কতক বরফের প্রসাদাৎ, আর কতক আমাদের পূর্ব্বাগত সন্ন্যাসী মহাশয়দের কৃপায়, আর কতকগুলি ঘর এই তিন বৎসর কাল ধোরে বন্ধ থাকা বশতঃ। সন্ন্যাসী মহাশয়রাই ক্ষতি করেছেন কিছু বেশী। ঘরের দ্বার জানালাগুলি বেবাক অন্তর্হিত হোয়েছে; অবশ্য সেগুলো যে সশরীরে স্বর্গে গিয়েছে, তা ন। যে সকল সন্ন্যাসী সর্ব্বপ্রথমে এখানে এসেছিলেন, তাঁরা দেখেছি ন তখনও হাট বাজার বসেনি, সুতরাং জ্বালানি কাঠ পাওয়া অসম্ভব; তাই আপনাদিগকে শীতের হাত থেকে পরিত্রাণ করবার জন্যে এই সমস্ত জানালা দরজা ব্রহ্মাকে উপহার দিয়েছেন, এবং তীর্থস্থানে এসে পরের জিনিষপত্র নাশ কোরে "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" এই মহানীতি-কাব্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার জন্যে তাঁদের মহৎ হৃদয় যে কিরূপ ব্যাকুল হোয়ে উঠেছিল— এই সমস্ত জানালা দরজার অভাব তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু পরে যে সকল যাত্রী আস্‌বে, তারা এই বরফ-রাজ্যে এসে এদের অভাবে যে কত কষ্ট পাবে, এ কথা চিন্তা করবার বোধ করি তাঁদের অবসর হয় নি।

পুর-প্রবেশ করবার পূর্ব্বে যে সকল পাণ্ডা আমাকে পেয়ে বোসে-ছিল, তাদের হাত থেকে যে কি রকম কোরে অব্যাহতি পেলুম, সে কথা পূর্ব্বেই লিখেছি। বদরিনারায়ণে এসে কোথায় উঠ্‌বো তা লছমীনারায়ণ আমাদের দেবপ্রয়াগেই বোলে দিয়েছিল। তাঁর শ্রীহস্ত-লিখিত সেই ঠিকানা এখনও আমার ডাইরী বইয়ে আছে, তা এই,—কূর্ম্মধারাকি উপর মোকান, লছমীনারায়ণ পাণ্ডা, বেণীপ্রসাদ রামনাথকী চাচী।" —প্রথম কথাগুলোর অর্থ বুঝেছিলুম যে, কূর্ম্মধারার উপরে লছমী-নারায়ণ পাণ্ডার বাড়ী, আর সেখানে বেণীপ্রসাদ আছেন। তা সে বেণীপ্রসাদ মানুষই হোন, আর লছমীনারায়ণের গৃহবিগ্রহই হোন। কিন্তু শেষের দিকটার অর্থ নিতান্ত হেঁয়ালীর মত বোধ হওয়াতে সে অর্থ নিষ্কাশনে অসমর্থ হোয়ে তখনই লছমীনারায়ণকে সে কথা জিজ্ঞাসা কোরেছিলুম, কিন্তু কি কারণে জানিনে উক্ত পাণ্ডাশ্রেষ্ঠ ঐ কথা কয়টার অর্থ সম্বন্ধে আমাকে সজ্ঞান করান আবশ্যকতা মোটেই অনুভব করে নি। আমার কৌতূহল-প্রবৃত্তির আগ্রহাতিশয্য দেখে উপরন্তু বোলেছিল, "বস্ উয়ো বাৎ বোল্‌নেসেই ডেরা মালুম হোগা,"—সুতরাং কথাটা আর মোটেই বোঝা হয় নি। কিন্তু এখনও মনে পড়ে, সে দিন সমস্ত অপরাহ্ণটা এই কথার অর্থ নির্ণয়ের জন্যে বৈদান্তিক ভায়ার সঙ্গে কিরূপ অনর্থক বাক্যব্যয় কোর্‌তে হোয়েছিল। বৈদান্তিক শুধু তার্কিক নন, একজন সুরসিক ও ভারি সমজদার লোক; তাই তাঁর প্রথমেই সন্দেহ হোলো এই বেণীপ্রসাদ লোকটা লছমীনারায়ণের হয় শ্যালক না হয় ভগিনী-পতি। সম্বন্ধটা কিছু মধুররসাত্মক বোলেই পাণ্ডার পো আমাদের কাছে তার মর্ম্মভেদ করা বাহুল্য জ্ঞান কোরেছিল। যা হোক বৈদান্তিক শুধু এই অনুমানের উপর নির্ভর কোরে ক্ষান্ত হোলেন না, এবং আমিও এই অনুমানের বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ কোরেছিলুম, সুতরাং তিনি কথাটার ধাতুশব্দগত অর্থ বের করবার জন্য প্রস্তুত হোলেন। গভীর গবে-

বগা ও প্রচুর চিন্তার পর শেষে তিনি এই স্থির কোল্লেন যে, সেখানে বেণীপ্রসাদ আছে এবং রামনাথের খুড়ী আছেন, কেননা "চাচী" শব্দের অর্থ খুড়ী ছাড়া আর কিছু হোতেই পারে না; কাজেই "রামনাথকী চাচী" এক সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যক্তি। তবে স্ত্রীলোকের নাম ধোরে আড্ডা খুঁজতে হবে, এই যা মনের মধ্যে একটা খট্‌কা লেগে রইল। বৈদান্তিক বোলে বস্‌লেন জায়গায় জায়গায় অমনতর দুই একটা স্ত্রীলোক থাকে, পুরুষের চেয়ে তাদের খ্যাতি অনেক জেয়াদা। বলা বাহুল্য স্বয়ং লছমীনারায়ণ আমাদের সঙ্গে আসতে পারে নি, কারণ সে আরও কয়দিন দেবপ্রয়াগে না থাকলে অনেক নূতন যাত্রী তার বেদখল হোয়ে যাবে; তার এই ভয় ছিল; তবে সে আমাদের ভরসা দিয়েছিল যে, শীঘ্রই আমাদের সঙ্গে এসে মিশবে। যা হোক বদরীনাথে এসে সেই "রামনাথকী চাচীর" অনুসন্ধানে বেশী নিগ্রহ ভোগ কোর্ত্তে হয় নি। সকল পাণ্ডাই তীর্থের কাকের মত রাস্তায় বোসে থাকে, যখন তারা শুন্‌লে যে আমরা লছমীনারায়ণের লোক, তখন তাদের মধ্যে একজন এসে নিজেকে বেণীপ্রসাদ বোলে পরিচয় দিলে। বেণীপ্রসাদের আকার প্রকার কি রকম তা আমরা কেহই জানতুম না, সুতরাং কলিকাতা, কালীঘাট, কি ঐ [illegible] কার কোন স্থান হোলে স্বতঃই সন্দেহ হোতো যে, হয় ত বা একটা জাল বেণীপ্রসাদ এসে আমাদের স্কন্ধে ভর কোরেছে এবং গোলযোগের মধ্যে যখন আসল বেণীপ্রসাদটা বেরিয়ে পোড়বে, তখন আমাদের এক বিষম মুস্কিলে পোড়তে হবে। কিন্তু বদরিনাথের মত স্থানের এখনও ততটা অধঃপতন হয় নি! সুতরাং এই লোকটা বেণীপ্রসাদ বোলে পরিচয় দেবামাত্র আমরা অসঙ্কোচে তার সঙ্গে চোল্‌তে লাগলুম।

কিন্তু বেণীপ্রসাদ বেচারীও আমাদের নিয়ে মহাবিপদে পোড়লো। তাদের ঘরবাড়ী এখনও বরফে ঢাকা, আরও পনের ষোল দিন না গেলে তারা বরফস্তূপের মধ্য হোতে প্রকাশ হচ্ছে না। বেণীপ্রসাদ নিজে

অন্য লোকের একটা কুঠরী দখল কোরে বাস কোচ্ছে, স্থতরাং এ রকম অবস্থায় সে আমাদের কোথায় রাখে, এই ভাবনাতে অস্থির হোয়ে পোড়লো। যা হোক শেষে সে পাহাড়ের উপর আর এক জনের একটা ঘরে আমাদের আড্ডা স্থির কোরে দিলে। এই ঘর যার সে তখনও এখানে এসে পৌছে নি; আমাদের আশঙ্কা হোতে লাগলো, ঘরওয়ালা হঠাৎ এসে আমাদের প্রতি অৰ্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা না করে; কারণ, এরা বিলক্ষণ অতিথিপরায়ণ হোলেও অতিথিসেবার পুণ্যটুকু তাদের জন্যে রেখে অন্য লোকে যে তার অর্থগত উপস্বত্বটুকু ভোগ কোর্‌বে, এদের পক্ষে তা অসহ্য। কিন্তু অনর্থক উদ্বিগ্ন হওয়াতে কোন লাভ নেই ভেবে আমরা সেই ঘরেই আড্ডা গাড়বার যোগাড় কোরে নিলুম। ঘরটি বেশ লম্বা চওড়া বটে, কিন্তু তার আভ্যন্তরিক অবস্থা অতি শোচনীয়, দ্বারগুলি পূর্ব্বাগত সন্ন্যাসীদের অগ্নিসেবায় লেগেছে। রাত্রে দুর্জ্জয় শীত আস্‌ছে; তখন এই ঘরে কি কোরে তিষ্ঠান যাবে, এখন এই চিন্তাতেই আমরা সকলে ব্যতিব্যস্ত হোয়ে পোড়লুম। সন্ধ্যা হোতেও আর বেশী দেরী নেই। সন্ধ্যার সময় একবার নারায়ণ দর্শনে যাব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শুনলুম অপরাহ্লেই নারায়ণের দ্বার বন্ধ হোয়ে গিয়েছে, স্থতরাং রাত্রিযাপনের জন্যে আগুনের যোগাড়ে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হোতেই বড় শীত বোধ হোতে লাগল এবং সর্ব্বশরীর পুরু কম্বলে ঢাকা থাকা সত্বেও শীতে সর্ব্বাঙ্গ অবশ হোয়ে এল। শুনেছি মহাকবি কালিদাসকে কে একবার জিজ্ঞাসা কোরেছিল, "মাঘে শীত না মেঘে শীত?"—তার উত্তরে কবিবর নাকি বোলেছিলেন, "যত্র বায়ু তত্র শীত।" কখন বদরিকাশ্রম দর্শন কোর্ত্তে এলে কালিদাস তাঁর এই উত্তরের অসারতা বুঝে নিশ্চয়ই লজ্জিত হোতেন। চারিদিকে উচু পাহাড়ে এই বায়ু-প্রবাহশূন্য স্থানেও যে রকম মারাত্মক শীত, তা কবি-প্রতিভার আয়ত্তীভূত নয়, যে সকল পুণ্যপ্রয়াসী তীর্থ-যাত্রী এ সকল স্থানে আসে, তারাই তা মর্ম্মে

মর্ম্মে অনুভব করে। তবু ত এ মে মাস; মাঘ মাসের প্রবল শীত অনুমান কর্‌বার শক্তি মানুষের নেই। আমরা বহুকষ্টে কাষ্ঠ সংগ্রহ কোরে আগুন জ্বাল্লুম এবং তার পাশেই শয্যা রচনা করা গেল। সে রাত্রে কিছুই আহার হোলো না।

হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যে এতদূরে জনমানবশূন্য চিরতুষাররাশির ভিতরে এতখানি সমতলভূমি দেখ্‌লে প্রাণে বড়ই আনন্দ বোধ হয়। হরিদ্বার থেকে যাত্রা কোরে এতদূর এসেছি, ওর মধ্যে যাহা কিছু অল্প সমতল জমী দেখেছি তাহা শ্রীনগরে, তা ভিন্ন সমস্ত জায়গাই "কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ" অষ্টাবক্র বিশেষ। হরিদ্বার হোতে বদরিকাশ্রম দুই শত মাইলেরও বেশী। একে তো হিমালয় প্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য ভারী গম্ভীর; এ গাম্ভীর্য্যের সহিত স্বতঃই সাগরের গাম্ভীর্য্যের তুলনা কোর্‌তে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এই দুই জিনিসের মধ্যে আশ্চর্য্য রকমের তফাৎ। একটী মহাউচ্চ, অসমান, কঠিন, সুদীর্ঘ শ্যামল বৃক্ষশ্রেণীর চিরন্তনের বাসভূমি—আর একটী সুগভীর, সমতল, তরল, উদ্ভিদের নাম বর্জ্জিত, যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু গভীর নীলিমায় সমাচ্ছন্ন। তবু এ প্রদেশের মধ্যে কেন যে তুলনার কথা মনে আসে, তাহা ঠিক বলা যায় না; বোধ করি এ উভয়কে দেখেই আর একজনকে মনে পড়ে; এই মহান্ সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিশ্বপিতার মহিমা ব্যাপ্ত আছে, তাই একটী দেখে আর একটীর কথা মনে উদয় হয়। হিমালয়ের একেই ত গম্ভীর দৃশ্য, তার উপর বদরিকাশ্রমের দৃশ্যটা আরও গম্ভীর। দুই দিকে দুইটা পর্ব্বত একেবারে আকাশ ভেদ কোরে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের স্তব্ধ ছায়া বদরিকাশ্রমকে ঢেকে ফেলেছে। পাণ্ডাদের মুখে শুন্‌লুম, এই দুটি পর্ব্বতের একটীর নাম "নর", অপটীর নাম "নারায়ণ;" আরও শুন্‌লুম, এই পর্ব্বতদ্বয়ের অঙ্গ ক্রমেই বিস্তৃত হোচ্ছে। শাস্ত্রে না কি লেখা আছে, ক্রমে এরা বর্দ্ধিত-কলেবর হোয়ে নারায়ণের মন্দির ঢেকে ফেল্‌বে, সুতরাং বদরিকাশ্রমতীর্থ চির দিনের মত

হিমালয়ের পাষাণবক্ষে লুকিয়ে যাবে। তবে পাণ্ডারা এই ভরসা করে যে দুই চারিশত বছরের মধ্যে সে রকম দুর্ঘটনা ঘটবার কোন সম্ভাবনা নেই; কাজেই আশু দরিদ্রতার আক্রমণ সম্বন্ধে তারা নিরাপদ; তবে তাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা রইল বটে!

যে উপত্যকার উপর বদরিকাশ্রম প্রতিষ্ঠিত, তা অতি সুন্দর! শুধু ভক্তের নয়, কবিরও এখানে উপভোগের যথেষ্ট সামগ্রী আছে! এই পুণ্য-ভূমি ভেদ কোরে অলকনন্দা প্রবাহিত হোচ্ছে; কিন্তু বছরের বেশী সময়ই তা বরফে আচ্ছন্ন থাকে, এখনও ইহা বরফে ঢাকা। আরও কিছুদিন পরে বরফ গোলে তার ললিত তরল স্রোতে ভেসে যাবে, সে দৃশ্য ভারি সুন্দর!

বদরিকাশ্রম উত্তর দক্ষিণে লম্বা; দীর্ঘে বোধ হয় ৪০০ ফিটের বেশী নয়, কিন্তু অসমান পাহাড়ের মধ্যে এই স্থানটুকু খুব দীর্ঘ বোলে বোধ হয়। দীর্ঘে এতখানি হোলেও প্রস্থে বেশী নয়; আরও দেখ্‌লুম প্রস্থ-দেশ খানিকটা ঢালু, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখ্‌লেই তবে তা বুঝতে পারা যায়, নহিলে সহসা বোধগম্য হয় না। দূরের পর্ব্বত থেকে অনেকগুলি ঝরণা বের হোয়ে অলকনন্দায় পড়েছে এবং নদীবক্ষে বরফ ভেদ কোরে সেই জল ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। উপরে যে কূর্ম্ম-ধারার কথা বোলেছি তা এই বদরিনাথের বাজারের মধ্য দিয়ে নেমে নদীতে পোড়ছে, এই ঝরণাতে বাজারের লোকের যথেষ্ট উপকার হয়। কূর্ম্মধারা ছাড়া বাজারের পাশেই আর একটা ঝরণা আছে! বাজারে যে কতগুলি দোকান আছে, প্রথম দৃষ্টিতে তা ঠিক বুঝতে পাল্লুম না। এখনও অনেকগুলি দোকান বরফের নীচে সুপ্তাবস্থায় লুপ্ত আছে, কিন্তু সমস্ত ঘর বাড়ীর একটা সঠিক ধারণা না হোলেও বোধ হোলো পাণ্ডাদের বাসস্থান ও দোকান, সব শুদ্ধ ত্রিশ পঁয়ত্রিশখান ঘরের বেশী হবে না। বাজারে দরকার মত জিনিসপত্র সকলই পাওয়া যায়; তবে দরকার অর্থে যদি কেহ অনুমান কোরে থাকেন জুতা, ছাতা, সাবান, পমেটম ইত্যাদি সৌখীন রকমের জিনিসপত্র সব

পাওয়া যায়, তবে আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। পাহাড়ের মধ্যে এসে অনাবশ্যক বহুবিধ দরকারী জিনিসের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম; আবশ্যক বোধ হোত আটা, ভাল ঘি, লবণ, লঙ্কা, আর কাঠ। আর বাঙ্গালী মানুষ অনেকদিন উপরিউপরি ডাল রুটির শ্রাদ্ধ কোরতে কোরতে এক এক দিন চাট্টি ভাতের জন্যে প্রাণ আকুল হোয়ে উঠ্‌তো, সুতরাং মধ্যে মধ্যে চাউলের খোঁজও যে না হোতো, এমন নয়। তার উপর যে দিন বড়ই নবাবী করবার প্রবৃত্তি হোতো, সে দিন গোটা দুই চারি "পেড়ার" (সন্দেশ) আয়োজন করা যেতো, কিন্তু এ রকম দুঃসাহস প্রকাশ কোর্ত্তে প্রায়ই ভরসা হোতো না—কারণ, সে সকল সন্দেশের জন্মদিন স্থির কোর্ত্তে হোলে বহুদর্শী প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতকে যত্নপূর্ব্বক ইতিহাস অনুসন্ধান কোর্ত্তে হয়; কত কীটই যে তার মধ্যে বাসা বেঁধে বংশানুক্রমে বাস কোরছে তার ঠিক নেই। এখানে যে কয়খান দোকান আছে, তার সকলগুলিতেই কিছু না কিছু খাদ্য দ্রব্যের যোগাড় থাকে, আর প্রত্যহ ছাগলের পিঠে বোঝাই দিয়ে অনেক জিনিসের আমদানীও হয়। আমাদের দেশে যেমন গাড়ী কি বলদ বা ঘোড়ার উপর জিনিসপত্র চাপিয়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, এ দেশে সে রকম হবার যো নেই। পাহাড়ে ঘোড়া হোক আর বলদই হোক, এই সকল দুর্গম পথে তারা বোঝা বইতে সম্পূর্ণ অশক্ত। একে পথ দুরারোহ, তার উপর এত সংকীর্ণ যে, বৃহৎকায় পশু সে সকল পথে চলা ফেরা কোরতে পারে না, আর যদিই বা তা সম্ভব হয় ত শীঘ্রই তারা হাঁপিয়ে পড়ে। ক্ষুদ্রকায়, কষ্টসহ ছাগল জাতিই এ পথের একমাত্র অবলম্বন এবং তাদের উপরই এ দেশের লোকের জীবন নির্ভর কোর্‌ছে। বাঙ্গালা দেশে যখন ছিলুম, তখন জানতুম, মা দুর্গার কাছে বলি দেওয়া ছাড়া ছাগলের ছাগজন্ম সার্থকের আর কোন পথ নাই, এমন কি ছাগমাংসে উদর পরিতৃপ্তির আশায় মুগ্ধ গুপ্ত কবি লিখে গিয়েছেন "এমন পাঁঠার নাম যে রেখেছে বোকা, শুধু সেই বোকা নয় তার ঝাড়ে বংশে বোকা।" উদর-

পরায়ণতার বশবর্ত্তী হয়েই তিনি রহস্যপূর্ব্বক মানবসন্তানকে লক্ষ্য কোরে উক্তপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ কোরেছেন। এতদ্ভিন্ন কবিরাজ মহাশয়ের বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত সেবনে দেহ পুষ্ট এবং ছাগদুগ্ধ পানে উদরাময় নিরাকৃত হয়, এরূপও শুনা গিয়াছে। এই জন্যই আমাদের দেশ ছাগবংশের প্রতি যা কিছু কৃতজ্ঞ, কিন্তু এই বরফরাজ্যে এসে দেখি ছাগলের দ্বারাই এখানে রেলওয়ের কাজ চোল্‌ছে এবং ছাগলই এ দেশের সুখসমৃদ্ধির কারণ হোয়ে রোয়েছে! প্রতিদিন কত ছাগলের পিঠে কত জিনিস চাপিয়ে পাহাড় হোতে পাহাড়ান্তরে নিয়ে যাওয়া হোচ্চে, কিন্তু কোন দিনও তাদের পদস্খলনের কথা শুন্‌তে পাওয়া যায় নি। তবে এরা যেমন ছোট জানোয়ার, তেমনি অল্প বোঝা বয়। বলিষ্ঠ ছাগলের পিঠেও দশ সেরের বেশী বোঝা চাপাতে দেখি নি, কিন্তু এরা তার চেয়েও ভারি বোঝা বইতে পারে। বোধ হয় অনেক দূর চোলতে হয় বোলে বোঝা লঘু করা হয়। আর যখন দলে দলে ছাগল এই কাজে লাগান হয়, তখন বোঝা ছোট হওয়াতে ব্যবসায়ীদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, বরং বেশী বোঝা দিলে যদি কোন ছাগল পথের মধ্যে অক্ষম হোয়ে পড়ে ত বিপদের কথা। এই সকল ছাগল যে শুধু এই তীর্থস্থানের ও হিমালয় প্রদেশের লোকের খোরাক বয় এমন নয়। ভোট ও তিব্বতের লোকেরাও লবণ প্রভৃতি তাদের প্রয়োজনীয় দুষ্প্রাপ্য জিনিস কেন্‌বার জন্যে দলে দলে ছাগল নিয়ে আসে। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং আষাঢ়ের কয়েকদিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন দলে দলে লম্বকর্ণ বৃহদাকৃতি ছাগল যাতায়াত করে। তারপর যখন বর্ষা নামে, তখন স্থানে স্থানে বেগবতী ঝরণা সকল হোতে অবিশ্রান্ত জল ঝরতে থাকে; পথও দারুণ পিলিচ্ছ হয়, তখন চলাচল এক রকম অসম্ভব হোয়ে উঠে। তার পরে শীতকাল—তখন ত বরফে রাস্তাঘাট সমস্তই একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, সুতরাং যা কিছু কেনা বেচা, তা এই ক মাসের মধ্যেই শেষ কোরে নিতে হয়।

বদরিনাথে একটী মন্দির আছে, মন্দিরটী দেখ্তে তত পুরাতন বলে বোধ হয় না ; তবে যে অল্পদিনের তাও নয়। মন্দিরের বাহিরে চার পাশে সামান্য একটা উঠান। এই উঠানের চারিদিকে একটা এক মহল ছোট চক, তাতে অনেক ছোট খাট দেবতার অধিষ্ঠান আছে। নারায়ণের সঙ্গে এই সকল দেবতার কোন পার্থিব সম্বন্ধ নেই, এগুলি পাণ্ডা ঠাকুরদের রোজগারের অবলম্বন মাত্র। নারায়ণের প্রাঙ্গণে যখন এদের স্থান হোয়েছে, তখন এরা মাহাত্ম্য অংশে নিতান্ত খাট নয়, এই হেতুবাদে পয়সাওয়ালা অনেক যাত্রী এই সকল বিগ্রহের মাথায় দুই এক পয়সা চড়ায় (অর্থাৎ প্রণামী দেয়)। মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করবার একটা দ্বার আছে, তার কবাট অতি প্রকাণ্ড। মন্দিরটি আমাদের দেশের মন্দিরের মতই। মন্দিরের গায়ে বিশেষ কোন কারুকার্য্য দেখলুম না ; আমাদের দেশের সাধারণ মন্দিরগুলি যে রকমের বৈচিত্র্য-বিহীন, এও তাই ; তবে দেবমাহাত্ম্যেই এর মাহাত্ম্য এত বেশী। উঁচুতে কালীঘাটের মন্দির চেয়েও খাট বলে বোধ হোলো, তবে এটি আগাগোড়া পাথরে গাঁথা—এ পাথরের রাজ্যে পাথরের উপর যে মন্দির নির্ম্মিত, তার পক্ষে এটা কিছু আশ্চর্য্য কথা নয়, বরং ইষ্টকনির্ম্মিত হোলেই একটু আশ্চর্য্য হবার কারণ থাকৃতো। এদিকে যত মন্দির দেখলুম, সকলগুলিই পাথরে গাঁথা।

মন্দিরটি জীর্ণ হোয়েছে ; কিন্তু উপরেই বোলেছি বাহ্যদৃশ্যে তেমন জীর্ণ বোলে বোধ হয় না। সকলের বিশ্বাস এ মন্দির শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত। এ কথা অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই, ইহা বহু প্রাচীন জনপ্রবাদ, এবং তার কতক প্রমাণও যে নেই এমন নহে। কিন্তু মন্দিরটি দেখ্লে কেহই বিশ্বাস কোরবেন না যে, এটী শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত, এমন আধুনিকের মত দেখায়! আমি প্রথমে একটু আশ্চর্য্য হোয়েছিলুম, কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম যে, মন্দিরটি বছরের মধ্যে আট ন' মাস বরফের নীচে ঢাকা থাকে, রৌদ্র বৃষ্টির সঙ্গে বড় একটা দেখাসাক্ষাৎ

হয় না, সুতরাং তার উপরের দিকে ময়লা ধরবার অতি অল্পই সম্ভাবনা। কিন্তু আর বেশী দিন বে-মেরামত অবস্থায় রাখা উচিত নয় ভেবে মন্দিরাধ্যক্ষ এর মেরামত আরম্ভ কোরছেন। তবে কত দিনে যে এই কাজ শেষ হবে, কখনও হবে কি না, তা ভবিষ্যৎ জ্ঞান না থাক্‌লে শুধু অনুমানের উপর নির্ভর কোরে বলা ভারি শক্ত। হয় ত মেরামত শেষ হোতে না হোতে আরও দুচার জন মোহন্তের জীবনকাল কেটে যাবে; কারণ একে ত বছরে দু'তিন মাসের বেশী কাজ হবার যো নেই, তার উপর যে রকম "গদাই লস্কর" ভাবে কাজ চোলচে, তাতে এক দিক গোড়ে তুল্‌তে আর একদিক ভেঙ্গে না পড়ে। হায় কলিকাল! স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা থাকতে নারায়ণের মন্দির মেরামতের জন্যে আজ কিনা সামান্য রাজমিস্ত্রীরা তাদের দুর্ব্বল হাতে ছোট ছোট পাথরের চাপ নিয়ে টানাটানি কোর্‌চে এবং যতটুকু কাজ কোরছে তার চেরে অনেক বেশী পয়সা ফাঁকি দিয়ে খাচ্ছে,— এদের নরকেও স্থান হবে না।

এখন পর্য্যন্তও অদৃষ্টে নারায়ণ দর্শন ঘটেনি; কিন্তু বাল্যকাল হোতে শুনে আস্‌ছি, বদরিকাশ্রমের নারায়ণের মূর্ত্তি পরশ-পাথরে নির্ম্মিত। স্পর্শমণি উপকথার বস্তু, এবং কল্পনা ও কবিতাতে কখন কখন তার শক্তি অনুভব করা যায় বটে, কিন্তু এই পৃথিবীতে যদি সে রকম একটা জিনিসের অস্তিত্ব থাক্‌তো, তা হোলে এই ঘোর জীবনসংগ্রামের দিনে অনেকের পক্ষে সুবিধার কথা ছিল। বাটাবিভ্রাটের ভয়টা ত কোমে যেতই, তা ছাড়া ইনকম্‌ট্যাক্সের জন্যও এতটা কষ্ট পেতে হোতো না, এবং অনাহারে থেকে ভদ্রতার দণ্ডস্বরূপ ঘটি বাটী বিক্রয় কোরে ট্যাক্স দেবার দায় হোতেও অনেকাংশে নিষ্কৃতি পাওয়া যেত। কিন্তু কবিতা ও কল্পনাতে যা মেলে, এ নিষ্ফলতার পৃথিবীতে তা কোথা হোতে মিল্‌বে? দেশে থাক্‌তে কতদিন শুনেছি, কখন ঠাকুরমার কাছে কখন বা বাচস্পতি মহাশয়ের বক্তৃতাতে যে,—হিমালয় পর্ব্বতে এমন

সব যোগী ঋষি আছেন, যাঁরা যোগবলে ভস্মকে কাঞ্চন এবং বিষকে অমৃত কোর্‌তে পারেন! কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ এ পর্য্যন্ত বিষের জ্বালা অনেক সহ্য কোল্লুম বটে, কিন্তু অমৃতের আস্বাদন ত বড় একটা হোলো না; তা হোলে বোধ করি আবার এ সংসারের কর্ম্মভোগের মধ্যে এসে পোড়তে হোতো না। তবে এটুকুও বলা যেতে পারে যে, অমৃতের আস্বাদন না পাই, এমন এক আধ জন সন্ন্যাসী দেখা গিয়েছে বটে, যারা সচ্চিদানন্দের করুণামৃত-ধারা পান কোরে জীবনকে কৃতার্থ কোরেছেন; কিন্তু তাঁদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করা ঘটে নি, তাঁদের স্বর্গীয় জ্যোতির সম্মুখে উপস্থিত হোলে সাংসারিক আসক্তি-পূর্ণ বাসনা ও চিন্তা ভস্মীভূত হোয়ে যায়। কিন্তু আমাদের পাপহৃদয়ে যে আশ্বাসবাণীর ঘোষণা হয় আমরা তার উপযুক্ত নই, সুতরাং দু'দিনের মধ্যে সে কুহকও অন্তর্হিত হোয়ে যায়। তখন বাস্তবিকই একটা অনন্ত যাতনায় প্রাণ আকুল হোয়ে উঠে, এবং কাতর হৃদয় বিদীর্ণ কোরেই স্বতই ধ্বনিত হয়—

"যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই, আপনার মন ভুলাতে,
শেষে দেখি হায়! ভেঙ্গে সব যায়, ধূলা হোয়ে যায় ধূলাতে।
সুখের আশায় মরি পিপাসায়, ডুবে মরি দুঃখ পাথারে,
রবি শশি তারা কোথা হয় হারা, দেখিতে না পাই তোমারে।"

রাত্রে শুয়ে হি হি কোরে কাঁপতে কাঁপতে কত কথাই ভাবতে লাগলুম। বৈদান্তিকের সুখ-নিদ্রাটা আমার কাছে নিতান্ত চক্ষুশূল বোলে বোধ হোচ্ছিল! বিশেষ যতক্ষণ ঘুম না আসে, চুপ কোরে পোড়ে আকাশ পাতাল চিন্তা করার চেয়ে ততক্ষণ কথা কহাতে বোধ করি একটু বেশী আরাম আছে; কিছু না হোক কথাবার্ত্তায় শীতের প্রকোপটা অনেক কম বিবেচনা হয়। অতএব বৈদান্তিকের ক্লান্তিহর নিদ্রাটুকু বিনষ্ট কোর্ত্তে মনে কিছুমাত্র দ্বিধা উপস্থিত হোলো না। কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাতে বৈদান্তিক বোধ করি আমার প্রতি কিঞ্চিৎ উষ্মাযুক্ত হোয়ে-

ছিলেন, কিন্তু আমি তাঁকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লুম "আচ্ছা নারায়ণের দেহ যে পরশ-পাথরে নির্ম্মিত বলে, এ কথাটার অর্থ কি? আমি ত অনেকক্ষণ ভেবে কিছুই ঠাহর কোর্ত্তে পাল্লুম না, সত্যি সত্যি পরশ পাথর ত আর নেই!"—আশু তর্কের একটা সুন্দর সম্ভাবনা দেখে ভায়ার নিদ্রা ও বিরক্তি দুইই এককালে দূর হোয়ে গেল! তিনি সোৎসাহে পার্শ্বপরিবর্ত্তন কোরে বলতে লাগলেন যে, পরশ পাথর কথাটার অর্থ নিয়েই আমি গোল কচ্ছি। আমাদের দেশের সকল বিষয়েরই এক একটা নিগূঢ় অর্থ আছে—যাকে আজকাল অমারা আধ্যাত্মিক অর্থ বলে থাকি, এবং বৈদান্তিকের মতে কেহ কেহ তার প্রতি অন্যায় কটাক্ষপাতও কোরে থাকেন। বোধ হয় তিনি আমার উপর কঠাক্ষ কোরেই কথাটা বোল্লেন, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে তিনি গুরু আমি শিষ্য, সুতরাং কোন রকম উচ্চবাচ্য না কোরে শুন্‌তে লাগলুম। তিনি অর্দ্ধরাত্র ব্যাপী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা যা বুঝালেন তার মোদ্দা-খানা এই যে, পরশ-পাথরের গূঢ় অর্থ ধর্ম্ম। কারণ, কল্পিত পরশ-পাথর স্পর্শে যেমন লোহা সোণা হোয়ে যায়—তেমনি ধর্ম্মের সংস্পর্শে তুচ্ছ দ্রব্যও মূল্যবান হয়, এবং যা নিতান্ত মলিন, তাও উজ্জ্বল ও তেজোময় হোয়ে উঠে; লোক তখন তা আগ্রহভরে কণ্ঠে ধারণ কর্‌বার জন্য ব্যাকুল হয়। নারায়ণের দেহ পরশ পাথরে নির্ম্মিত, তার অর্থ কিনা তিনি ধর্ম্ম স্বরূপ; তাঁকে স্পর্শ করা দূরের কথা, দর্শন মাত্র মানুষ খাঁটী সোণা হয়ে যায়। পাপ মনকে যে স্পর্শমণি নিষ্পাপ পবিত্র কোরে তুল্‌তে পারে—লোহাকে তুচ্ছ সোণা করার পরশমণি তার কাছে কোথায় লাগে?

স্বীকার কোর্‌তে লজ্জা নেই, বাস্তবিকই বৈদান্তিক ভায়ার এই বক্তৃতা আমার অতি মিষ্ট লেগেছিল। এমন একটা সার কথা তাঁর কাছে হোতে আমি মুহূর্ত্তের জন্যও প্রত্যাশা করি নি; কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমার হৃদয়ে আর একটা নূতন চিন্তার উদয় হোলো—হায়! দেবতার

পদতলে এসেও আমার এই জীবনব্যাপিনী চিন্তা দূর হয় নি! আমার মনে হোলো—এ সংসারে রমণীহৃদয়ই একমাত্র স্পর্শমণি! দেবতার মহিমা যেখানে প্রবেশ কোর্‌তে অক্ষম, সেখানেও সে আপনার উজ্জ্বল মহিমা বিকাশ করে, এবং পুরুষের কঠোর হৃদয়কেও পুণ্যময় ও পবিত্র কোরে তোলে। আমার একখানি স্পর্শমণি ছিল, হঠাৎ তা হারিয়ে ফেলেছি। দেখি যদি হিন্দুর এই মহাতীর্থে আর একখানি স্পর্শমণির সন্ধান পাই—যাতে এই পাপভারনত ধূলিম্লান জীবনকে সজীব, উজ্জ্বল ও পবিত্র কোরে তুলতে পারে!

বদরিকাশ্রমে নারায়ণ দর্শন

বৈদান্তিকের কথার পর আমার কিঞ্চিৎ নিদ্রাকর্ষণ হোলেও অতি সকালেই জেগে উঠেছিলুম। কোন স্থানে উপস্থিত হোলে অনেক সময়ই রাত্রে ঘুম তত গভীর হয় না এবং সকালে সহজে নিদ্রাভঙ্গ হোলে প্রাণের মধ্যে যেন একটা অভাব অনুভব হয়। মনে পড়ে ছেলে-বেলায় যে দিন বিদেশে যাই, তার পরদিন নিদ্রাহীন প্রভাত কেমন অপ্রসন্ন এবং স্নিগ্ধতাহীন বোলে বোধ হোয়েছিল। তারপর আরও কত বিদেশে বেড়ালুম, এই শেষের কয় বৎসর ত নিত্য নূতন বিদেশ, প্রভাতে উঠেই প্রাণের মধ্যে একটা অভাব অনুভূত হোলো কেন? একি মায়া? মায়াবাদের উর্দ্ধে যাঁহার অবস্থান, তাঁহার পুণ্যমন্দিরের দ্বারেও মায়ার প্রভাব!

যা হোক সে জন্য দেবতার প্রতি আমার অভক্তি হয় নি। শঙ্করা-চার্য্যের সমুজ্জ্বল প্রতিভা মানব মস্তিষ্ককে বিস্মিত কোরেই ক্ষান্ত হয় নি; তাঁর ধর্ম্মানুরাগ, অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে শৃঙ্খলাসাধনের জন্য যত্ন,

মানবজাতির প্রতি অপক্ষপাত সহানুভূতির পরিচয়, এই মন্দিরে সগর্ব্বে বহন কোর্‌চে। এখানে এসে সর্ব্বপ্রথমেই আমার হৃদয়ে যে সুপবিত্র মহৎ গীতটি ধ্বনিত হোলো, অনেক দিন আগে কলিকাতার আদি ব্রাহ্ম-সমাজের এক বার্ষিক অধিবেশনে কোন শ্রদ্ধেয় গায়কের কণ্ঠে তা গীত হোতে শুনেছিলুম। সে দিন ১২ই মাঘের প্রভাত, বাহিরে সমুজ্জ্বল সূর্য্য-কিরণ এবং প্রভাতের তুষার-শীতল বায়ু-প্রবাহ, কিন্তু মণ্ডপের মধ্যে শত শত সহৃদয় ভক্তের সমাগম হোয়েছিল। তাঁরা সংযত হৃদয়ে সচ্চিদানন্দের উপাসনায় মগ্ন; অন্য দিকে উচ্ছ্বাসময়ী ভাষায় ধ্বনিত হোচ্ছিল,—

'গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে
সকল বনরাজি ফুটন্ত জ্যোতি রে;
কেমন আরতি হে ভবখণ্ডন তব আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে।"

দেবমন্দিরের চারিপার্শ্বে যে পুণ্য ও পবিত্রতা বিস্তৃত আছে, তাই আমাদের অনেক উর্দ্ধে নিয়ে যেতে পারে; কিন্তু তীর্থস্থানের দুরদৃষ্ট, বদরিকাশ্রম ভিন্ন আর কোথায়ও এ পবিত্রতা, শান্তি ও স্নিগ্ধভাব আছে কি না জানি না; আমি ত অনেক দিনই অনেক স্থান হোতে অপূর্ণ হৃদয়ে সোরে গিয়েছি। আমার হৃদয় শুষ্ক, ভক্তিহীন, হয় ত ঠিক ভাব গ্রহণ কোর্ত্তে পারি নি। যে সকল দৃশ্যে অনেকে মুগ্ধ হয়, আমার চঞ্চল হৃদয়ের ভিতর হয় ত তার বিশেষ কিছু মাধুরী এবং মহান্ ভাব ধারণা কোর্ত্তে পারি নি; তাই বুঝি আশা ব্যর্থ হোয়েছে। কিন্তু যে দৃশ্য দেব-মন্দিরে সর্ব্বদা দেখা যায়, তাতে শুধু আমি কেন, অনেকেই ব্যর্থমনোরথ হন। হয় ত কোথায় খর্পরাঘাতে ছাগ-শিশুর মস্তক রক্তসিক্ত হোয়ে

ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, কতকগুলি নির্দ্দয় কো রাক্ষসের ন্যায় নৃত্য কোর্‌ছে, আর কেহ কেহ ভক্তিভরে "মা মা" কার কোচ্ছে। এই সকল ভয়ানক দৃশ্যের মধ্যে ভক্তি যে কিরূপে অব থাকে, তা বুঝে উঠা আমাদের সাধ্য নয়। আবার কোথায় বা ত রকম মন্দ লোক দল বেঁধে একটা মহা হট্টগোল আরম্ভ কোরেছে; সে সকল জায়গায় পিতৃ-পিতামহের শ্রাদ্ধ হোতে আরম্ভ কোরে পরবর্ত্তী তিন লাখ তেষট্টি হাজার বংশধরকে স্বর্গে পাঠানর অতি সহজ ব্যবস্থা হোচ্ছে; যেন কোন রকমে সংসারের কাজ শেষ কোরে স্বর্গে প্রবেশ কোর্ত্তে পাল্লেই মানব জন্ম সার্থক হোলো। এখানে কিন্তু তার কিছু সূচনা দেখা গেল না; যেন এখানে অনুষ্ঠান আছে, তার উপ বে নেই; মাতৃস্নেহ আছে, পুত্রের ভক্তিরও অভাব নেই; সকল ভাব, বহুকালের উন্নত কল্পনা, এখানে যেন জমাট বেঁধে তার উপর একটা সুমহান্ দেবমহিমা প্রতিষ্ঠিত কোরে রেখেছে। সেই মহিমা অনুভব কোরে আমরা পরিতৃপ্ত হোয়ে যাই, জীবনকে ধন্য বোলে মনে হয়। দেব-মন্দির ও দেবতা পাষাণময়, কিন্তু যুগান্ত প্রবাহিত ভক্তি, প্রেম ও পবিত্রতায় তা সম ন হোয়ে উঠেছে; দেব-মন্দির ও দেবতা অপেক্ষাও তাঁদের প স্মৃতি অধিক সৌভাগ্যময়।

ক্রমে পূর্ব্বদিক পরিষ্কার হোলে আমার দেবদর্শনস্পৃহা বলবতী হোয়ে উঠ্‌লো। প্রত্যূষে বোধ হোলো, কে যেন স্নিগ্ধ রাগিণীতে সন্তোষ ও সম্ভ্রমময় আগ্রহ ঢেলে দিচ্ছে; সেই ললিত মধুর শব্দ পৃথিবীর বাদ্যযন্ত্র হোতে ধ্বনিত হয় না; সেই মঙ্গলবাদ্য পৃথিবীর শোক-সন্তপ্ত, দুঃখভারাবনত, পাপক্লিষ্ট পথিকের কর্ণে অভিনন্দন সঙ্গীতরূপে প্রতীয়মান হয়।

৩০ মে শনিবার,—সূর্য্যোদয় হোলো। অত্যন্ত ব্যস্ত হোয়ে নারায়ণ দর্শন কোর্ত্তে বের হোয়ে পড়লুম; কিন্তু শুনলুম, বেলা আটটার আগে মন্দিরের দ্বার খোলা হয় না, কাজেই কিয়ৎক্ষণ এদিক্ ওদিক্ বেড়াতে

লাগলুম। মন্দিরের চকের বাহিরে একটা ক্ষুদ্র ঘরে ডাকঘর বোসেছে। এটী সাময়িক পোষ্ট আফিস; যাত্রীর যাতায়াত বন্ধ হোলে এ পোষ্টআফিসও বন্ধ হবে। ডাকঘরে টিকিট খাম পোষ্টকার্ড প্রভৃতি দরকারী সকল জিনিসই পাওয়া যায়। পোষ্টমাষ্টারটি গাড়োয়ালী; দিব্য গৌরবরণ, গোলগাল চেহারা এবং মাথায় এক বিকট পাগড়ী; লোকটা লেখাপড়া অতি সামান্য জানে; ইংরাজী নাম ও ঠিকানাগুলো কোন রকমে পোড়তে পারে। আমি খানকতক পোষ্টকার্ড কিনে দেশে চিঠি লিখতে প্রস্তুত হলুম। শীতে হি হি কেরে কাঁপচি আর বহু কষ্টে অঙ্গুলির আগা বের কোরে কোন রকমে কলম ধোরে বাঙ্গালা দেশে এই পোষ্টকার্ড ক'খানী লিখচি। এই কার্ডখানি পাঁচ সাত দিন পরে হয় ত বঙ্গের একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে একটী সামান্য পরিবারে একজন প্রবাসীর সুস্থ সংবাদ পৌঁছাবে কিঞ্চিৎ হর্ষ ও শান্তি আনবে, কিন্তু কেহ কি এক বারও ভাব্‌বে কত অলিখিত প্রবাস-কাহিনীতে ঐ পোষ্টকার্ডের উভয় পৃষ্ঠা পূর্ণ হোয়ে গেছে। প্রবাসীর মনে এ কথা অনেক সময় উদয় হোলেও বোধ হয় গৃহজীবী তাঁর সংসার চিন্তার মধ্যে একথা ভাব্‌বার অবসর পান না।

পত্র লিখে যখন বাইরে এলুম, তখন শুনা গেল মন্দির-দ্বার উদ্ঘাটিত হোয়েছে। স্বামীজী ও বৈদান্তিক আমার সঙ্গে আসেন নি, সুতরাং তাঁদের ডেকে এনে একসঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ কোরবো ইচ্ছা কোল্লুম। কত দিন হোলো এক অভীষ্ট লক্ষ্য করে আমরা কোন দূরবর্ত্তী রাজ্য হোতে যাত্রা কোরেছি, আমরা পরস্পরের জীবনের অবিচ্ছিন্ন অবলম্বন; জীবনের উপর দিয়ে কত বিপদ চলে গেছে, সে স্রোতবেগে আমরা বিচ্ছিন্ন হই নি আজ এই পরম আনন্দের দিনেও একত্র হোয়ে যাই। কিন্তু অধিকদূর যেতে হোলো না, মন্দিরের কাছেই তাঁদের দুজনের সঙ্গে দেখা হোলো; তখন তিন জনে মহা হর্ষে মন্দিরে প্রবেশ করা গেল! আমার মনের মধ্যে কেমন একটা নূতন ভাবের সঞ্চার হোলো।

চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হোলো। মূর্ত্তি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পাথরে

প্রস্তুত ; বিগ্রহের গায়ে বহুমূল্য অলঙ্কার। অলঙ্কার ...য়ণকে আপাদ-মস্তক ঢেকে ফেলেছে। সেই মণিমুক্তাহীরকাদি জড়িত হেমাভরণের মধ্যে হোতে এমন একটা উজ্জ্বল স্নিগ্ধ শ্যামকান্তি বিকসিত হোচ্ছিল, তা দেখ্‌লে মনে বাস্তবিকই বড় আনন্দের সঞ্চার হয়। নারায়ণের শরীরস্থ মণিমুক্তাদির জ্যোতিতে গৃহ আলোকিত। পূর্ব্বে গল্প শুনেছিলুম, ভাদ্র মাসে যে দিন মন্দির দ্বার বন্ধ হয়, সে দিন মন্দির মধ্যে যে প্রদীপ জ্বেলে রাখা হয়, বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত অর্থাৎ এই নয় মাসকাল অনবরত তা জল... থাকে ; আর যে সমস্ত নৈবেদ্য কোরে দেওয়া হয়, এ দীর্ঘকালেও তা নষ্ট হয় ... যেমন তেমনি থাকে। এই শেষের কথাটি সত্য হোতে পারে, কারণ ঠিক নয় মাস বদরি-নারায়ণের মন্দির বরফের তলে থাকে। বরফের মধ্যে নিহিত থাকাতে তা নষ্ট হয় না ; কিন্তু আগের কথাটীর যাথার্থ্য সম্বন্ধে তেমন বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না। যদি মনে করা যেত, সেই প্রদীপ এমন সুবৃহৎ যে তাতে নয় মাস দিনরাত্রি জ্বলবার উপযুক্ত তৈল দিয়ে রাখা হয়, তাই জ্বলবার পক্ষে আর কোন বাধা থাকে না ; কিন্তু তাতেও বিজ্ঞান প্রতিবাদী। বরফের দ্বারা এইরূপ বদ্ধ স্থানে আলোক অচিরাৎ নির্ব্বাণ হয় ; দেবতা স্বয়ং চেষ্টা কোরেও অগ্নির এই দৌর্ব্বল্যটুকু বোধ করি দূর কোরে দিতে পারেন না। যা হোক যখন সেই মন্দিরস্থিত ক্ষুদ্র প্রদীপটি দৃষ্টিগোচর হোলো, তখন সমস্ত বিবাদ খণ্ড হোয়ে গেল। এ যুক্তির দিনে আমাদের অগত্যা বিশ্বাস কোর্‌তে হোলো, মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ মণিমুক্তা এবং হীরকস্তূপই মন্দিরের মধ্যভাগ দীপালোকের ন্যায় উজ্জ্বল রাখে। বিশেষ যে দিন নারায়ণের দ্বার বন্ধ হয়, সে দিন জ্যোতির্ম্ময় অলঙ্কারগুলি নারায়ণের শরীরে পরাইয়া দেওয়া হয় ; তাদের আলোতেই মন্দিরের মধ্যভাগ অধিক আলোকিত হয়। তার পরে যেদিন প্রথম দ্বার খোলা হয়, সে দিন অনেক সন্ন্যাসী উপস্থিত থাকে। দ্বার খোলবা মাত্র তারা মন্দিরের মধ্যে এই অলঙ্কারের জ্যোতিঃ দেখ্‌তে পায়, সুতরাং মনে করে প্রদীপ জ্বালা আছে ! নারায়ণের দেহ

পরশ পাথরে নির্ম্মিত বোলে যে প্রবাদ আছে, বৈদান্তিকের মতে তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা থাকলেও আমার বোধ হোলো নির্জ্জন দেবালয়ের দেবতা যে বরফরাশির মধ্যে আপনার নিভৃত সিংহাসন স্থাপন কোরেছেন, সেখানে এত হেমাভরণ, স্তূপাকার মণিমুক্তার উজ্জ্বল বিকাশ দেখে সাধারণে বিশ্বাস কোরে নিয়েছে, দেবতার দেহ পরশমণি-নির্ম্মিত!

যা হোক বদরিনারায়ণের এই বহু মূল্যবান অলঙ্কার প্রাচুর্য্য দেখে আশ্চর্য্য হবার কোন কারণ নেই। আমাদের দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য বিগ্রহ-দেরই কত লোকে কত মূল্যবান অলঙ্কারাদি উপহার দেয়। বদরিকাশ্রম ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ; বদরিকাশ্রমের নারায়ণের মহিমা নিখিল দেব-মহিমার উপরে, সুতরাং নানা দেশ-বিদেশের রাজগণ বদরিনাথকে কত মূল্যবান দ্রব্য উপহার দিয়েছেন তার সংখ্যা নেই। তার উপর গাড়োয়াল যখন স্বাধীন ছিল, তখন গাড়োয়ালের রাজা প্রায়ই নারায়ণকে বহুমূল্য অলঙ্কারাদি উপহার দান কোরেছেন।

মন্দির মধ্যে দেখলুম, শুধু নারায়ণ একা নেই, আরও দুচারটি অতিথি অভ্যাগত বিগ্রহ আছেন; কিন্তু তাঁরা নারায়ণের উজ্জ্বল প্রভায় কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ হোয়ে পোড়েছেন! তাঁদের দিকে দৃষ্টিও সহসা আকৃষ্ট হয় না। আমাদের সঙ্গে আরও অনেক যাত্রী মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ কোরেছিল; আমার হৃদয়ে যত ভক্তির না উদ্রেক হোক, এই সকল সমাগত যাত্রীদের ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখে আমি মোহিত হোয়ে গেলুম, আমার হৃদয়ে এক স্বর্গীয় ভাবের উদয় হোলো। আমার কাছেই একটী বৃদ্ধা দাঁড়িয়েছিল; সে বড় কষ্টে নারায়ণ দর্শন কোর্ত্তে এসেছে। পা একেবারে ফুলে গিয়েছে, দাঁড়াবার শক্তি নেই, তবুও প্রাণপণ শক্তিতে একবার দাঁড়িয়ে নারায়ণের শ্রীমুখ নিরীক্ষণ কোরচে; তার মুখে এমন উজ্জ্বল প্রফুল্ল ভাব, চক্ষে এমন নিস্পন্দ সতৃষ্ণ দৃষ্টি এবং একাগ্রতা যে, বোধ হোলো শারীরিক যন্ত্রণার কথা একটুও তার মনে নেই। তার যেন মনের ভাব, তার সকল কষ্ট দুঃখ এবার

সার্থক হোয়েছে। বৃদ্ধার সঙ্গে একটি বয়স্ক পুত্র ও একটি বিধবা কন্যা। আমরা যে দিন বদরিকাশ্রমে পৌঁচি, এরাও সেদিন এখানে এসেছিল। বৃদ্ধা অনেকক্ষণ নারায়ণ দর্শন কোরে শেষে ভক্তিভরে প্রণাম কোল্লে। তারপর পুত্রটীর দিকে চেয়ে বোল্লে "বেটা, জনম সফল কর্ লিয়া।" সেই কথা-কয়টির মধ্যে যে কত আনন্দ তা বর্ণনাতীত। ছেলেটি মার কথায় ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে নতজানু হোয়ে মায়ের পদধূলি গ্রহণ কোল্লে, মাও আস্তে ব্যস্তে জীবনের অবলম্বন ছেলেটিকে বুকের মধ্যে টেনে নিলে। এদৃশ্য স্বর্গীয়; আমাদের সকলের চোক দিয়ে জল পোড়তে লাগলো। পুত্র মায়ের প্রতি কর্ত্তব্যের এক অংশ সম্পূর্ণ কোরে অতুল আনন্দ বোধ কোর্‌লে, এবং মায়ের স্নেহপূর্ণ বুকের মধুর শান্তির মধ্যে স্থান পেয়ে হয় ত সে মনে কোল্লে, তার অপার্থিব পুরস্কার হোয়ে গেল। হায়, মাতৃহীন আমি—আমি মর্ম্মে মর্ম্মে মাতার অভাব অনুভব কোল্লুম।

তারপর আমরা ধীরে ধীরে মন্দির হোতে "তপ্তকুণ্ড" দেখ্‌তে চোল্লুম। মন্দিরের বাহিরে একটু নীচেই একস্থলে ছোট পাথর দিয়ে বাঁধান জল রাখবার একটা অনতিবৃহৎ চৌবাচ্চা নির্ম্মিত আছে; তার গভীরতা বেশী নয়। নারায়ণের মন্দিরের নীচে দিয়ে তার এক পাশে একটা ক্ষুদ্র ঝরণা এসে পোড়েছে। এ ঝরণার জল ভারি গরম; এত গরম যে তাতে স্নান চলে না। তাই পাণ্ডারা উক্ত চৌবাচ্চায় সেই ঝরণার জল এনে ফেলেছে, আর একদিক দিয়ে এক ঠাণ্ডা জলের ঝরণাও তার মধ্যে এসে মিশেছে, এবং এই দুই জল একত্র মিশে স্নানের উপযুক্ত ঈষদুষ্ণ জলে পরিণত হোয়েছে। এই স্থানটির চারিপাশে পাথরের স্তম্ভ দিয়ে উপরে ছাদ তৈয়ারী করা হোয়েছে। অনেকেই এখানে স্নান কোচ্ছেন দেখলুম, আমারও স্নান কর্‌বার বড় ইচ্ছা হোলো। গায়ের কাপড় চোপড় খুল্‌ছি, স্বামীজী তাড়াতাড়ি আমাকে নিষেধ কোল্লেন; আমি তাঁকে বোল্লুম, এ গরম জলে স্নান করায় এমন কি আপত্তি হোতে পারে? তিনি বোল্লেন

স্নান করায় ক্ষতি না হোতে পারে, কিন্তু গায়ের কাপড় খুলে শরীর অনাবৃত করাতে বুকে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগ্‌তে পারে। তাঁর কঠোর শাসনে অগত্যা আমাকে স্নান বন্ধ কোর্‌তে হোলো, কিন্তু বৈদান্তিক ভায়া নিরঙ্কুশ; তিনি গায়ের কাপড় চোপড় খুলে দিব্য স্নান কোর্ত্তে লাগ্‌লেন। তাঁর সেই সজোরে গাত্রমার্জ্জন এবং মৃদু হাস্যের অর্থ আমি বুঝলাম যে "তোমরা কোন কাজের লোক নও। অতি সাবধান হোয়ে সর্ব্বত্র নিষেধ-বিধি মান্‌লে জীবনের অনেক সুখভোগ হোতে বঞ্চিত থাক্‌তে হয়।"

বৈদান্তিকের স্নান প্রায় শেষ হোয়েছে এমন সময় মোহান্ত মহারাজ আমাকে ডেকে পাঠালেন। ইনি সেই যোশীমঠের মোহান্ত, নারায়ণের সেবার ভার এখন ইঁহারই উপর ন্যস্ত আছে। একটি কথা বোল্‌তে ভুলে গিয়েছি। এই মন্দির বন্ধ হোলে তার চাবি মোহান্তের কাছে থাকে না; গাড়োয়ালের রাজার (এখন তিহরীর রাজা) এ মন্দির; তাঁরই কর্ম্মচারিগণ এসে মন্দিরের দ্বার খুলে জিনিসপত্র বুঝে পোড়ে নিয়ে যান, আর বন্ধের পূর্ব্বে এসে সমস্ত বুঝে নিয়ে চাবি বন্ধ কোরে চোলে যান; অবশ্য জিনিস-পত্র যে তাঁরা স্থানান্তরিত করেন তা নয়, সমস্তই মন্দিরের মধ্যে থাকে, তবে তাঁরা একবার পরীক্ষা কোরে দেখেন মাত্র। এতদ্ভিন্ন বৎসর বৎসর যে লাভ হয় তা মোহান্তেরই প্রাপ্য। মোহান্ত আমাকে কেন ডাক্‌লেন, তা বুঝতে পার্‌লুম না; স্বামীজিকে আমার সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ কল্লুম, কিন্তু তিনি কোথাও যাওয়া পছন্দ করেন না, সুতরাং আমি একা চল্লুম। একটা বড় ঘরের ভিতরে একটা উঁচু গদীর উপর কতকগুলি তাকিয়ার মধ্যে স্থূলদেহ মধ্যবয়সী মোহান্ত মহারাজ বোসে আছেন, চারিদিকে ফরাসের উপর অন্যান্য লোক আছে; কেহ বাক্স সম্মুখে নিয়ে বোসে আছে, কারও কাছে কতকগুলি খাতাপত্র, কেহ নিস্পরোয়া ভাবে ধূমপান কোচ্ছে, দুই চার জন লোক এক পাশে বোসে খোসগল্প আরম্ভ কোরে দিয়েছে। মনে কোরেছিলুম, বুঝি বিভূতিভূষিত-অঙ্গ ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন, কমণ্ডলুধারী রুদ্রাক্ষ-

শোভিত যোগীবরকে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে উপবিষ্ট দেখবো, চারিদিকে পূজার্চ্চনার দ্রব্য এবং সংযত ও ধর্ম্মালোচনাতৎপর বিনীত শিষ্যমণ্ডলী দেখা যাবে। কিংবা ইনি নারায়ণের সেবাইত; বিভূতি-ব্যাঘ্রচর্ম্ম-রুদ্রাক্ষ-পরিবেষ্টিত যোগী না দেখি, বৈষ্ণবের মত একটা মানুষ নিশ্চয়ই দেখ্‌তে পাবো; কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বোল্‌তে হচ্চে, সে আশায় ভারি নিরাশ হলুম! মোহান্তের আফিসে উপস্থিত হয়ে যে দৃশ্য দেখ্‌লুম, বড়বাজারের কুঠীয়াল কি মাড়োয়ারী মহাজনের গদীর সঙ্গেই তার তুলনা হোতে পারে। একটু সম্ভ্রম, একটু বিনয়—কোন ভাব এখানে নেই; যেন ধর্ম্ম কর্ম্ম শুধু ভাণ মাত্র, ব্যবসা করাই এ সমস্ত অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। দেবতার দ্বারেও হৃদয়ের দেবভাব অপেক্ষা অর্থের খ্যাতি, অর্থের সম্মান, প্রেম ভক্তি বিনয় প্রভৃতি অধিক। যেখানে অপার্থিব দেবমাহাত্ম্যের উপর তুচ্ছ সংসারের কোলাহল এবং হীনতা প্রতিষ্ঠিত, সেখানে দেবমর্য্যাদা বিড়ম্বিত।

আমি মোহান্তের সম্মুখে উপস্থিত হবা মাত্র "আইয়ে বাবু সাব" বোলে মোহান্ত অভিবাদন কল্লেন। সকলেই সরে সরে আমার জন্য একটা যায়গা কোরে দিলে। আমি মোহান্তের অনুরোধক্রমে একপাশে উপবেশন কল্লুম; মোহান্ত মহারাজ গল্প কোর্ত্তে লাগলেন। তাঁর গল্পে বাজে কথাই বেশী, ধর্ম্মপ্রসঙ্গসম্বন্ধে তাঁর তেমন আগ্রহ দেখলুম না, বরং সে সম্বন্ধে কিছু বোল্লে তিনি কৌশলক্রমে কথাটা উল্‌টে দিতে চেষ্টা করেন। সুতরাং অন্যান্য স্থানের মোহান্তেরা যে শ্রেণীর লোক, ইনিও যে সে শ্রেণীর বেশী উপরে, তা মনে কর্‌বার বিশেষ কোন কারণ দেখ্‌লুম না। যোশীমঠসম্বন্ধে কথা হোলে তিনি এই বোল্লেন, উক্ত মঠ শঙ্করাচার্য্য স্বামীরই প্রতিষ্ঠিত। যোশীমঠে দু' চারি খানি পুস্তক আছে, তার কোন কোনখানি পাঠোপযুক্ত এবং তা হোতে অনেক পুরাতন সত্য সংগ্রহ করা যেতে পারে, কিন্তু সে জন্য কষ্ট স্বীকার করে এমন লোক প্রায়ই দেখা যায় না; সুতরাং পুস্তকগুলিতে যে সত্য সংগুপ্ত আছে, তা শীঘ্রই চিরবিলীন হোয়ে যাবে। মোহান্তের

কাছে যে বিশেষ কিছু প্রত্যাশা নাই, তা তাঁর কথার ভাবেই বুঝতে পাল্লুম।

এই সমস্ত কথাবার্ত্তা শেষ হোলে তিনি আমাকে ডাকবার কারণ বোল্লেন। তিনি বোল্লেন যে, মন্দিরটি জীর্ণ হোয়ে গেছে; এখন হোতে যদি জীর্ণ-সংস্কার না করা হয়, ত হিন্দুর একটী প্রধান কীর্ত্তি লোপ হবে। তাই তিনি জীর্ণ-সংস্কারের কাজ আরম্ভ কোরে দিয়েছেন; কিন্তু এই কাজে বহু অর্থের প্রয়োজন, বিশেষ এদিকে তেমন বড় লোক বেশী আসেন না, অন্য লোকের দৃষ্টি নেই, সুতরাং মোহান্ত মহাশয়ের ইচ্ছা ছোট বড় সকলের কাছে চাঁদা সংগ্রহ কোরে হিন্দুর এই তীর্থকে বজায় রাখেন। এ সমস্ত কথা মোহান্ত একা বোল্লেন না, তাঁর মোসাহেবেরাও অনেক কথা বোল্লেন। সমস্ত কথা শেষ হোলে মোহান্ত মহাশয় একখানি চাঁদার খাতা বের কোল্লেন, এবং হাতে দিলেন। আমি খাতাটি উল্‌টে পাল্‌টে দেখে মোহান্তের হাতে ফেরত দিলুম, এবং আমার দীনতা জানিয়ে বোল্লুম, আমার অবস্থানুসারে যথাযোগ্য দিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু আমার কাছে যে কিছু টাকাকড়ি আছে তা অতি সামান্য, তা এই দীর্ঘ পথের পাথেয় হিসাবেই যথেষ্ট নয়,—সুতরাং তা হোতে কিছু দান খয়রাত করা যায় না; তবে শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরের একখানা পাথর গাঁথবার খরচের যদি সাহায্য কোর্ত্তে পারি তা হোলেও আমার অর্থ সার্থক! আমি পাঁচটি টাকা দিলুম। মোহান্ত মহাশয় বল্লেন, "পারসী হরফমে মৎ লিখিয়ে, আংরেজিমে দস্তখত কর দেনা" তিনি মনে কোরেছিলেন, আমি যখন বাবু তখন আমি ইংরাজী ফার্সি উভয় বিদ্যাতেই পারদর্শী। কিন্তু আমি ত আর ফার্সি জানিনে, আমি বল্লুম নাগরীতে দস্তখত করি, কিন্তু এ কথা মনে মোহান্ত ব্যস্তভাবে বোল্লেন "নেহি নেহি বাবু, আংরেজী লিখনেসে দস্তখৎ কি কদর যাস্তি হোগা।" বুঝলুম ইংরাজী দস্তখতের মান বেশী। মোহান্তের এই এক কথাতে আরও অনেক

বিষয় বুঝতে পাল্লুম। ইংরাজীতেই নাম সই কোরে সেখান হোতে সের হোলুম।

ব্যাসগুহা

৩০ শে মে, শনিবার—মন্দির মেরামতের জন্য পাঁচটাকা দান কোরে এবং সেই দানের কথা ইংরাজী অক্ষরে নাম সহি দ্বারা খাতাভুক্ত কোরে, বদরিনাথের প্রধান পাণ্ডা—মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের শ্রেষ্ঠতম প্রতিধ্বনির নিকট হোতে বিদায় গ্রহণ কোল্লুম। সে সময়ে মনে একটা বড় আক্ষেপ জেগে উঠেছিল। কোথায় সেই জ্ঞান এবং ধর্ম্মের অবতার, মহাপণ্ডিত, নরদেবতা শঙ্করাচার্য্য—আর কোথায় ঘোর সংসারী, বিষয়াসক্ত, পাণ্ডিত্য-হীন, ব্যসননিরত এই সর্দ্দার পাণ্ডা। মহান্ হিমালয়ের অভ্রভেদী উচ্চতা হোতেও সমুচ্চ মহত্ত্ব ও জ্ঞান একদিকে, আর একদিকে ক্ষুদ্র ধূলিকণা হোতেও ক্ষুদ্রতর এই পাণ্ডাপুত্রটির আত্মাভিমান এবং ক্ষমতাদর্প ; এ দুয়ের মধ্যে তুলনা হয় না, কিন্তু তবু উভয়ের অবস্থান তুলনার উপযোগী। বাস্তবিক যাঁর উৎসাহের তেজে পৃথিবীপ্লাবিত বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হোতে নির্ব্বাসিত হোয়েছিল, হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারে বদ্ধপরিকর হোয়ে যিনি সমস্ত হিন্দুজাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হোয়ে গেছেন, এবং সকলের অশান্ত আকুল হৃদয় গভীর আশাভরে যাঁর উপর নির্ভর কোরে শান্তিলাভ কোরেছিল, সেই শঙ্কর ও তাঁর এই পাণ্ডা, এ উভয়ে এক জাতীয় জীব তা বিশ্বাসই হয় না। শঙ্করা-চার্য্যের দুর্ভাগ্য—এরা সকলে তাঁর আসন কলঙ্কিত কোরচে। এই স্থানের সম্বন্ধে পরে যে সকল কথা শুনেছি, তা আর কাগজে কলমে লেখা যায় না এমনই অপবিত্র কথা! তীর্থস্থানের অধিনায়কগণের কথা অনেকেই শুনেছেন ; দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত অর্থ কিরূপে অযথা ব্যয়িত হয়, তার নূতন দৃষ্টান্ত প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। চক্ষের সম্মুখে আজও কলিকাতার

প্রধান বিচারালয়ে অকারণে রাশি রাশি অর্থ জলস্রোতের মত ভেসে যাচ্ছে। দুঃখ-পাপ-তাপক্লিষ্ট শত শত নরনারী তাহাদের বহু কষ্টে উপার্জ্জিত অর্থের দুই একটী পয়সা বাঁচিতে তাই নিয়ে তীর্থ দর্শন কোর্ত্তে যায়, দেবচরণে সেই কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ দিয়ে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে; আর মঠের অধিকারী মহাশয়েরা বিলাস লালসা তৃপ্তির জন্য সে অর্থ ব্যয় করেন!

বাইরে এসে দেখি স্বামীজী ও অচ্যুত বাবাজী আমার জন্যে অপেক্ষা কোরছেন। এইবার আমাদের মধ্যে প্রথম কথা উঠ্‌লো "এখন কোথায় যাওয়া যায়?" বাস্তবিকই এবার আমাদের নিরুদ্দেশ যাত্রা। যেখানে ও যে পথে লোক যায়, এত দিনে, আমরা তাই শেষ কল্লুম; এই বার হোতে এক নূতন পথে যেতে হবে। সে পথে কখন লোক চলে না, এবং যাত্রীদলও সে পথে যেতে আগ্রহ করে না। এই নূতন পথ দিয়ে আমাদের ব্যাসগুহা দেখ্‌তে যেতে হবে। এই নূতন পথে চল্‌তে একজন পাণ্ডার সাহায্য লওয়া ভাল, স্থির কোরে একবার লছমিনারায়ণ পাণ্ডার খোঁজ করা গেল। সে পূর্ব্বদিন রাত্রেই বদরিকাশ্রমে এসে সশরীরে হাজির হোয়েছে। লছমীনারায়ণ দেবপ্রয়াগে আমাদের ভরসা দিয়েছিল যে, শীঘ্রই সে নারায়ণ মন্দিরে এসে পৌছবে; কিন্তু এত শীঘ্র আস্‌বে তা একদিনও আমাদের মনে হয় নি! তার এত তাড়াতাড়ি আস্‌বার কারণ জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌তে পাল্লুম, নারায়ণ দর্শন জন্যে যে ব্যাকুল হোয়ে সে এসেছে তা নয়, কাশীনাথ জ্যোতিষী মহাশয় তার একজন সম্ভ্রান্ত যজমান; তাঁর কাছে বিলক্ষণ দশটাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা; কিন্তু "রামনাথকি চাটীর" দ্বার সে কাজটা যথাবিহিত সম্পন্ন হবে, লছমীনারায়ণের সে আশা ছিল না; তাই সে প্রাণপণে হেঁটে এসেছে। জ্যোতিষী মহাশয় সেই রাত্রেই বদরীনাথ পৌছেছেন। আমরা তাঁকে পাণ্ডুকেশ্বরে রেখে এসেছিলুম; তার পর আমরা ঘুরতে ঘুরতে আসছি, তিনি বাহকস্কন্ধে নির্ভাবনায় আস্-

ছিলেন; সুতরাং আমাদের আগেই তাঁর এখানে পৌঁছিবার সম্ভাবনা বেশী ছিল।

আমাদের সঙ্গে ব্যাসগুহা পর্য্যন্ত যাবার জন্য লছমীনারায়ণকে বলা গেল কিন্তু এ প্রস্তাব সে অস্বীকার কোল্লে; বোল্লে, তার অনেক যাত্রী রাতে এসেছে, পরদিন সকালেও অনেকে এসে পৌঁছবে। এ রকম অবস্থায় তাদের নারায়ণ দর্শনের বন্দোবস্ত না কোরে সে আমাদের সঙ্গে কি রকম কোরে অতদূর যায়! এ ছাড়া ব্যাসগুহা তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; এবং পর্য্যন্ত কোন যাত্রী সে পথে অগ্রসর হয় নি, বিশেষ সে একটা তীর্থ বোলে গণ্যই নয়। তার কথায় মন কেমন দমে গেল। কিন্তু এখান থেকে ফিরে যাওয়া হোচ্ছে না আর খানিকটা যেতেই হবে, সুতরাং এই পথেই যাওয়া ভাল; স্বামীজি ও আমি এই রকম সিদ্ধান্ত কোরে ফেল্লুম। বৈদান্তিক ভায়ার সাংসারিক আকর্ষণ কিছু ছিল বোলে বোধ হয় না, কিন্তু এ পথে অগ্রসর হোতে তিনি বিষম নারাজ; আমার ও স্বামীজীর মতলব শুনে তিনি ভারি চোটে উঠলেন; বোল্লেন, পাণ্ডারা যে পথ চেনে না, তীর্থযাত্রীরা যে স্থানকে তীর্থের হিসাবে নগণ্য মনে করে, সেখানে এত কষ্ট কোরে যাবার কি দরকার? শরীরকে শুধু শুধু কষ্ট দেওয়াই যদি অভিপ্রায় হয়, তবে তার ত অনেক উপায় আছে। আমি ভায়ার উপর রাগ কোরে বল্লুম, "তুমি বৃথা তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে এতকাল অতিবাহিত কোল্লে। যাত্রীনির্দ্দিষ্ট তীর্থে ঘুরে মন্দির এবং ঠাকুর দেখেই কি তুমি তোমার জীবনকে ধন্য এবং হৃদয়কে পরিতৃপ্ত বোধ কর? এই হিমালয়ের মহান গম্ভীর শান্তিপূর্ণ ক্রোড়ের মধ্যে কি এমন কোন তীর্থ নেই, যাকে যাত্রীদের দেবতা এবং দেবমন্দির পবিত্র ও বিখ্যাত না কোল্লেও প্রকৃতির বিচিত্র শোভা এবং শান্তির কোমল রংসে তা সমলঙ্কৃত?" বক্তৃতার দ্বারা ভায়াকে বিলক্ষণ বাধ্য করা গেল, সুতরাং অবিলম্বেই তিনি আপত্তি ত্যাগ কোল্লেন।

আমাদের যখন এই রকম তর্কবিতর্ক চোলছিল, সেই সময় সেখানে দু-চার জন প্রৌঢ় পাণ্ডা উপস্থিত ছিলেন; আমরা ব্যাসগুহা দেখবার জন্য উৎসুক হোয়েছি শুনে তাঁরা সকলেই ভারি বিস্ময় প্রকাশ কোরে বোল্লেন, সোখেনে যাবার কোন রকম বন্দোবস্ত নেই; অলকনন্দা পার হোতে হবে, কিন্তু কোথাও সাঁকো নেই; নদী জোমে শক্ত হোয়ে গিয়েছে; তারই উপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে কোন রকমে পার হোতে হবে; হঠাৎ একটা চাপ বোসে গিয়ে সব শুদ্ধ ডুবে যাওয়ার কিছুমাত্র আটক নেই! একজন পাণ্ডা বোল্লেন, কিছু দিন আগে একজন অলকনন্দা পার হোতে গিয়ে বরফ ভেঙ্গে ডুবে গিয়েছিল। অতএব সেখানে যখন দেখবার যোগ্য কিছু নেই, তখন এত কষ্ট কোরে যাবার কি এত আবশ্যক? আমরা কিন্তু এ যুক্তিতে কর্ণপাত কোল্লুম না, এবং বলা বাহুল্য এই রকম যুক্তি অনুসারে চোল্‌লে আর এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হবার সম্ভাবনাই থাকতো না।

বরাবর এই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে আসা যাচ্ছে যে, যে সমস্ত যাত্রী তীর্থভ্রমণ কোর্‌তে আসে, তারা শুধু দেবমন্দির ও দেবতা ছাড়া আর কিছুতেই মনোনিবেশ করে না। হয় তো তারা সেটা বাহুল্য জ্ঞান করে; না হয়, একমনে একপ্রাণে অভীষ্ট দেবতার চিন্ততেই তারা তন্ময় হোয়ে থাকে, এবং তাতেই তারা এমন নিবিষ্টচিত্তে পথ চলে যে, চতুর্দ্দিকে আর যা কিছু দেখবার আছে, তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের অবসর পায় না; এ পর্য্যন্ত কত তীর্থযাত্রীর সঙ্গে দেখা হোলো; তারা বাহ্যপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য, চতুর্দ্দিকের অভিনব দৃশ্যরাশির বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কোন কথাই বলে না।

যা হোক আপাততঃ ব্যাসগুহার উদ্দেশেই রওনা হওয়া গেল। বদরিকাশ্রম ত্যাগ কোরে চোল্‌তে আরম্ভ কোল্লুম। তিনটি প্রাণী পূর্ব্ববৎ চলছি বটে, কিন্তু পথ অনির্দ্দিষ্ট, অধিকতর দুর্গম এবং একান্ত নির্জ্জন। চোল্‌তে চোল্‌তে ক্বচিৎ যদি কোন সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয়, ত পথের কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে সে একটু অবাক্ হোয়ে আমাদের দিকে চেয়ে

থাকে, তার পর বলে "ইস্ তরফ কৈ যায়গা পর ...গা, মালুম নেহি," সুতরাং অন্য লোকের কাছে পথের সন্ধান জানার আশায় নিরাশ হোয়ে আমরা নির্ব্বাক্‌ভাবে এবং কতকটা সন্দিগ্ধচিত্তে অলকনন্দার ধারে ধারে চোল্‌তে লাগলুম; আগে পাছে সেই উন্নত পর্ব্বতশ্রেণী তুষারাচ্ছন্ন; বন্ধুর তরুতৃণহীন পর্ব্বতের অন্ত নেই; মধ্যে শুধু সঙ্কীর্ণ বঙ্কিম অধিত্যকা ভেদ কোরে অলকনন্দা অস্ফুট শব্দে ছুটে চোলেছে এবং তার কম্পিত জল-প্রবাহ কঠিন প্রস্তরভিত্তিতে এসে ধীরে ধীরে আঘাত কোর্‌চে। ক্রমে বরফের স্তূপ আবার দৃশ্যমান হোয়ে পোড়লো। অলকনন্দার জলধার অদৃশ্য হোয়ে এলো, অবশেষে বরফের নদী ভিন্ন ... কিছুই দেখা গেল না। কঠিন জমাট বরফরাশিতে নদীগর্ভ সম্পূর্ণ আ...

অনেকক্ষণ চলার পর আমরা তুষারাচ্ছন্ন নদীতী... স দাঁড়ালুম চারিদিকে শুধু বরফ ধূ ধূ কোরছে। নিম্নে ঊর্দ্ধে যে ... চাই কেবল বরফ; পথের চিহ্ন নেই, নদীর চিহ্ন নেই, গন্তব্য-স্থান কে... কে ঠিক নেই এমন কি দিগ্‌নির্ণয়ের পর্য্যন্ত উপায় নেই। আমরা ... নেই দিগ্‌ভ্রা... হোয়ে বরফ-নদীর তীরে দাঁড়িয়ে ভাব্‌তে লাগলুম। যে দিক থেকে আমরা এসেছি, সে দিক ঠিক আছে—এখনও ফিরে যেতে পারি। অনি-র্দ্দিষ্ট বিপদের মধ্যে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে আর একবার ভেবে দেখলুম তারপর ভগবানের নাম স্মরণ কোরে নদী পার হওয়াই স্থির কোল্লুম।

ব্যাসগুহা যে কোথায়, তা এখন পর্য্যন্তও স্থির হয় নি। স্বামীজি-র বিশ্বাস আমাদের সম্মুখের পর্ব্বতের গায়েই নিশ্চয়ই ব্যাসগুহা দেখতে পাওয়া যাবে। স্বামীজির অনুমানের উপর নির্ভর কোরেই আমরা নদীপার হোতে প্রবৃত্ত হোলুম। এখানে নদী পার হওয়া বড়ই দুঃসাহসের কাজ। আগে বোলেছি, নদীর উপর কোন সাঁকো নেই, তার উপর কোন্ স্থানে বর... কি অবস্থায় আছে, তা নির্ণয় করা দুরূহ। আমরা যে বরফরাশির উপ... দাঁড়িয়ে আছি, তার নীচেই যে নদী নেই তারই বা ঠিক কি? অতএ...

আর বেশী চিন্তা না কোরে তাড়াতাড়ি চোল্‌তে লাগলুম। বৈদান্তিক তাঁর দীর্ঘ পার্ব্বত্য যষ্টিহস্তে পথপ্রদর্শক হোলেন। এক এক পা অগ্রসর হন আর যষ্টিগাছটি বরফে বসিয়ে দিয়ে জমাট বরফের পরিমাণ পরীক্ষা করেন। আমিও বৈদান্তিকের সঙ্গে সঙ্গে চোল্‌তে প্রস্তুত হোলুম, কিন্তু স্বামীজী আমাকে ভারী ধমক দিয়ে হটিয়ে দিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চোল্‌তে অনুমতি কল্লেন; আরো বোল্লেন, যদি আমি তাঁর কথার অবাধ্য হই, তবে তিনি তখনই সেখান হো... ফিরে যাবেন; আমার মত উচ্ছৃঙ্খল-মতি বালকের সঙ্গে তাঁর চলা পুষিয়ে উঠ্‌বে না। আমি হাস্যমুখে তাঁকে নির্ভয় হোতে বোল্লুম। কিন্তু তিনি পুন... ভয় দেখিয়ে বোল্লেন, হঠাৎ আমার পা দুটো আমার অজ্ঞাতসারে বরফের মধ্যে বোসে যেতে পারে, তখন পা টেনে তোলা তাঁদের দুজনের সাধ্যায়ত্ত হবে না। অগত্যা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চোলতে লাগলুম, বুঝ্‌লুম স্বাধীনতা না থাকিলে স্বর্গে ... সুখ নেই, কিন্তু স্বামীজীর স্নেহ-কোমল ভর্ৎসনায় মনে অধীনতার সন্তাপ স্থান পায় না। আসল কথাটা এই, আমরা যে নদীর উপর দিয়ে চোলে যাচ্ছি, সেই নদী যে কোন মুহূর্ত্তে আমাদিগকে তার হৃদয়ে চিরদিনের জন্য আশ্রয় দিতে পারে। আমি আগে গেলে আমিই আগে মারা যাবো, এই ভয়ে স্বামীজি আগে গেলেন;—নিজের জীবন সঙ্কটাপন্ন কোরে তিনি আমাকে বাঁচাবেন বোলেই তাঁর এই ভর্ৎসনা! হায় সন্ন্যাসী! কি মায়ার বাঁধনেই তুমি আট্‌কা পোড়েছ!

সেই তুষারাচ্ছন্ন নদীর পরিসর কতখানি তা জানা নেই, সুতরাং আমাদের সকলকে অতি সন্তর্পণে পদক্ষেপ কোর্ত্তে হলো। অনেকক্ষণ হোতে চলছি, এতক্ষণ হয় তো নদী পার হোয়ে পর্ব্বতের কঠিন প্রস্তরের উপর দিয়ে চলছি, কিন্তু তবু সতর্ক হোয়ে যেতে হোচ্ছে। আমি লক্ষ্য কোরে দেখলুম বৈদান্তিক এবং স্বামীজী দুজনেই বেশ স্বচ্ছন্দভাবে চোলে যাচ্ছেন, তাঁদের আকার প্রকারে এবং গতিতে ভয়ের কোন চিহ্ন দেখা

গেল না ; কিন্তু স্বীকার কো্র্ত্তে লজ্জা নেই, আমার মনে বিলক্ষণ ভয়ের সঞ্চার হোচ্ছিল। সংসারের বন্ধন কাটিয়েছি, সন্ন্যাস অবলম্বন করা গেছে, পৃথিবীতে সুখ নেই, এবং বেঁচে থাকবার যে কিছু প্রলোভন তাও দূর হোয়েছে, কিন্তু তবুও জীবনের মায়া বিসর্জ্জন দিতে পারি নি। যার কোন কাজ নেই, সেও জীবনটাকে মূল্যবান মনে করে। জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া সহজ বোলে মুখেই যত আস্ফালন করি না কেন, যখন বিপদের মেঘ চারিদিকে ঘন হোয়ে আসে এবং সংসারের উন্মত্ত তরঙ্গ ফেনিল হোয়ে উঠে, তখন আমরা নিরাশ্রয় হাত দুখানি কৃতাঞ্জলিবদ্ধ কোরে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তখন আমরা বুঝতে পারি, আমরা শুধু কাপুরুষ নই, ভগবানের চিরমঙ্গল ইচ্ছার উপর নির্ভর কোর্ত্তেও আমরা অশক্ত। আমরা দুর্ব্বল এবং বিশ্বাসহীন।

অনেকক্ষণ পরে একটা চড়াইয়ের উপর উঠা গেল, তখন নির্ভয় হলুম, কারণ আর সেটা নদী গর্ভ হোতে পারে না। পাহাড়ের উপরে উঠে অনেক অনুসন্ধানেও ব্যাসগুহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। চারিদিক তন্ন তন্ন কোরে খুজতে লাগলুম, কিন্তু কোথাও গুহার নামও নেই। ছোট ছোট দু একটা গুহা থাকলেও তা বরফে ঢাকা। পাহাড়ের পর পাহাড়, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ, এই রকম বহুদূর চলে গেছে। অনেক অনুসন্ধানের পর একটা উঁচু জায়গা দেখা গেল ; পাহাড়ের অনেকখানি জায়গা ঘুরে বহু কষ্টে সেই উঁচু যায়গাটাতে উঠলুম। স্বামীজী শুনেছিলেন, বরফাচ্ছন্ন পর্ব্বতের মধ্যে ব্যাস গুহার সম্মুখে কিছুমাত্র বরফ নেই, সে জায়গাটা শৈবালদলে সমাচ্ছন্ন। এই স্থানে উপস্থিত হবা মাত্র সেই দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে গেল, সুতরাং আমরা সহজেই বুঝতে পাল্লুম, এ জায়গাটাই ব্যাসগুহার সম্মুখভাগ। এত ভয়, উদ্বেগ এবং পরিশ্রমের পর আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু আবিষ্কৃত হোতে দেখে আমরা অত্যন্ত আনন্দ বোধ কল্লুম। বাঙ্গালীর ছেলে লিভিংষ্টোন ষ্ট্যানলের মত বিপদসঙ্কুল অনাবিষ্কৃত দেশ আবিষ্কার কারান এবং জীবনে

আশাও নেই, কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হোয়ে অন্ধভাবে রাস্তা হাতড়ে ব্যাসগুহায় উপস্থিত হওয়াতে আমার মনে ভারি অহঙ্কারের সঞ্চার হোলো। মনে করতে লাগলুম, দায়ে পোড়লে আমরাও লিভিংষ্টোন, ষ্টানলের মত এক একটা বৃহৎ কাজ কোরে ফেলতে পারি। সমস্ত বিশ্বসংসারের লোক তখন বিস্ময়-বিহ্বলনেত্রে এই বঙ্গবীরের দিকে চেয়ে কি ভাবে, তা কল্পনা কোরে বেশ আরাম বোধ হোলো এবং অনেকখানি আত্মপ্রসাদও ভোগ করা গেল।

ব্যাসগুহার সম্মুখের প্রাঙ্গণটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা ছোট অনাবৃত উদ্যানের মত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখানে বিন্দুমাত্র বরফ নেই, অথচ আশে পাশে স্তূপাকার বরফ। সেই ঋষিশ্রেষ্ঠের কোন্ মায়ামন্ত্রবলে চিরদিনের জন্যে এখান থেকে বরফরাশি তিরোহিত হোয়েছে তা আমাদের মত ক্ষুদ্র মানববুদ্ধির অগম্য। আমরা অবাক্ হোয়ে তার কারণ খুঁজতে লাগলুম, কিন্তু কোন কারণই নির্দ্দেশ কর্‌তে পাল্লুম না। এই বরফহীন গুহা-প্রাঙ্গণটী যে নীরস কালো পাথর মাত্র তাও নয়; পাথরের উপর ক্রমাগত জল পোড়লে যেমন একরকম সবুজ পাতলা শেওলা জন্মে, এখানে তেমনি জন্মিয়ে আছে; কিন্তু ঐ শৈবালদল পাতলা নয়, গালিচার আসনের মত পুরু; তার রং বড় চক্ষু তৃপ্তিকর, বিশেষতঃ তার মধ্যে আবার ছোট ছোট লাল ও সাদা ফুল ফুটে প্রকৃতির হস্তনির্ম্মিত সেই আসনখানিকে আরও সুন্দর এবং প্রীতিকর কোরে তুলেছে।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা সেই মনোহর আসনখানির দিকে চেয়ে রইলুম। সেই পুরু শৈবালরাশির উপরে খুব ছোট ছোট লাল ও সাদা ফুল ফুটে রয়েচে, তাতে আসনখানিকে মণিমুক্তাখচিত বোলে বোধ হোচ্ছে। এমন আশ্চর্য্য দৃশ্য আর কখন দেখিছি বোলে মনে হোলো না। এ রকম জিনিস আমার কাছে এই নূতন। আমার সঙ্গে কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত থাকলে হয় ত এই বরফরাজ্যে এ রকম প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কারণ অবগত হবার জন্যে চেষ্টা কোরতেন এবং হয় ত কৃতকার্য্যও হোতে পারতেন; কিন্তু

আমরা কেহই বৈজ্ঞানিক নই ; কোন একটা সুন্দর জিনিস দেখলে তাকে বিশ্লেষণ না কোরে তার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি কোরেই কেবল আমরা আনন্দিত হই। জ্যোৎস্না-পুলকিত শুভ্র শারদ যামিনীতে পূর্ণচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ কোরে ক্ষুদ্র শিশু হোতে প্রেমিক কবি পর্য্যন্ত সকলেই সুখ এবং তৃপ্তি অনুভব করে ; চন্দ্র কি বস্তু, দূরবীক্ষণ যন্ত্রে তাকে পর্য্যবেক্ষণ কোল্লে তার মধ্যে কতকগুলি পর্ব্বত-সাগর এবং মরুভূমি আবিষ্কার করা যায়, তা বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়, কিন্তু তাঁর এই গবেষণাজনিত আনন্দ, শিশু ও কবির আনন্দ অপেক্ষা অধিক কিনা তা কে বোল্‌বে ? ইদানীং বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করবার চেষ্টা কোরচেন যে, মঙ্গলগ্রহে মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর জীবের বাস আছে। সেই সকল অপার্থিব প্রাণী ক্রমাগত লাল আলো দেখিয়ে আমাদের পৃথিবীর মনুষ্যের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার চেষ্টা কোরচে। আর একজন কবি হয়ত সেই মঙ্গল গ্রহকে অনন্ত গগনোদ্যানের একটি লোহিত কুসুম বোলে বিশ্বাস কোরেই সন্তুষ্ট। হয় ত এ ভ্রম ; কিন্তু কত সময় আমরা ভ্রান্তিতেই সন্তুষ্ট থাকি। আমাদের মত উদ্দেশ্যহীন জীবনের সুদীর্ঘ যাত্রাটাই কি ভ্রম নয় ? কিন্তু এ ভ্রম বিদূরিত করবার জন্য আমরা কিছুমাত্র ব্যস্ত নই, বরং যখন একটা ভ্রম দূর হোয়ে যায়, আমরা স্বপ্ন হোতে হঠাৎ জেগে উঠি এবং কঠোর সত্যের অতিপরিস্ফুট কঠিন শিলাতলে নিক্ষিপ্ত হই, তখন শান্তির আশায় আর একটা অভিনব ভ্রমের কুহক রচনার জন্য আমাদের প্রাণ আকুল হোয়ে উঠে।

যা হোক এ দার্শনিক তত্ত্ব এখানে থাক। ব্যাসদেবের আসন দেখ্‌তে দেখ্‌তে মাথার মধ্যে এতখানি দার্শনিক ভাব গজিয়ে তোলা অনেকেরই নিকট বাহুল্য বোধ হবে। আসন দর্শন ত্যাগ কোরে আমরা তিনজনেই গুহার মধ্যে প্রবেশ কোল্লুম। ব্যাসগুহার নাম শুনে ভেবেছিলুম, এ বুঝি একটা ছোট গুহা ; তার মধ্যে ব্যাসদেব এবং বড় জোর তাঁর লোটা কম্বল ধোরতে পারে ; কিন্তু গুহায় প্রবেশ কোরে দেখ্‌তে পেলুম,

সে এক প্রকাণ্ড গহ্বর, তার মধ্যে এক-শ দেড়-শ লোক অনায়াসে বোসতে পারে; তার মধ্যে বিস্তীর্ণ দেওয়াল, তাতে যুগান্তরের কালী ও ধোঁয়ার দাগ লেগে আছে। ব্যাসদেবের গুহা, কাজেই এখানে যাগযজ্ঞের অভাব ছিল না, এ হয় ত তারই ধোঁয়ার চিহ্ন! আমি কল্পনাচক্ষে মহাভারতীয় যুগের হোম যজ্ঞ সমাকীর্ণ এই সুবিস্তীর্ণ আশ্রমে একটী শান্তিপূর্ণ পবিত্র তপোবনের চিত্র দেখতে পেলুম। শুনেছি থিয়োজফিষ্ট মহাশয়েরা বলেন, এক একটা জায়গার বৈদ্যুতিক হাওয়া খুব ভাল; সেই সেই জায়গা হিন্দুদিগের তীর্থস্থান। এ কথাটা কতদূর সত্য তা জানি নে। এ জায়গাটা যদিও তীর্থের লিষ্ট হোতে নিজের নাম খারিজ কোরেছে, তবু যে শান্তি, পবিত্রতা ও স্বর্গীয়ভাব এই গিরি-অন্তরালে সংগুপ্ত আছে, অনেক তীর্থে তা একান্তই দুর্লভ। আমরা গুহার মধ্যে অনেকক্ষণ বোসে রইলুম, পৌরাণিক স্মৃতির তরঙ্গ আমাদের প্লাবিত কোরতে লাগলো। এমন স্থানে এসে কি গান না কোরে থাকা যায়? স্বামীজি আমাকে গান কোরতে অনুরোধ কোল্লেন, এবং নিজেই আরম্ভ কোল্লেন—

"মিটিল সব ক্ষুধা, তাঁহারই প্রেমসুধা,
চল রে ঘরে লোয়ে যাই।"

পথশ্রমে এই দারুণ ক্লান্তির পর ভাঙ্গা গলাতে গুহা প্রতিধ্বনিত কোরে এই গানটি বার বার গাওয়া গেল; এমন মিষ্টি লাগলো যে, নিজেরাই মোহিত হোয়ে পড়লুম। যাঁরা ভাল গায়ক তাঁরা এখানে গান আরম্ভ কোল্লে বুঝি পৃথিবী স্বর্গ হোয়ে যায়! আমি দুই এক পালটা গেয়ে ছেড়ে দিতে চাই, স্বামীজী আবার আর একটা আরম্ভ করেন। আমাকে আবার গাইতে হয়, তাঁর ক্ষুধা যেন আর মেটে না; শেষটা তাঁকে দেখে বোধ হোল, তাঁর যেন কিছুতেই তৃষা মিট্‌লো না।

আমরা এই ভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিলুম। বেলা ১টা বেজে গেল, আর বেশী দেরী কোর্‌লে পথে কোন বিপদে পোড়তে পারি মনে কোরে

আবার উঠে পোড়লুম। তবু কি সেখান হোতে উঠ্‌তে ইচ্ছা করে? আর এখানে আসবো সে আশা নেই ভেবে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে স্থান থেকে বিদায় নিলুম। এমন কতস্থান হোতে বিদায় নিয়েছি, ভবিষ্যতে আরও কিছু সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাব, এই আশাতেই এমন সকল স্থানের প্রলোভন ছাড়তে পেরেছি, নতুবা হয় তো চিরজীবন এই সকল পুণ্যদৃশ্যের কাছে পোড়ে থাক্‌তুম।

গুহা ত্যাগ কোরে তিন জনে নদীতীরে এলুম। যে রাস্তা দিয়ে নদী পার হোয়েছিলুম, তার চিহ্ন মাত্র দেখা গেল না, সুতরাং আবার পূর্ব্ববৎ সন্তর্পণে নদী পার হোতে হোল, কিন্তু নদী পার হোয়ে দেখি আমাদের পথ ভুল হোয়ে গেছে। তখন ব্যাকুল হোয়ে পথ খুঁজতে লাগলুম, এবং তিন মাইলের জায়গায় সাত মাইল ঘুরে বেলা তিনটের পর বদরিকাশ্রমে পুনঃ প্রবেশ কোল্লুম। আমাদের বিলম্ব দেখে পাণ্ডা বাবাজীরা আমাদের নাম খরচ লিখে বসেছিল; আমাদের সশরীরে এবং সুস্থভাবে ফিরতে দেখে তারা খুব খুসী হোলো এবং আমরা কি দেখলুম তা বলবার জন্য আমাদের অনুরোধ কোল্লে। লোকগুলো বুদ্ধিমান সন্দেহ নাই, তাদের এত কষ্টের অভিজ্ঞতা দুটো বাহবা দিয়েই আয়ত্ত কোরে নিতে চায়।

বিশ্রাম

৩১ শে মে, রবিবার। আজ ইংরাজী মাসের শেষ দিনে খৃষ্টানদিগের বিশ্রামবারে ভগবানের অনুগ্রহে অখৃষ্টান আমরাও বিশ্রাম গ্রহণ কল্লুম। এ পথে বদরিকাশ্রমই শেষ তীর্থ। তীর্থের তালিকা মধ্যে ব্যাসগুহার নাম নেই, তবুও আমরা সন্ধানে সন্ধানে সেখানে ঘুরে এলুম। এখন নিকটে বা দূরে আর কোন তীর্থের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, কাজেই আমাদের হাতে আর কোন কাজ নেই। এতদিন কাজের মধ্যে ছিলুম; ভাবনা,

চিন্তা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, কিছুতেই বড় ব্যাকুল কোরতে পারেনি। যখন সঙ্কটাপন্ন বিপদরাশি পাষাণস্তূপের মত জীবনের পথরোধ কোরে দাঁড়িয়েছে, তখন সেই বিপদজাল হোতে উদ্ধার হবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করা গিয়েছে। তারপর আর সে কথা মনে হয়নি। নূতন উৎসাহ, নূতন বল এবং অপেক্ষাকৃত অধিকতর স্ফূর্ত্তিতে নব নব পথে অগ্রসর হওয়া গেছে। ক্ষুধার সময় এক মুষ্টি আহার জুটলো ভাল, না জুটলো পথ হোতে দুটো ফল মূল সংগ্রহ কোরে, আহার করা যেত, অথবা পরিপূর্ণ মাত্রায় উপবাস। নিদ্রার জন্যে কোন দিন কিছু আয়োজন কোর্ত্তে হয়নি, কিন্তু বিনা আয়োজনে, কি গিরিগুহা, কি অনাবৃত নদীতীর, কোথাও তাঁর শুভাগমনের ব্যাঘাত জন্মেনি। আজ একমাসেরও অধিক পূর্ব্বে যে ব্রত মাথায় নিয়ে বদরিনাথের এই তুষার শৈলমণ্ডিত সুপবিত্র পীঠতল দেখতে অগ্রসর হোয়েছিলুম—আজ তার শেষ; তাই আজ শ্রান্তিভরে হৃদয় ভেঙ্গে পোড়ছে। এতদিন ঘুরে বেড়ালুম—যে আশায় এত দেশ ভ্রমণ, তার কিছুই পূর্ণ হোলো না। প্রকৃতির দৃশ্য বৈচিত্র্যে, সাধকের একান্ত সাধনায়, শত শত ভক্ত-হৃদয়ের নিষ্ঠা ও ভক্তিতে যে মহান্ ভাব, যে পবিত্রতা, যে একটা অব্যক্ত মাধুর্য্যের পরিচয় পেয়েছি, তা প্রকৃতই শান্তিপ্রদ; কিন্তু সে শান্তি ক্ষণস্থায়ী, হৃদয়ের অসীম পিপাসা তাতে প্রশমিত হয় না; প্রাণের কঙ্কালসার জীর্ণ আবরণ ভেদ কোরে একটা দুর্দ্দমনীয় অতৃপ্তি এখনও হাহাকার কোরছে; বিশ্বের সমস্ত সুন্দর জিনিস তাকে এনে দিচ্চি, সে একবার আগ্রহের সঙ্গে হাতে কোরে নিচ্চে, তার পর তুচ্ছ জিনিসের মত দূরে ফেলে দিচ্চে! কতবার হয়ত পরশমণি এনে তার হাতে সমর্পণ কোরে দিয়েছি, কিন্তু কাচখণ্ডের মত সে তা দূর কোরে ফেলে দিয়েছে। হায়, যদি সে একবার চিন্তে পার্‌তো, তা হোলে হয়ত তার এই তৃষিত ক্রন্দন, এই জীবনব্যাপী দীর্ঘনিশ্বাস থেমে যেত।

আজ আর কোন কাজ নয়, আজ শুধু বিশ্রাম কোরবো ভেবে বদরিকা-

শ্রমের শুভ্র তুষারমণ্ডিত ক্ষুদ্র উপত্যকার একখানি ছোট ঘরে কম্বল জড়িয়ে বেশ গরম হোয়ে বসা গেল ; কিন্তু চিন্তার আর বিরাম নাই ; আজ আবার পুরাতন সমস্ত কথা নূতন কোরে মনে হোতে লাগলো। বোধ হলো, জীবনটা আগাগোড়া একটা নাটক ; এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশের কোন সংস্রব নেই ; যবনিকা পোড়েছে এবং উঠেছে, আর আমি তারই মধ্যে কখন ছাত্র, কখন শিক্ষক, কখন সংসারী কখন সন্ন্যাসীর অভিনয় কোরে যাচ্ছি। কেউ করতালি দিচ্ছে, কারও বা বুকে বেদনা এবং চোকে অশ্রুর সঞ্চার হোচ্ছে ; জিজ্ঞাসা কোরছে, আর কত দূর? এ জীবন ট্র্যাজেডিতে আমিই পরিশ্রান্ত হোয়ে পোড়ছি, অন্যে ত দূরের কথা ; এখন এ পর্ব্বতের প্রান্ত হোতে দেহের বৃন্তটুকু থেকে জীবন খসে পোড়লেই বুঝি এ নাটকাভিনয়ের অবসান হবে ; জানি না কোথায় এর শেষ অঙ্কের সমাপ্তি। যেখানেই হোক্, আমার কিন্তু বিশ্রাম নিতান্ত দরকার হোয়ে পোড়েছে।

শৈশবের কথা, যৌবনের কথা, এই জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্যের কথা, একবার সেই রাজ্যের সুখকুঞ্জ পল্লীগ্রাম, একবার যৌবনের কর্ম্ম চাঞ্চল্য পূর্ণ কলিকাতা, ঘুরে ফিরে সেইগুলিই এই পাষাণ প্রাচীরবেষ্টিত হিমালয়ের উপত্যকার মধ্যে আমার কর্ম্মশ্রান্ত ক্লান্ত হৃদয়কে আন্দোলিত কোরতে লাগল। এই লোটা, কম্বল এবং সন্ন্যাস শুধু বিড়ম্বনা। হৃদয়ের সুখ দুঃখ লোটা, কম্বলে নিয়ন্ত্রিত হবার নয় ; যা ফেলে এসেছি তাদের আসক্তি ও আকর্ষণ এখনও চিরনবীন। বাল্যকালে কোন্ দিন গৃহপ্রান্তে একটা খেজুর গাছ পুঁতে এসেছিলুম, সে আজ শাখা বাহু বিস্তার কোরে এখনও যেন আমাকে আহ্বান কোরছে ; বাড়ীর অদূরবর্ত্তী গৌরী নদী— সকালে সূর্য্য উঠবার সময় তার চড়ার উপর বালিগুলি চিক্ চিক্ কোরতো, ছোট ছোট সঙ্গীদের সঙ্গে তারই উপর লাফালাফি কোরে বেড়াতুম, সে যেন সে দিন! আবার বর্ষাকালে যখন সমস্ত চড়া ডুবে যেতো, চড়ার উপরের বনঝাউগুলিকে

..কোরে নদীর স্রোত চোল্‌তো, তখন আমরা কতবার সেখানে সাঁতার কেটেছি, পরিশ্রান্ত হোলেই ঝাউগাছের আগা ধোরে বিশ্রাম কোর্তুম এবং কদাচিৎ দূর থেকে মার গলার সাড়া পেলেই বাবলা গাছের সারের ভিতর দিয়ে, বাণের জলে আকাণ্ড নিমজ্জিত কচুবনকে পদদলিত কোরে সরকারদের গোয়ালঘরের ভিতর গিয়ে লুকিয়ে থাকতুম। একদিন পায়ে একটা বাবলার কাঁটা বিঁধেছিল, এখনো মনে কোর্‌তে চোখে জল আসে—মা আমার সেই কোমল পাখানি কোলের উপর নিয়ে ছুঁচ দিয়ে কত যত্নে সেই কাঁটাটা তুলে দিয়েছিলেন; সামান্য একটা কাঁটা বের কোরবেন, তাতে কত যত্ন, কত ভয়, সাবধানতা, যেন তাঁর প্রাণের সমস্ত আগ্রহ সেই ক্ষুদ্র ছুচ-বৃন্তে ভর কোরেছিল; কথাটা সামান্য এবং সে দিন বহুকাল চোলে গেছে, কিন্তু জীবনের এই মরুপ্রান্তে শৈশবসুখের সেই ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকু এখনো ভুলি নি।

সমস্ত সকাল বেলাটা সেই গৃহকোণে বোসে এইরকম চিন্তায় কেটে গেল। স্বামীজি কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলেন, বৈদান্তিক ভায়া বোধ করি কোন জায়গায় তর্কের গন্ধ পেয়েছিলেন, তিনি অনেকক্ষণ হোতে এ অঞ্চল ছাড়া। বেলা প্রায় দশটা সাড়ে দশটার সময় স্বামীজি কুটীরে এসে উপস্থিত হোলেন। আমাকে চিন্তামগ্ন দেখে তিনি কিছু শঙ্কিত হোলেন; স্নেহমধুরস্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমার কি কিছু অসুখ হোয়েছে?" তাঁর সেই কোমল, স্নেহের স্বরে আমি অনেক তৃপ্তি অনুভব কোরলুম, বোল্লুম "না আমার অসুখ হয় নি, আমি আজ বিশ্রাম কোচ্ছি।—" তিনি হাঁফ ছেড়ে বোল্লেন, "তবু ভাল"! আমি যে তখন কি গুরুতর বিশ্রামে প্রবৃত্ত, তা তিনি বোধ করি বুঝতে পারেন নি। যা হোক ক্রমাগত এই পথশ্রম, দুশ্চিন্তা এবং ক্লান্তিতে আমি একেবারে অবসন্ন হোয়ে পোড়েছি, তা তিনি কতকটা অনুমান কোর্ত্তে পাল্লেন,—সুতরাং আমাকে একটু প্রফুল্ল করবার জন্য অনেক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা

কোল্লেন। সবই পুরাণ কথা, সেই সংসার অসার, জীবন মায়াময়, আসক্তি সকল দুঃখের মূল, সুখ দুঃখ হোতে হৃদয়কে অব্যাহত রাখাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের প্রধান উপায়। পাঁজি পুথিতে এবং ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মুখে এই বাঁধি বোল বহুকাল হোতে শুনে আসা যাচ্ছে, সুতরাং এ সকল কথা শুনিতে আর তত আগ্রহ বোধ হোলো না। তখন তিনি তাঁর যৌবন-কালের ভ্রমণবৃত্তান্ত আমাকে বোল্‌তে আরম্ভ কোল্লেন; আসামের পাহাড়ে পাহাড়ে কেমন তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, ভগবৎকৃপায় কতবার তিনি আসন্ন বিপদের হাত থেকে কেমন কোরে রক্ষা পেয়েছেন, সেই কথা বোলতে লাগলেন; কিন্তু আমার সে নিস্তেজ ভাব কিছুতেই দূর হোলো না।

দুপুরের সময় একাই বেড়াতে বেরুলুম। ভিড় অনেক কম, যাত্রীরা প্রায় সকলেই বাসায় গেছে—এখনো পথপ্রান্তে তীর্থ যাত্রার কতক কতক নিদর্শন আছে; রাস্তা জনহীন, মধ্যাহ্নের রৌদ্রে আরো নিরালা বোলে বোধ হোতে লাগলো; রোদ ঝাঁঝাঁ কোরছে; উপরে পর্ব্বতশৃঙ্গে গলিত তুষার চিক্ চিক্ কোরছে, দূরে সেই একটা গাছের পাতা নড়ছে এবং তুষারনির্ম্মুক্ত ধূসর গাত্র উঁচু নীচু, ফাটল সংযুক্ত, দেখতে মোটেই ভাল লাগছে না। রাস্তা দিয়ে যেতে মনে হোলো, আমাদের সেই বঙ্গের সমতল ক্ষেত্রের খানিকটা শস্যশ্যামল খোলা মাঠ, অবাধ বায়ুর মধুর হিল্লোল, নিকটে একটা ছোট খাল, জেলেরা তাতে বাসজাল ফেলে মাছ ধোরছে, বটতলায় রাখালেরা মিলে জটলা কোরছে—আর শস্যক্ষেত্রের দিকে একটা গরুকে ছুটতে দেখে দৌড়ে এসে তাকে ঠেঙ্গাচ্ছে; বুঝি এই রকম প্রাচীন এবং অভ্যস্ত দৃশ্যের মধ্যে গেলে আমার প্রাণ জুড়িয়ে যায়। বাঙ্গালীর ছেলে ক্রমাগত এই রকম লোটা কম্বল ঘাড়ে কোরে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতে আর কিছুতেই ভাল লাগছে না। এ পাহাড়ে প্রকৃতির সঙ্গে আমার প্রকৃতির কোন রকমে মিশ খাচ্ছে না; সুখ চেয়ে স্বস্তি ভাল,

অতএব এখন মনে কোরছি একবার বাড়ী ফিরে যাব, এই সন্ন্যাস অথবা তার চেয়েও অতিরিক্ত কিছু আমার আর পুষিয়ে উঠচে না, ভাবচি—

"এখন ঘরের ছেলে, বাঁচি ঘরে ফিরে গেলে,
দুদণ্ড সময় পেলে নাবার খাবার।"

যারা আমার এই ভ্রমণবৃত্তান্ত একটু ঔৎসুক্যের সঙ্গে পড়েছিলেন, এবং প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে একটা দিগ্‌গজ সাধুরূপে পরিণত হওয়া দেখবার আশায় ধৈর্য্যাবলম্বন কোরেছিলেন, তাঁরা হয়ত এত দিনের পরে আমার এই লোটা কম্বল এবং বক্তৃতার মধ্য থেকে আমার স্বরূপ নিরীক্ষণ কোরে ভারি নিরুৎসাহ হোয়ে পোড়বেন, কারো কারো মুখ দিয়ে দুচারটি কটু কাটব্যও বের হোতে পারে।

আমার তাতে আপত্তি নাই; এ ছদ্মবেশ চেয়ে সে বরং ভাল। আমার মন ধাউস ধুড়ীর মত অনন্ত বিস্তৃত কল্পনা রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমি বাজারের পথ ছাড়ি নি; ঘুরতে ঘুরতে বাজারের মধ্যে এসে দেখলুম, একটা জায়গায় অনেক গুলো লোক জড় হোয়েছে। প্রথমেই মনে হোলো হয় ত কোন সাধুর কিঞ্চিৎ গাঁজার দরকার হোয়েছে,তাই সে কোন রকম বুজরুকী দেখিয়ে গাঁজার অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় আছে। ব্যাপারটা কি দেখবার জন্যে আমিও ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলুম। দেখলুম সাধু সন্ন্যাসী আমার সেই পূর্ব্বপরিচিত পণ্ডিত কাশীনাথ জ্যোতিষী। জ্যোতিষী মশায় সেই সমবেত ক্ষুৎকাতরপাহাড়ীদের খাদ্যসামগ্রী বিতরণ কোচ্ছেন;কাকেও পয়সা, কাকেও কাপড় দান কোচ্ছেন; তাঁর মিঠে কথায় সকলেই সন্তুষ্ট হোচ্ছে। এই রকম ব্যবহারে তিনি অনেক জায়গায় লোকের উপর আধিপত্য স্থাপন কোরে নিয়েছেন। তাঁর হৃদয়টা স্বভাবতঃই দয়ালু, চিত্ত উদার বোলে বোধ হয়, দোষের মধ্যে তিনি একটু প্রশংসাপ্রিয়। নির্দ্দোষ কটা লোক? সে জন্যে তাঁকে বড় নিন্দা করা যায় না। পূর্ব্বেই বোলেছি

একবার তাঁর অনুগ্রহের উৎপাতে আমি বিষম বিব্রত হোয়ে পোড়েছিলুম, আজ তাঁর সঙ্গে দেখা হোতেই তিনি সাগ্রহে আমাকে কাছে ডাকলেন; আমার কুশল জিজ্ঞাসা কোল্লেন পথে আর কোন অসুখ হোয়েছিল কিনা, তারও খোঁজ নিলেন। তাঁর সমস্ত কথার উত্তর দিয়ে শান্ত অপরাধীর মত তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমাকে বোসতে বোলে তাঁর ভৃত্যকে তিনি তাঁর বাক্সটা আন্‌তে আদেশ দিলেন। আবার বাক্স! সর্ব্বনাশ, এখনি হয় ত তিনি হরেক রকম ভাষায় লেখা এক তাড়া সার্টিফিকেট খুলে বোস্‌বেন, আর এই সব পাহাড়ীদের সম্মুখে আমাকে তার ব্যাখ্যা কোর্ত্তে হবে! কি কুক্ষণেই আজ বাজারে পা দিয়েছিলুম, মনে বিলক্ষণ অনুতাপের উদয় হোলো; কিন্তু সে জন্য জ্যোতিষী মহাশয়ের বাক্সের শুভাগমন বন্ধ রইল না।

যা হোক্ শীঘ্রই আমার ভয় দূর হোলো; দেখলুম, এবার আর তিনি সার্টিফিকেটের তাড়ায় হাত দিলেন না, বাক্সের মধ্য হোতে একখানা খাম বের কোরে হাস্যপ্লুত মুখে আমার দিকে চাইলেন এবং সেই খামখানি আমার হাতে দিলেন। খামখানি সমচতুষ্কোণ, সুন্দর মসৃণ এবং পুরু, ডাকহরকরাদের ময়লা হাতের সংস্পর্শে কিঞ্চিৎ শ্রীভ্রষ্ট; খামের সম্মুখে সুন্দর ইংরেজী অক্ষরে জ্যোতিষী মহাশয়ের নাম লেখা, অপর দিকে স্বর্ণবর্ণে অঙ্কিত একটী মনোগ্রাম; মনোগ্রামটি দেখে লেখকের নাম ঠিক ধোরতে পাল্লুম না; ডাকঘরের মোহর দেখে বুঝলুম এ চিঠি কলিকাতা থেকে আসছে। চিঠিখানা হাতে কোরে কি কর্ত্তব্য ভাবছি; তখন জ্যোতিষী মশায় চিঠিখান পোড়তে আমাকে অনুমতি কোল্লেন। পত্র খুলে দেখলুম কলিকাতা হোতে মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর জ্যোতিষী মহাশয়কে এই পত্র খান লিখেছেন! হিন্দী ভাষায় লেখা, মহারাজের স্বাক্ষর ইংরাজীতে। জানিনে পত্রখানি রচনা কার, কিন্তু যাঁরই রচনা হোক ভাষাটি অতি সুন্দর; হিন্দি ভাল লিখিতে না পারি, বহুদিন

এবং এ হিন্দিভাষীর দেশে থেকে ভাষার ভালমন্দ বুঝবার একটু ক্ষমতা হোয়েছিল। বহুদূরদেশপ্রবাসী—একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের জন্য মহারাজ বাহাদুরের এরূপ যত্ন প্রশংসনীয়। জ্যোতিষী মহাশয়ের শরীর ভাল নয়, তাই মহারাজ তাঁকে দেশভ্রমণ ত্যাগ কোরে শীঘ্র দেশে, অথবা কলিকাতায় প্রত্যাগমনের জন্য বার বার অনুরোধ কোরে পত্র লিখেছেন। জ্যোতিষী মশায় আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, আমার সঙ্গে মহারাজের আলাপ আছে কি না। মহারাজের অনেক মহৎগুণের কথাও আমাকে বোল্লেন, তিনি যে অনেক বড় বড় রাজা ও মহারাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাও দুচারটি উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ কোল্লেন। প্রশংসাভাজন লোকের প্রশংসা করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দের বিষয় এই যে কতকগুলি বিদেশী লোক একত্র হোয়ে এই সুদূরবর্ত্তী হিমালয়ের অন্তরালে আমার একজন স্বদেশী এবং স্বজাতির এমন প্রশংসা কোল্লেন। স্বজাতির সমস্ত লোকের মধ্যে পরস্পর যে একটা হৃদয়ের গভীর টান আছে, সে দিন তা আমি বেশ বুঝেছিলুম; বুঝি শত লক্ষ বাঙ্গালীর মধ্যে দাঁড়িয়ে বাঙ্গালীর প্রশংসা শুন্‌লে মনে এমন আনন্দের সঞ্চার হোতো না; কিন্তু এখানে বাঙ্গালী আমি একা—স্বদেশ আমার বহু পশ্চাতে—সেই প্রাতঃসূর্য্যের স্নিগ্ধ মধুর কিরণোজ্জ্বল আমার মাতৃভূমি, সেই নদীমেখলা শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশ—আমার মা বাবা ভাই বোনের পবিত্র স্মৃতিভূষিত, চিরবাঞ্ছিত ভূস্বর্গ, আমার তৃষিত হৃদয়ের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার ধন! এখানে প্রত্যেক বাঙ্গালীর স্মৃতিই আমার কাছে পরম আদরের বস্তু। আমার বোধ হোতে লাগলো জ্যোতিষী মহাশয়ের নিকট আমার একজন প্রিয়তম পরমাত্মীয়ের গল্প শুনছি।

জ্যোতিষী মহাশয়ের একটা বাহাদুরী এই যে, তিনি গল্প কোরে কখন ক্লান্ত হন না; ছেলেবেলায় বর্ষাকালে কতদিন সন্ধ্যাবেলা ঘরের মধ্যে মাদুর বিছিয়ে শুয়েছি, আর স্তিমিত প্রদীপের কাছে বোসে পিসিমা তাঁর

দৈত্য দানব, রাক্ষস-রাক্ষসীর রূপকথা বোলতেন; আষাঢ়ের সেই দীর্ঘ দিনের অবসানে খেলা-শ্রান্ত, ক্লান্ত শিশুশরীরটি নিতান্ত আলস্য-বিজড়িত হোয়ে উঠ্‌তো; তার পর মেঘমণ্ডিত রাত্রি, মেঘের ডাক্‌, বৃষ্টির ঝম্‌ ঝম্‌ শব্দ, সেই শব্দে বিশ্বের সমস্ত নিদ্রা একত্র জড় হোয়ে কোমল নয়নপল্লব ঢেকে ফেলতো; পিসিমার অসম্ভব আষাঢ়ে গল্পের অসম্ভব নায়কটি, তার প্রেয়সীর অনুরোধে যখন অতল মহাসমুদ্রে ডুব দিয়ে অঞ্জালপুরে পদ্মরাগমণি তুলছে, ঠিক সেই সময়ে আমাদের "হুঁ" বলা বন্ধ হোয়ে যেত, পিসিমাও তাঁর শ্রোতাদিগকে নিদ্রাকাতর দেখে দুঃখিত মনে হরিনামের মালায় অধিক কোরে মনঃসংযোগ কোরতেন; কিন্তু জ্যোতিষী মশায় গল্প কর্‌বার সময় পিসিমায়ের চেয়েও বাড়িয়ে তোলেন। কেউ তাঁর কথায় "হুঁ" বলুক আর না বলুক, শুনুক আর না শুনুক, তিনি অনর্গল বোলে যান, এবং বোধ করি তাতে তাঁর তৃপ্তির অভাব হয় না। তবে সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর নিবিষ্টচিত্ত সহিষ্ণু শ্রোতা প্রায়ই দেখা যায়। আজ গল্পের অনুরোধে বেলা ১টা পর্য্যন্ত জ্যোতিষী মশায়ের স্নানাহার হয় নি; আমি তাঁকে সে বেলার মত সভাভঙ্গ কোর্ত্তে অনুরোধ কোল্লুম। তিনি উঠি গেলেন, আমিও সে স্থান পরিত্যাগ কল্লুম।

বাজারের দিক্‌ ছেড়ে যে দিক্‌ দিয়ে বদরিকাশ্রমে যেতে হয়, সেইদিকে খানিক দূর গেলুম। কিছু দূর গিয়ে দেখি একদল সাধু আসছে। পাঠকগণের হয় ত মনে আছে, আমরা যখন এই পথে আসি, তখন দ্বিতীয় দিনে এক দল উদাসী সাধুর সঙ্গে আমাদের দেখা হোয়েছিল—এ সেই দল; কেদারনাথ দর্শন কোরে আজ এখানে এসেছে। সাধুদের কাহারও কাহারও সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় হোয়েছিল; তাদের সঙ্গে যথারীতি অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদন শেষ হোতে না হোতেই আমার সেই পূর্ব্বপরিচিত বাঙ্গালী সাধুটি এসে উপস্থিত হোলেন, এবং আনন্দের সঙ্গে আমাকে আলিঙ্গন কোল্লেন; পরিষ্কার বাঙ্গালায় বোল্লেন,

"ভাই আর যে তোমার সঙ্গে দেখা হবে এ আশা ছিল না" —সেই সরল সাধুকে পেয়ে আমার বড়ই আনন্দ হোলো। আজ আমার মনের অবস্থা অতি খারাপ, এ অবস্থায় আমার সমধর্ম্মী একজন স্বদেশী লাভ বিধাতার বিশেষ অনুগ্রহ বোলে মনে হোলো! সাধুকে সঙ্গে নিয়ে আড্ডার দিকে চোল্লুম; তাঁর সঙ্গে খান দুই পুথি, একটা কমণ্ডলু, আর একখানি ছেঁড়া কম্বল। তাঁর তখনও আহারাদি হয় নি। আমি বাজার হোতে তাঁকে খাদ্য সামগ্রী কিনে দিতে চাইলুম, কিন্তু তিনি তাতে নিষেধ কোল্লেন, বোল্লেন সঙ্গীদের কারও খাওয়া দাওয়া হয় নি, এ অবস্থায় তাঁর আহারাদি শেষ করা নিয়ম-বহির্ভূত। কোন দিনই বেলা চারিটার আগে তাঁহার আহার হয় না, কারণ দলে লোক অনেক, তার উপর গ্রন্থ সাহেবের পূজা আছে, পূজা ও ভোগের পর ইহারা আগে অতিথি অভ্যাগতদিগের আহার করায় পরে নিজেদের ব্যবস্থা।

আমরা ঘুরতে ঘুরতে বেলা তিনটার সময় বাসায় ফিরে এলুম। স্বামীজি ও শ্রীমান্ অচ্যুতানন্দ বাসাতেই ছিলেন। আমরা চারিজন গল্প আরম্ভ কোল্লুম। কিন্তু সংসারে অবিমিশ্র সুখ কোথায়? গল্পের আরম্ভেই অচ্যুত ভায়া আগন্তুক সাধুর সঙ্গে তর্ক করবার এক বিপুল আয়োজন কোরে বোসলেন। সাধুটির তখনো আহার হয় নাই এবং পথশ্রমে তিনি নিতান্ত ক্লান্ত সুতরাং তিনি তর্কের সুবিধা সত্বেও তাহাতে মনোযোগ দিলেন না। বেলা প্রায় চারটে বাজে দেখে আগন্তুক সাধু উঠে গেলেন, বোল্লে শীঘ্রই আবার ফিরে আসবেন; আসন্ন তর্কের আশা বিলুপ্ত হওয়াতে বৈদান্তিক নিরুৎসাহ চিত্তে নিশ্চলদাসের বেদান্তদর্শন খুলে বোসলেন। আমি দেখলুম, বেচারা নিতান্ত অসুবিধায় পেড়েছে, অতএব প্রস্তাব কল্লুম, "এস এই তীর্থস্থানে বোসে আমরা একটু শাস্ত্রালোচনা করি।" এই রকম শাস্ত্রালোচনা যে তর্কযুদ্ধের ভূমিকা, তা স্বামীজির বুঝতে বাকী রহিল না। তিনি বোল্লেন, "তোমরা বাপু শাস্ত্র চর্চ্চা কর, আমি একটু বাহিরে যাই।" স্বামীজি

রণে ভঙ্গ দিলেন; আমরা মায়াবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিবর্ত্তনবাদ প্রভৃতি নিয়ে এক ঘোর দার্শনিক তর্ক জুড়ে দিলুম। আমার উদ্দেশ্য অচ্যুতভায়াকে কিছু জব্দ করা, সুতরাং যত তর্ক করি না করি, ক্রমাগতই বলি, "আরে ভাই, তুমি যে এ সোজা কথাটা বুঝতে পাচ্ছ না, এটা যার মাথায় না আসে তার পক্ষে তর্ক না করাই নিরাপদ।" বুদ্ধির উপর দোষারোপ কোল্লে, অতি ভাল মানুষেরও রাগ হয়। বৈদান্তিক আরও অসহিষ্ণু হোয়ে উঠলেন, এবং অধিক উৎসাহের সঙ্গে নানা রকমের শ্লোক আউড়াতে লাগলেন, আমি বলি, "হোল না,—হোল না, ও শ্লোকটা ঠিক এখানে খাটবে না।" "কেন খাটবে না" বোলে তিনি আবার সেই সকল শ্লোকের ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন, কোন্ টীকাকার কি বোলে গেছেন তা পর্য্যন্ত বাদ গেল না।

ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত। স্বামীজির সঙ্গে সাধু কুটীরে প্রবেশ কোল্লেন, তখনও আমাদের তর্ক সমান ভাবে চোলছে; স্বামীজি বৈদান্তিককে ডেকে বল্লেন "রাত্রি হোয়ে এল, শুধু তর্কেতে ক্ষুধা নিবৃত্তির কোন সম্ভাবনা নেই, এখন তর্ক ছেড়ে আহারের বন্দোবস্তে মন দিলে হয় না কি?" প্রবল যুদ্ধের মধ্যে সন্ধির শ্বেত নিশান দেখালে যেমন অর্দ্ধপথে যুদ্ধ নিবৃত্তি হয়, তেমনি স্বামীজির এই কথায় তর্কযুদ্ধ হঠাৎ থেমে গেল। পৃথিবীর অনেক তর্ক অন্নচিন্তায় নিষ্পত্তি হয়ে যায়, আমাদেরও তাই হোলো। সেই সন্ধ্যাকালে দিবা রাত্রি, আলো এবং অন্ধকারের মধুর মিলনক্ষণে স্বামীজি ও আগন্তুক সাধু সংযতহৃদয়ে পুরাণের শান্ত-গম্ভীর বিষয় আলোচনা কোর্ত্তে লাগলেন; তখন দূর মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনিত হোচ্ছিল, দূরে সন্ন্যাসীর দল সমস্বরে ভজন আরম্ভ কোরেছিল। তাঁদের সেই ভজনের সুরে আমার একটি পরিচিত ভজন মনের মধ্যে জেগে উঠল, আমার প্রাণের মধ্য হোতে একটা ব্যাকুল স্বর নিতান্ত কাতর ভাবে যেন গাহিতে লাগিল—

"কি করিলি মোহের ছলনে।
গৃহ তেয়াগিয়া, প্রবাসে ভ্রমিলি,
পথ হারাইলি গহনে।
(ঐ) সময় চলে গেল, আঁধার হোয়ে এল,
মেঘ ছাইল গগনে।
শ্রান্ত দেহ আর, চলিতে চাহে না,
বিঁধিছে কণ্টক চরণে।"

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এগানটি পুনঃ পুনঃ আমার মনে ধ্বনিত হোতে লাগল। কেবলই মনে হোতে লাগল, "শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাহে না—বিঁধিছে কণ্টক চরণে।" নানকের কথা ও কবিরের দোঁহা আবৃত্তি কোরে অনেক রাত্রে আগন্তুক সাধু ও স্বামীজি শয়ন কোল্লেন, আমিও কুটীরের এক প্রান্তে কম্বলশায়ী হোলুম। এবারের মত আমাদের তীর্থযাত্রা শেষ হোলো, সকালে আমরা দেশে ফিরিব,—দেখি নূতন পথে নূতন দেশ দিয়ে ফিরে যেতে যদি কোন রত্নের সন্ধান পাই।

প্রত্যাবর্ত্তন

২৯শে মে, শুক্রবার,—অপরাহ্নে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হই। শনি, রবিবার সেই পবিত্র তীর্থেই কাটান গেল। আমাদের হিন্দুদিগের মধ্যে একটা নিয়ম আছে, প্রত্যেক তীর্থস্থানেই তে-রাত্রি বাস কোরতে হয়। আমরা হিন্দুধর্ম্মের সকল নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন না কোল্লেও তীর্থস্থানে তে-রাত্রি বাসের পুণ্য অর্জ্জন করা গেলো।

তিন দিন কাটান গেল, তবু এখান হোতে ফিরতে ইচ্ছা হয় না, এমন সুন্দর স্থান! ভারতে সুন্দর অনেক স্থানই দেখা গিয়াছে, কিন্তু এমন শান্তিলাভ আর কোথাও হয় নি। অনন্ত সুন্দরের পরিপূর্ণ সত্তার

আত্মাকে বিসর্জ্জন দিয়ে যে তৃপ্তি, তা এখানেই পাওয়া যায়। তৃষিত পান্থের জীবনব্যাপী পিপাসা নিবৃত্ত হয়। কিন্তু হায়! তথাপি চপল, চঞ্চল চিত্ত অধীর হোয়ে উঠে, ও সূর্য্যের উজ্জ্বল আলো, চন্দ্রের সুবিমল স্নিগ্ধ হাসি, নীল আকাশ ও আমাদের মাতৃস্বরূপিণী, ফলপুষ্প-শোভিনী বসুন্ধরা সমস্ত অন্ধকার বোলে প্রতীয়মান হয়।

তাই এই নিভৃত পার্ব্বত্য-কুঞ্জে শান্তির আলয়ে এসেও মধ্যে মধ্যে প্রাণটা দূর দেশে ছুটে যেতে চায়। যখন পথভ্রমণে পা দুটি অসাড় হোয়ে এসেছে এবং মন আর কোথাও যেতে রাজি হচ্ছে না, তখন একটা বদ্-খেয়াল দুরন্ত-স্কুল মাষ্টারের মত কাণটা ধরে নাড়া দিচ্ছে, আর বোলছে, "আর কাজ কি এখানে, কম্বল ঘাড়ে কোরে বেরিয়ে পড়া যাক্।" ইচ্ছা না থাকলেও মন এ কথার বিরুদ্ধে কাজ কোর্ত্তে সক্ষম নয়। সুতরাং দেশের দিকেই ফিরতে হোচ্ছে।

কিন্তু আর এক মুস্কিল। আমি একা নয়; আমার ন্যায় বাধাহীন, বন্ধন-শূন্য, উদ্দাম, অসংযত প্রাণীর কণ্ঠরজ্জু আর দুইজন পথিকের করলগ্ন; তাঁরা হোচ্ছেন বৈদান্তিক ভায়া ও স্বামীজী। এমন সাদৃশ্যহীন তিনটি মনুষ্য একসূত্রে গাঁথা কতকটা বিস্ময়কর বটে। কিন্তু আর বুঝি শেষ রক্ষা হয় না। বৈদান্তিক এখানে আহার কোচ্চেন, আর মহা-স্ফূর্ত্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বহুদিন পরে ইচ্ছামত সময়ে আহার এবং উপযুক্ত কালে নিদ্রালাভ কোর্ত্তে পেয়ে ভায়া আপন খেয়ালেই ঘুরে বেড়ান, কাকেও গ্রাহ্য করেন না। দেশে ফিরবার কথা তুল্লেই গম্ভীরভাবে বলেন, "গৃহধর্ম্মে বিরক্ত সন্ন্যাসীর এ উপযুক্ত কথা বটে!" কথাটা ঠিক কি ভাবে আমার কাণে প্রবেশ কোল্লে, তা জান? আমার বোধ হোলো নিশীথ রাত্রে কারাবরুদ্ধ জগৎসিংহের কাছে আয়েসাকে দেখে শ্লেষরুদ্ধকণ্ঠ ওসমান যখন বোল্‌ছেন, "নবাবপুত্রীর পক্ষে এ উপযুক্ত বটে!" কি বোলবো, হৃদয়ে আয়েসার মত আবেগ ছিল না, থাকলে বৈদান্তিককে

বোলতুম,—কি বোলতুম এখন সে কথা ভারি শক্ত; তবে তাকে কখনই পল্লী-মাতার অজস্র স্নেহ-রস-পুষ্ট মা-হারা আর্ত্ত সন্তান বোলে অভিহিত কোত্তুম না।

বৈদান্তিকের কথায় নিরুৎসাহ হোয়ে স্বামীজির কাছে বদরিকাশ্রম-ত্যাগের প্রস্তাব কোল্লুম। তিনি বোল্লেন, "আরও দিন কতক থাকা যাক্; চিরদিনই ত ঘুরুছি। এখন দিনকতক বিশ্রাম করা মন্দ কি?" আমি মনে কোল্লুম বৃদ্ধ পথশ্রমে ক্লান্ত হোয়ে পড়েছেন। তাঁর অপরাধ কি? তাঁর জীবনে পরিশ্রম অল্প হয় নি। আমি জীবনের মধ্যাহ্নকালে তাকে সংসার-যুদ্ধে পরাভূত, অক্ষম, বৃদ্ধ বোলে মনে কোরেছিলুম, কিন্তু এরূপ মনে করার আমার কোন অধিকার ছিল না। যে বয়সে লোকে পৌত্র-পৌত্রী-পরিবেষ্টিত হোয়ে আরাম উপভোগ করে, সে বয়সে তিনি অসুরের মত পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! এরূপ অবস্থায় দুদিন বিশ্রামের জন্য তাঁর হৃদয় ব্যগ্র হবে, তার আর আশ্চর্য্য কি? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি আজ হঠাৎ আমাকে উপদেশ দিতে আরম্ভ কোল্লেন। শুষ্ক কঠোর উপদেশের উপর আমার বড় শ্রদ্ধা নেই, তাও তিনি জানতেন, তবু ইচ্ছা-প্রবৃত্ত হোয়ে তাঁর এ কষ্ট স্বীকারের আবশ্যকতা বুঝলুম না;—শুধু মাথার উপর অবিরল ধারে উপদেশস্রোত বর্ষণ হোতে লাগল। ক্রমে তাঁর আসাম ভ্রমণের কথা, কুলি-কাহিনী হোতে আরম্ভ কোরে—কবির, নানক ও তুলসীদাসের দোঁহা পর্য্যন্ত কিছুই বাদ গেল না। স্বামীজি যখন দেখলেন যে তাঁর উপদেশে কোনই ফল হবার সম্ভাবনা নেই, আমার সংকল্প আমি ছাড়ছিনে, এবং এই রকমে চির জীবনটা দেশে দেশে ঘুরে কাটানই আমার অভিপ্রেত—তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোল্লেন "তবে কালই বেরিয়ে পড়া যাক্!" সুতরাং বৈদান্তিককে হাত করা আর কঠিন হলো না। তিনজনে পরামর্শ কোরে স্থির করা গেল—কালই প্রাতঃকালে বদরিনাথ পরিত্যাগ কোর্ত্তে হবে।

অপরাহ্নে পাণ্ডা লছমীনারায়ণ আমাদের আড্ডায় আহারের কোন রকম আয়োজন কোর্ত্তে নিষেধ কোল্লে। বুঝলুম তার বাড়ীতে আয়োজন হোচ্ছে। সন্ধ্যাকালে আর কোন কাজ নেই, শেষ বারের জন্য বদরিনাথ প্রদক্ষিণ কোর্ত্তে বের হলুম।

বাজারের মধ্যে উপস্থিত হোয়ে দেখ্‌লুম কাশীনাথ জ্যোতিষী মহাশয় অনেকগুলি পাণ্ডা সাধু সন্ন্যাসী-পরিবৃত হোয়ে একটা ঘরে বোসে আছেন; আমাকে নিকটে ডাক্‌লেন। এ সময় আমার মনটা বড় ভাল ছিল না, কিন্তু তাঁর কথা অগ্রাহ্য কোর্ত্তে পাল্লুম না। তাঁর নিকট উপস্থিত হোলে তাঁর ইংরাজী সার্টিফিকেট আমাকে দিয়ে তর্জ্জমা করিয়ে নিলেন; তার পর আমার প্রশংসা আরম্ভ হোলো; ভবিষ্যতে আমার যে মঙ্গল হবে তিনি সে দৈববাণী ও কোল্লেন এবং আমরা শীঘ্রই বদরিনাথ ছাড়ছি শুনে আমাকে পথখরচের সাহায্য কোর্ত্তে চাইলেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে এবং তার এই অযাচিত অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সেখান হোতে বিদায় হোলুম। বিদায়কালে তিনি আমাকে বিশেষ অনুরোধ কোল্লেন, যেন কলিকাতাতে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমার দুর্ভাগ্য, বঙ্গদেশে ফিরে আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি।

এখানকার পোষ্ট আফিসে গেলুম, পোষ্টমাষ্টারের সঙ্গে খানিক আলাপ কোরে নারায়ণের মন্দিরের দিকে যাচ্ছিলুম, পথের মধ্যে শুন্‌লুম—মন্দির-দ্বার বন্ধ হোয়ে গেছে, সুতরাং আর নারায়ণ দর্শন হলো না। যখন বাসায় ফিরে এলুম তখন ঘণ্টা খানেক রাত্রি হোয়েছিল।

কিয়ংক্ষণ পরেই পাণ্ডা লছমীনারায়ণ আর তার কর্ম্মচারী পাণ্ডা বেণী-প্রসাদ এক হাঁড়ি উৎকৃষ্ট খিচুড়ী ও একটা থালে খানিক তরকারী, তিন চারি রকমের চাটনি, আর কতকগুলো পেড়া নিয়ে উপস্থিত হলো। রসনেন্দ্রিয় এ সকল আস্বাদন-সুখ বহুকাল অনুভব করে নি, আমি যথেষ্ট আশ্বস্ত হোলুম। স্বামীজি একবার বৈদান্তিকের দিকে চেয়ে দেখলেন

এই আশাতিরিক্ত ভোজনদ্রব্য দেখে ভায়ার কি আনন্দ! তাঁর সেই লুব্ধ ব্যগ্রদৃষ্টির কথা অনেককাল মনে থাক্‌বে! আহার বিষয়ে আমিও পশ্চাৎপদ নহি, কিন্তু এখন পর্ব্বতের মধ্যে কঠোর সন্ন্যাসে আমার আহার-প্রবৃত্তিটা কিছু খর্ব্ব হোয়ে পোড়েছিল। আজ পূর্ণ উৎসাহে লছমীনারায়ণের আনীত দ্রব্যগুলির সৎব্যবহার করা গেল। স্বামীজি বোল্লেন "অচ্যুত, এবার আমাদের যাত্রা ভাল, রাস্তায় আহারের কষ্ট হবে না!" স্বামীজির এই ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হয়েছিল—কিন্তু অচ্যুত ভায়ার অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য ঘটে নি—কয়েকদিন পরে তিনি আমাদের সঙ্গ ছেড়ে চোলে গিয়েছিলেন।

আহারান্তে পাণ্ডাদের কিছু দান করা গেল,—পরিমাণে অধিক নয়। ভবিষ্যতে আরও কিছু দান করবার আশা দেওয়া গিয়েছিল; কিন্তু তা আর পূর্ণ হয় নি, পূর্ণ হবারও কোন সম্ভাবনা নেই। রাত্রেই পাণ্ডাদের কাছে বিদায় নিলুম। সে সময় লছমীনারায়ণ আমাকে একটা অনুরোধ কোরেছিলেন,—তা এই যে, "আমরা বদরিকাশ্রমে এসে যত দিন এখানে ছিলুম,—ততদিন আমাদের কোন অসুবিধা ভোগ কোর্ত্তে হয় নি, পাণ্ডা লছমীনারায়ণ ভারি 'জবর' পাণ্ডা, সে আমাদের খুব যত্ন কোরে রেখেছিল" এই কথা কটা খবরের কাগজে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ কোর্ত্তে হবে। তার বিশ্বাস আমাদের মত বড় বড় (?) লোক যদি ছাপার অক্ষরে তার জন্যে দুকথা লেখে, তা হোলে তা অব্যর্থ; তার পসার অনতিবিলম্বেই ভারি জাঁকিয়ে উঠবে। আমি সেই সরল-প্রকৃতি, উপকারী পাণ্ডার অনুরোধ রক্ষা কোরেছিলুম। আমার জনৈক বন্ধুর দ্বারা পশ্চিমদেশের দুই একখানি হিন্দী সংবাদপত্রে লছমীনারায়ণের গুণের কথা, বিশেষতঃ সে দেবপ্রয়াগে যে রকম কষ্ট স্বীকার কোরে দক্ষতার সঙ্গে আমার হৃতসর্ব্বস্ব উদ্ধার করেছিল, তা সেই পত্রের মধ্যে বাহুল্যরূপে উল্লেখ করা গিয়েছিল। এই প্রশংসাপত্র প্রকাশ করাতে লছমীনারায়ণের কোন উপকার হোয়েছে

কি না এবং তার পসার কিরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে, তা জান্‌তে পারি নি, তবে এ কথা স্পষ্ট বুঝতে পারা গিয়েছিল যে, সর্ব্বত্রই মানব হৃদয়ের প্রবৃত্তি এক রকম। খবরের কাগজে নাম প্রকাশের জন্য আমরা সুসভ্য মানব-সন্তানগুলি কি নিদারুণ আয়াস স্বীকারই না করি? পর্ব্বতবাসী অশিক্ষিত পাণ্ডাপুত্রের নিকটও এ প্রলোভন সামান্য নয়। নারায়ণক্ষেত্রে রাত্রি কেটে গেল।

১লা জুন, সোমবার—অতি ভোরে যাত্রা করা গেল। আজ আমাদের নূতন রকমের 'প্রোগ্রাম'; আমি প্রস্তাবকারী, আর স্বামীজি সমর্থনকারী; কাজেই অচ্যুতানন্দ আমাদের মতেই বাধ্য। আমরা স্থির কল্লুম—গতবারের মত হনুমান চটিতে অল্পকাল বিশ্রাম কোরে এবং সম্ভব হোলে সেখান হোতে জলযোগ শেষ কোরে রওনা হব। পাণ্ডুকেশ্বরে সেবার শিরঃপীড়ায় অত্যন্ত কাতর হোয়ে পোড়েছিলুম,—জীবনের আশা বেশী ছিল না; সেই কথা মনে হওয়াতে পাণ্ডুকেশ্বরের প্রতি সহানুভূতি নিতান্ত হ্রাস হোয়েছিল; জানি যে তাতে পাণ্ডুকেশ্বরের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই, তথাপি স্থির কোল্লুম—সেখানে এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করা হবে না। পাণ্ডুকেশ্বরে যদি সে দিন না থাকি—তা হোলে আমাদের একেবারে বিষ্ণুপ্রয়াগে আড্ডা নিতে হবে। নারায়ণ হোতে বিষ্ণুপ্রয়াগ আঠার মাইল; সমতলক্ষেত্রে আঠারো মাইল পথ পদব্রজে চলা তেমন কিছু কঠিন কাজ নয়—অনেকেই চোলেছেন। কিন্তু এই পার্ব্বত্য আঠারো মাইলের মধ্যে যে চড়াই ও উৎরাই, এ রকম অতি কমই দেখা যায়। ইহা একদিনে হেঁটে শেষ করা প্রচুর সামর্থ্যের কাজ। স্বামীজি বৃদ্ধ বয়সেও এই দুর্গম পথ অনায়াসে অতিক্রম কোর্ত্তে প্রস্তুত, শুনে আমার মনে অত্যন্ত আনন্দ হোলো।

নির্জ্জন, সঙ্কীর্ণ, পার্ব্বত্য-পথ দিয়ে তিন জনে চোলছি। কারো মুখে কথা নেই, সকলেই নিজ নিজ চিন্তায় ব্যস্ত। মনটা ভারি উৎক্ষিপ্ত-

চিরদিনের জন্য বদরিকাশ্রম ছাড়বার পূর্ব্বে সুন্দর পথ, ঘাট, পরিচিত অপরিচিত প্রত্যেক লোকের বাড়ী—তুষারাচ্ছন্ন বঙ্কিম গিরিনদী—ঊর্দ্ধে অগণ্য তুঙ্গশৃঙ্গ; এবং পর্ব্বতের মধ্যদেশে সমুন্নত সুন্দর বৃক্ষরাজী দেখ্‌তে দেখ্‌তে অগ্রসর হলুম। অনেকখানি বেলা হোলে আমরা হনুমান চটিতে উপস্থিত হোয়ে জলযোগের যোগাড়ে মনোনিবেশ কোল্লুম। অধিক বিলম্ব হোলো না—প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে আবার চোলতে আরম্ভ করা গেল। প্রায় আধ মাইল যাবার পর পথিমধ্যে দেখি—একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাদের দিকে আসচেন। পোষাক আধা সন্ন্যাসী আধা গৃহস্থ রকমের। গৈরিক বসন, অথচ পায়ে জুতো, মাথায় ছাতা আছে; বর্ণ গৌর, চেহারা দেখে মনে হোলো ভদ্রলোকটি সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব; বয়স ৪০।৪২ বৎসর হবে। আমি ও স্বামীজি একত্রেই চলছিলুম,—পথিক স্বামীজিকে দেখে "নমস্কার মশায়" বোলে অভিবাদন কোল্লেন। স্বামীজী কিন্তু তাঁকে চিন্‌তে না পারায় তিনি বোল্লেন, "মশায় আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছেন না, আপনার সঙ্গে সেই আমার বম্বে কংগ্রেসে দেখা?" স্বামীজী তথাপি তাঁকে চিন্‌তে না পারায় কিছু বেশী সঙ্কুচিত হোয়ে পোড়লেন। পথিক বদরিকাশ্রম সম্বন্ধে দুই চারিটা জ্ঞাতব্য কথা জিজ্ঞাসা কোরে চোলে গেলেন, নিজের কোন পরিচয়ই দিলেন না। তাঁর পরিচয় জান্‌বার জন্যে আমার ভারি কৌতূহল হোয়েছিল, কিন্তু স্বামীজিকে নীরব দেখে আমার কোন কথা জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে সাহস হোল না; কারণ এপর্য্যন্ত তাঁর যা কিছু আলাপ তা স্বামীজির সঙ্গেই হোচ্ছিল, আমি মধ্যে হোতে দু কথা জিজ্ঞাসা কোরে কেন নিজের বর্ব্বরতার পরিচয় দিই।

লোকটি বদরিকাশ্রমের উদ্দেশে চোলে গেলেন। আমরাও গন্তব্য পথে চোল্লুম। স্বামীজি বার বার বোল্‌তে লাগলেন, আমি যেন পাণ্ডুকেশ্বর হোতে বিষ্ণুপ্রয়াগ পর্য্যন্ত ভয়ানক রাস্তাটা খুব আস্তে আস্তে চলি। এদিকে প্রত্যেক কাজে তাঁর উপদেশের বিরুদ্ধাচরণ করা অভ্যাস হোয়ে গেলেও

আমি অতি সাবধানে এবং আস্তে আস্তে চোল্‌তেই কৃতসংকল্প হোলুম। কিন্তু তবু চোল্‌তে চোল্‌তে সহসা গতিবৃদ্ধি হোয়ে যায়,—স্বামীজি অনেক পেছনে পড়েন,—আবার তাঁর জন্যে খানিক অপেক্ষা করি।

ক্রমে পাণ্ডুকেশ্বরের বাজারের মধ্যে উপস্থিত হোলুম। বেলা তখন প্রায় দুটো; সূর্য্য পশ্চিম আকাশে একটু ঢোলে পোড়েছেন; রোদ ঝাঁঝাঁ কোরছে; ভয়ানক রৌদ্র, পাহাড়গুলো অগ্নিময়—জলহীন, ধূসর, উলঙ্গ। বাজারের মধ্যে কদাচিৎ এক আধজন লোক দেখা যাচ্ছে। একখান দোকান খোলা, দোকানদার সেখানে নেই, আর একটা দোকান—যে দোকানে আমি গতবারে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করেছিলুম, সে খানা বন্ধ; বোধ করি দোকানী গ্রামান্তরে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহের চেষ্টায় গিয়েছে। আমি একবার ঘৃণাভরে সে দিকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ কোল্লুম; বড় ক্লান্তি বোধ হোয়েছিল,—এক একবার ইচ্ছা হোচ্ছিল, একবার বিশ্রাম করা যাক। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কোল্লুম না। যেমন সবেগে আস্‌ছিলুম, তেমনি চোল্‌তে লাগ্‌লুম। দূর পাহাড়ের গায়ে বহুদূর বিস্তৃত বৃক্ষশ্রেণী, তার নীচে দিয়ে যদি আমাদের গন্তব্য পথ হোতো, তবে সেই স্নিগ্ধ ছায়ায় ক[illegible] অরণ্য উপত্যকার শ্যামল শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেশ আর[illegible] সঙ্গে পথ অতিক্রম করা যেত।

আরাম ভোগের কল্পনা কোচ্ছি, দেবতার বুঝি তা সহ্য হোলো না। চেয়ে দেখি সম্মুখে এক প্রকাণ্ড চড়াই; এতক্ষণে চড়াই উৎরাইএর আরম্ভ হোলো; সুতরাং বিনা প্রতিবাদে অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে চোলতে আরম্ভ কোল্লুম। পদদ্বয় অবসন্ন হোয়ে এল, কিন্তু বিরাম নেই। বেলা প্রায় শেষ হোয়ে এসেছে, বিষ্ণুপ্রয়াগ ভিন্ন এ পথে আর কোথাও 'আড্ডা' পাওয়া যাবে না। বৃদ্ধ স্বামীজিকেও গতিবৃদ্ধি কোত্তে হোলো।

বেলা ঘণ্টা খানেক থাকতে আমরা বিষ্ণুপ্রয়াগেএসে উপস্থিত হোলুম পূর্ব্বের সেই মন্দিরে এবারও বাসা করা গেল। যে দোকানদারের জিম্মা

মন্দির ছিল, সে আমাদের দেখে বিশেষ উল্লাস প্রকাশ কোল্লে। আমরা কেমন ছিলুম, পথে কোন কষ্ট হয় নেই ত, ইত্যাদি অনেক কথা জিজ্ঞাসা কোল্লে। আমি একা দোকানে বোসে। যেদিন এখান হোতে বদরিনাথ যাই সেই দিনের সঙ্গে আজকার প্রভেদ অনুভব কোর্‌তে লাগ্‌লুম। সে দিন কতখানি উদ্যম, উৎসাহ, একটা সুগভীর আকাঙ্ক্ষা এবং একাগ্রতা হৃদয়ের সমস্ত অভাব ও কষ্ট দূর কোরেছিল। আমরা একটা উদ্দেশ্য, একটা ব্রত ধারণ করে চোলেছিলুম। সে ব্রত শেষ হোয়েছে; এখন হৃদয় শূন্য! এই সকল কথা ভাবছি এমন সময়ে স্বামীজি এবং পশ্চাতে বৈদান্তিক ভায়া পরম স্মিতমুখে দর্শন দিলেন। বৈদান্তিককে সহসা ওষ্ঠমূলে হাস্যরসের অবতারণার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর দিলেন, "আজ খুব প্রতিজ্ঞা পালন করা গেছে। একদমে আঠার মাইল, এই পাহাড়ে রাস্তা। এর চেয়ে জঙ্গলে বোসে অনাহারে চক্ষু মুদে তপস্যা করা সহজ।" দোকানদারের পুত্র তার ক্ষুদ্র দেবতাটিকে মন্দিরের মধ্যে জাকিয়ে বসালে। আমরা সে রাত্রে প্রচুর অর্থ ব্যয় কোরে অপ্রচুর আহার্য্য সংগ্রহ পূর্ব্বক কোন রকমে উদর দেবতাকে পরিতৃপ্ত কোল্লুম। অনুষ্ঠানের যে টুকু ত্রুটী হোলো তা নিদ্রাতেই পুষিয়ে গেল। বহুকাল এমন নিদ্রাসুখ অনুভব করা যায়নি।

২রা জুন মঙ্গলবার,—এবার ফেরত পথ, কাজেই কবে কতদূর গিয়ে কোথায় আড্ডা নিতে হবে তা পূর্ব্বেই স্থির কোর্ত্তে পাত্তুম। বিষ্ণুপ্রয়াগ হোতে স্থির করা গেল, সকালে নয় মাইল চোলে দুপ্রহরে কুমারচটিতে থাকা যাবে। পূর্ব্বদিন আঠার মাইল চোলে আমাদের শরীর কিছু বেশী শ্রান্ত হয়ে পোড়েছে; কাজেই গতি কিছু মন্থর। তার উপর আর এক বিপদ; শেষরাত্রি হোতে ভারি মেঘ হোয়েছিল। আমরা যখন রওনা হই, তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পোড়ছিল, কিন্তু অপেক্ষা না কোরে বেরিয়ে পড়া গেল। খানিক পথ অতিক্রম কোর্ত্তে না কোর্ত্তেই বৃষ্টি ভয়ানক চেপে এল। সর্ব্বশরীর ভিজে গেল, তার উপর কম্বল ভিজে এমন ভারি হোয়ে

পোড়লো যে, তা আর সঙ্গে নেওয়া যায় না। নিকটে এমন কোন আড্ডা নেই যে বিশ্রাম করি। অগত্যা ভিজতে ভিজতেই চোল্‌তে হোলো। যদি একবার ঝুপঝাপ কোরে বৃষ্টি হয়ে থেমে যায়, তাকে পারা যায়; কিন্তু এ পার্ব্বত্য বৃষ্টি, সে রকম নয় ত! খানিকক্ষণ বৃষ্টি হোয়ে গেল—চারিদিকে বেশ ফরসা হোলো, একটু একটু রোদও উঠলো। কোথা থেকে হঠাৎ একখান ঘোলা মেঘ এসে আবার খানিক বর্ষণ কোরে গেল—যেন সোহাগের অশ্রু! সে বেশ হাস্‌ছে, হঠাৎ কি একটা কারণ ঘোটল বা ঘোটল না—অমনি প্রবল অশ্রুবর্ষণ আরম্ভ হোলো, সকলেই ব্যতিব্যস্ত। সকালে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে আমরা আট দশবার ভিজ্‌লুম, ভারি বিরক্ত বোধ হোতে লাগলো, দুই তিনটা চড়াই উৎরাই পার হবার সময় পা পিছলে দুই একবার পদস্খলনের সম্ভাবনাও বড় প্রবল হোয়ে উঠেছিল। সুখের বিষয় খুব সাম্‌লানো গেছে।

আজ সকাল হোতে আমাদের নূতন পথ; কুমারচটি থেকে বের হোয়ে যারা যোশীমঠে যায়, তারা খানিক দূরে অগ্রসর হোয়ে উপরের পথে যোশীমঠে প্রবেশ করে; আর যারা বরাবর বিষ্ণুপ্রয়াগ আসে তাদের পথ নীচের দিক্ দিয়ে। আমরা বদরিনাথ দর্শনে আসবার সময় উপরের পথে যোশীমঠে গিয়েছিলুম এবং সেখান হোতে একটা প্রকাণ্ড উৎরাই দিয়ে বিষ্ণুপ্রয়াগে নেমেছিলুম। এবার বিষ্ণুপ্রয়াগের টানা সাঁকো পার হোয়ে আর চড়াইয়ে উঠলুম না; নীচের পথে ধীরে ধীরে উঠ্‌তে লাগলুম। এ পথটা মন্দ নয়। খানিক দূর পর্য্যন্ত অলকনন্দার খুব কাছে দিয়ে গিয়েছে; তার পর যোশীমঠের পথের সঙ্গে মিশবার জন্যে আস্তে আস্তে উপরে উঠেছে।

এ পথে একটা অতি সুন্দর দৃশ্য দেখলুম। বেলা প্রায় এগারটা; মেঘ কেটে গিয়েছে এবং সূর্য্য পাহাড়ের অন্তরাল ছেড়ে উর্দ্ধে, অনেক

দূর উঠেছে; কিন্তু তখনও সমস্ত প্রকৃতি সিক্ত, তাতেই বোধ হচ্ছে, এখনও বেলা বেশী হয় নি। আমরা ধীরে ধীরে গ্রাম্যপথে প্রবেশ কোরেই দেখলুম একটি গৃহস্থের মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে; বিবাহের পর এই তার প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাত্রা। তখন আমোদ উৎসবের মধ্যে গিয়ে শ্বশুরালয়ে একদিন ছিল, আর আজ কত দিনের মত ঘরকন্না কোর্ত্তে যাচ্ছে। তাই তার মা, মাসি, বোন এবং নিতান্ত আপনার জনের ন্যায় পাড়াপড়সীরা এসে রাস্তার ধারে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বিদায় দিচ্ছে। মেয়েদের কারও চোক দিয়ে জল পোড়ছে, কেউ তার হাতখানি ধোরে কত স্নেহের কথা বোল্‌ছে। কিন্তু একটা ব্যাপার আমার সব চেয়ে মধুর বোধ হোলো; যে মেয়েটি শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে, তার কোলে একটী বছর দুয়ের ছোট ছেলে, অনুমান কোল্লুম সে তার ছোট ভাই। ভাইটী কিছুতেই তার শ্বশুরবাড়ী গমনোন্মুখ দিদির কোল ছাড়বে না। যতই সকলে তাকে সাগ্রহে ডাক্‌ছে, ততই সে তার দিদির ঘাড়টী দুহাতে ধোরে বারে বারে মুখ ফিরুচ্ছে, বুঝি সে কত কালের মত তার দিদির স্নেহময় ক্রোড় হোতে নির্ব্বাসিত হোতে বসেছে, তা বুঝতে পেরেই শিশু তার আজন্মের স্নেহাধিকার ত্যাগ কোর্ত্তে অনিচ্ছা প্রকাশ কোচ্ছে এবং অন্যান্য ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা একটা আসন্ন বিপদের কল্পনা কোরে ডাগর চক্ষু মেলে চেয়ে রয়েছে।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখতে লাগলুম। এ পর্ব্বতের উপর পাহাড়ে মেয়ের বিদায় দৃশ্য, কিন্তু এই দৃশ্য আমাদের প্রীতিরসসিক্ত মাতৃভূমি, বহুদূরবর্ত্তী বঙ্গের একটা মধুস্মৃতি মনের মধ্যে জাগিয়ে দিলে; সে যে বাঙ্গলা, আর এ যে পশ্চিমদেশ তা আমরা ভুলে যাই, শুধু মনে হয় সেখানেও যেমন মা ভাই, এখানেও তেমনি। দুই দেশের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর, কিন্তু হৃদয় ও স্নেহের মধ্যে সর্ব্বত্রই অমর-সম্বন্ধ

সংস্থাপিত। বৈদান্তিক ভায়া বোধ করি, এ সমস্ত বিষয় এমন গভীরভাবে চিন্তা করেন না, সুতরাং মুগ্ধ-হৃদয়ে এই বিদায়-দৃশ্য দেখ্‌ছি দেখে তিনি বিদ্রূপ কোরে বোল্লেন "আবার ভাব লাগ্‌লো বুঝি! পথে ঘাটে এ রকম ক'রে ভাব লাগ্‌লে ত রাস্তা চলা যায় না।" আমি তাঁর কথার কোন উত্তর দিলুম না - শুধু কঠোরদৃষ্টিতে একবার তাঁর দিকে চেয়ে চোল্‌তে লাগ্‌লুম।

আমার সঙ্গে জামাইটীও অগ্রসর হোলো, সেই মেয়েটী আমার আগে আগে যেতে লাগলো। যুবক স্ত্রী নিয়ে ঘরে যাচ্ছে, তার চিন্তা, আর কল্পনা এবং সুখ, প্রেমস্বর্গচ্যুত সন্ন্যাসীর আয়ত্তাধীন নয়। সংসারের এই মোহবন্ধনই সোণার বাঁধন।

কুমারচটির কাছেই যুবকের বাড়ী, সে সস্ত্রীক বাড়ীর দিকে গেল, আমরা চটিতে প্রবেশ কোল্লুম। এখনও অনেক বেলা আছে, কিন্তু আজ শরীর বড় অবসন্ন। তার উপর আবার দুর্য্যোগ আরম্ভ হোলো; কতক্ষণ আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল, ভয়ানক মেঘ কোরে পুনর্ব্বার বৃষ্টি আরম্ভ হোলো। পর্ব্বতপ্রান্তে এক অন্ধকার কোণে একা পোড়ে কত কথাই মনে আস্‌তে লাগলো, শুধুই বোধ হোতে লাগলো—

"সংসার-স্রোত জাহ্নবীসম বহু দূরে গেছে সরিয়া,
এ শুধু উষর বালুকা ধূসর মরুরূপে আছে মরিয়া!
নাহি কোন গতি, নাহি কোন গান; নাহি কোন কাজ, নাহিক প্রাণ;
বে সে আছে এক মহানির্ব্বাণ আঁধার মুকুট পরিয়া!"

২রা জুন, মঙ্গলবার—অনেক বেলা থাকতে কুমারচটিতে পৌঁছন গিয়েছিল। চারিদিকে মেঘ খুব আঁধার কোরে এসেছিল বোলে বোধ হচ্ছিল, বুঝি আর বেলা নাই। খানিকক্ষণ ঝুপঝাপ বৃষ্টিবর্ষণের পরই মেঘ কেটে গেল, আকাশ পরিষ্কার হলো, রোদ উঠলো। তখন মনে হোলো

এখনও অনেক বেলা আছে। যদি বেরিয়ে পড়া যায় ত অনেক পথ এগিয়ে থাকা যাবে, স্বামীজির কাছে এই প্রস্তাব কোল্লুম, তাতে তিনি রাজী হোলেন। আর দেরী কি? অমনি লাঠি হাতে, ভিজে কম্বল ঘাড়ে নিয়ে চটি হোতে রওনা হওয়া গেল, কিন্তু সে পাহাড়ে রাস্তায় বেশী দূর যাওয়া হলো না। সূর্য্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লো; পাহাড়ের অন্তরাল হোতে অস্তমিত তপনের আলোতে যতক্ষণ বেশ পথ দেখা গেল আমরা চল্‌তে লাগ্‌লুম। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে খুব মেঘ কোরে এল। আমরাও একটা ক্ষুদ্র চটিতে রাত্রের মত আশ্রয় নিলুম। চটির নাম 'পাতালগঙ্গা'। বদরিনাথে যাবার সময় আমরা এ চটিতে ছিলুম না, এমন কি এটা তখন আমাদের নজরেই পড়ে নি; হয় ত তখন এ চটিটার জন্ম হয় নি! চটির নীচে দিয়ে যে ক্ষুদ্রকায়া ঝরণাটী বোয়ে যাচ্ছিল, তারই নাম অনুসারে এই চটির নাম পাতালগঙ্গা হোয়েছে। পাতালগঙ্গা সত্য সত্যই পাতালগঙ্গা; রাস্তা থেকে অনেক নীচে নেমে তবে নদীর কাছে আসা যায়। কিন্তু চটিওয়ালাদের জলের সন্ধানে নদী তীর পর্য্যন্ত যেতে হয় না; চটির গায়েই একটা ঝরণা আছে, তাতেই জল-কষ্ট নিবারণ হয়। এ দেশের চটি সকল দূরত্ব হিসাবে নির্ম্মিত হয় না, যেখানে ঘর বাঁধিবার সুবিধা, ঝরনা খুব নিকটে এবং জায়গাটা চটিওয়ালার বাড়ীর যথাসম্ভব কাছে, সেইখানেই একটা চটি খোলা হয়। আমরা লক্ষ্য কোরে দেখেছি কোন জায়গায় সাত আট মাইল তফাতে একটা চটি, আবার কোথাও মাইলে মাইলে চটি; আর সে সকল চটিরই বা কি শোভা! তা নির্ম্মাণ করবার জন্যে চটিওয়ালাকে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না, খরচ পত্রও কিছু নেই বল্লেই হয়। গিরিরাজ হিমালয়ের কোলের মধ্যে হাজার হাজার গাছ রোয়েছে, তার তলে প্রচুর লম্বা লম্বা ঘাস। গোটা কতক গাছের ডাল, আর বোঝা কত ঘাস কেটে আন্‌লে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে একখান চটির ঘর তৈয়েরী হয়ে যায়। আর সেই পর্ণকুটীরে

আশ্রয় নেবার জন্যে কত ঝড়বৃষ্টিময়ী অন্ধকার রাত্রিতে আমরা ব্যাকুল হোয়ে উঠেছি, তাও সব দিন অদৃষ্টে জুটে ওঠে নি। সেই পর্ণকুটীরে এসে আমরা যে রকম অকাতরে নিদ্রা যেতুম, তা মনে হলে এখনও কাতর হোয়ে পড়ি। তখন কোন ভাবনা চিন্তা ছিল না, কেমন কোরে যে দিন-পাত হবে, সে কথাও মনে আস্‌তো না, ভগবানের নাম নিযে সমস্ত দিন ঘুরে দারুণ পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে চটিতে এসে পোড়তুম, খাওয়া দাওয়া হোক না হোক, কম্বল গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়া যেতো, আর কোথা হোতে হাটের ঘুম, মাঠের ঘুম, জঙ্গলের ঘুম এসে চোকের পাতা আচ্ছন্ন কোরে ফেলতো। কচিৎ সেই সুখসুপ্তির মধ্যে বাল্যের নিশ্চিন্ত জীবনের, যৌবনের আবেশপূর্ণ সুখ-স্বপ্নের কথা মনে পড়তো; কখন মনে হোতো, পাঠ্যাবস্থায় কলিকাতার সেই ক্ষুদ্র বাসাবাটীতে একখান সতরঞ্চি বিছানো তক্তপোষের উপর শুয়ে নবীন পণ্ডিত মহাশয়ের প্রকাণ্ডাকার সটীক রঘুবংশখানাতে, না হয় চামড়া বাঁধান বিরাটদেহে জু ভলুম ওয়েবষ্টারের ডিক্সনারীতে মাথা রেখে নিদ্রা যাচ্ছি। ও হরি! জেগে দেখতুম, হিমালয়ের মধ্যে এক ভাঙ্গা চটিতে ছেঁড়া কম্বল জড়িয়ে দিব্বি আরা[illegible] শুয়ে আছি, মাথার নীচে একটা ঘাসের আঁটি! বৈসাদৃশ্যটা বড় ক[illegible] নয় ভেবে মনে মনে ভারি হাসি আস্‌তো।

পাতালগঙ্গা চটিতে ঘর বেশী নেই, যাত্রীর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প; যাত্রীর মধ্যে আপাততঃ আমরা তিনটি প্রাণী এবং একটা বিপুলকায় পাহাড়ী। আমরা যে ঘরে বাসা নিলুম, সেই ঘরের মধ্যে এক কোণে একটা লোক একখানা কম্বলে মাথা হোতে পা পর্য্যন্ত সর্ব্বশরীর জড়িয়ে পোড়ে রয়েছে দেখলুম। মনে হোলো হয় ত কোন পথশ্রান্ত সন্ন্যাসী এই নির্জ্জন কুটীরে সাধন ভজনের পরিবর্ত্তে নিদ্রাদেবীর উপাসনা কোচ্ছেন। আমরা ঘরের মধ্যে সোরগোল কল্লেই বিরক্ত হোয়ে তিনি হুহুঙ্কারে উঠে বোসবেন। বাস্তবিক আমাদের কথাবার্ত্তায় লোকটা উঠে

বোসলো, কিন্তু সে কোন সন্ন্যাসী নয়, ষোল সতের বৎসর বয়সের একটি বালক। ষোল সতের বৎসর বয়স হোলে অনেকে দেখতে যুবকের মত হয়, কিন্তু ছেলেটিকে অনেক ছোট বোলে বোধ হলো; শরীর ভারি রোগা। বোধ হোলো, এখনও সে রোগ ভোগ কচ্ছে। আমরা তার সঙ্গে আলাপ কোর্ত্তে লাগলুম, স্বামীজি তার কাছে বোসে গেলেন; আমাদের সঙ্গী পাহাড়ী আহারের যোগাড় কোর্ত্তে গেল।

আলাপ কোরে দেখলুম, ছেলেটী অল্প বিস্তর বাঙ্গালা কথাও জানে, তবে বেশী বাঙ্গালা বলে না; কিন্তু সে যেটুকু বাঙ্গালা বলে তা বাঙ্গালীর উচ্চারিত বাঙ্গালার মত, খোট্টাই ধরণের নহে। তার উচ্চারণ আমাদের মতই সহজ এবং সরল, কণ্ঠস্বর কোমল বিষাদপ্লুত।

আমার মনে ঘোর সন্দেহ হোলো, এ হয়ত বাঙ্গালী; হয় ত কোন কারণে মা বাপের উপর রাগ কোরে, কি মা বাপ নেই, পরের কাছে উপেক্ষা বা অনাদর পেয়ে অভিমান কোরে কোন যাত্রীর দলের সঙ্গে এ অঞ্চলে এসে পোড়েছে; তার পর অনাহারে, পথশ্রমে এবং রোগে ক্লান্ত ও জর্জ্জরিত হোয়ে এই নির্জ্জন পর্ব্বতের নির্জ্জনতর প্রান্তে জীবন মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই অতর্কিত সন্ধ্যায় জীবন বিসর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হোচ্চে। একবার আমার জীবনের সঙ্গে তার জীবনের তুলনা কোরে দেখলুম; সংসারে আমি সকল বন্ধন শূন্য, এও কি তাই? চল্‌তে চল্‌তে পথপ্রান্তে মৃত্যুকেই কি সে জীবনের শেষ ব্রত বোলে মনে কোরেছে? আমার ন্যায় জীবনের সমস্ত বাসনা, সমস্ত আশা এবং আকাঙ্ক্ষাগুলিকে হৃদয় হোতে একে একে খুলে নিয়ে,নদীস্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে ত শূন্যমনে তাকে সংসার ত্যাগ কোর্ত্তে হয় নি? তার পথ ও আমার পথ কখন এক হোতে পারে না; তার এই নবীন জীবনের নূতন উৎসাহ, অভিনব আশা, জাগ্রত আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাণব্যাপী উচ্চাভিলাষ, সমস্ত পরিত্যাগ কোরে সে জীর্ণ চীর গ্রহণ পূর্ব্বক এক অনির্দ্দিষ্ট জীবনপথে অন্ধের ন্যায় চোল্‌তে আরম্ভ

কোরেছে ! এমন কদাচ দেখতে পাওয়া যায়। আর যদি তার মা বাপ থাকে, তবে তাঁদের আজ কি কষ্ট ! অভিমানী বালক হয় ত আজ এই রোগশয্যায় গভীর যাতনার মধ্যে বুঝতে পাচ্ছে, এই পৃথিবীতে যাদের কেউ নাই, তারা কি দুর্ভাগ্য ! জ্বর ও উদরাময়ে কষ্ট পাচ্ছে, এমন সময় যদি স্নেহময়ী মা এসে একটু গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন, কোমলহৃদয়া ছোট্ট ভগিনীটি এসে যদি তার পাণ্ডুর শীর্ণ মুখখানির উপর দুটি করুণ চক্ষুর কোমলদৃষ্টি স্থাপন কোরে বোলতো "দাদা এখন কেমন আছ, তা হোলে হয় ত তার রোগযন্ত্রণা অর্দ্ধেক কমে যেতো। কিন্তু তার দিকে ফিরে চেয়ে যে একবার আহা বলে এমন লোকটী নাই। পৃথিবীর এমন আলো তার কাছে অন্ধকার এবং জীবজগতের হর্ষকাকলী বোধ করি তার কাছে একটা বিকট আগুনদের মত বোধ হোচ্ছে। বালকের কথা ভেবে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হোয়ে উঠ্‌লো। তন্ন তন্ন কোরে তার সম্বন্ধে কথা জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে লাগলুম; সব কথার ঠিক উত্তর পেলুম না। তবে জান্‌তে পারুম আজ দুদিন হোতে এখানে সে পোড়ে আছে, কত লোক যাচ্চে আসচে, কিন্তু কেউ তাকে কোন কথাও জিজ্ঞাসা করে না সঙ্গে দু তিনটি টাকা ও আনা কয়েক পয়সা আছে; যখন একটু ন থাকে, দু পয়সার বুট ভাজা না হয় বহুকালের প্রস্তুত ধূলিপূর্ণ দুর্গন্ধময় পচা প্যাড়া কিনে ক্ষুধা শান্তি করে। উদরাময় ও জ্বরের চমৎকার পথ্য ! অন্য সম্বলের মধ্যে একখানি ছেড়া কম্বল, একটা কমণ্ডলু, আর একটা ছোট ঝুলি, তার মধ্যে হয়ত দু চারিখানি ছেঁড়া কাপড় থাক্‌তে পারে; সেটা আর অনুসন্ধান করা দরকার মনে হোলো না। ছেলেটি ইংরাজীও জানে, শুন্‌লুম সে অম্বালা স্কুলে এন্‌ট্রেন্স পর্য্যন্ত পোড়েছিল, পরীক্ষাও দিয়েছিল, কিন্তু পাশ কোর্ত্তে পারে নি। আমি একবার সন্দেহাকুল চক্ষে তার দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, এন্‌ট্রেন্স ফেল হোয়ে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে আসে নি ত ? আমি তাকে এন্‌ট্রেন্সের পাঠ্যপুস্তকসম্বন্ধে প্রশ্ন কোল্লুম, তাতে

সে যে সকল বইএর নাম বোল্লে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের তা পাঠ্য কি না, তা আমি তখন ঠিক জানতুম না; তবে সে সকল বই আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত বটে। The Book of Worthies কখন পঞ্জাব বিশ্বিদ্যালয়ের এনট্রেন্সের পাঠ্য ছিল বোলে আমার মনে হয় না, তবে ১০৮৮ সালে ঐ বই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রেন্সের জন্য নির্ব্বাচিত হোয়েছিল; সুতরাং বালকটী বাঙ্গালী বোলে আমার সন্দেহ দৃঢ়তর হোলো; এমন সময় সে কি কাজের জন্যে কুটীরের বাহিরে গেল। আমি স্বামীজিকে আমার সন্দেহের কথা জ্ঞাপন কোল্লুম। তিনি কিঞ্চিৎ আবেগের সঙ্গে উত্তর কোল্লেন, ঠিক ও বাঙ্গালী, তাতে আর সন্দেহ নেই, আমাদের কাছে নিশ্চয়ই সমস্ত কথা গোপন কোচ্ছে। ছেলেটি বাহির হোতে আবার ভিতরে এসে বোস্‌লো; স্বামীজি তার নাড়ী পরীক্ষা কোরে বোল্লেন, তখনও খুব জর আছে, উত্তাপ ১০৩ ডিগ্রীর কম নয়। স্বামীজি বালকের মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি রেখে তাকে আমাদের সন্দেহের কথা বোল্লেন। কিন্তু সে যে বাঙ্গালী তা কিছুতেই স্বীকার কোল্লে না; সে বোল্লে অম্বালাতেই তার বাড়ী; মা বাপ কলেরায় মারা গেছে, একটী মাত্র ভগিনী আছে, সেও শ্বশুরগৃহে। মনের দুঃখে সে গৃহত্যাগ কোরেচে; বাড়ীতে যখন কেউ নেই, তখন পাহাড় পর্ব্বতই তার বাড়ী, তার কাছে ঘর বাড়ী, জঙ্গল সব সমান। সে বাঙ্গালী নয়, এ কথা প্রমাণের জন্যে সে বিস্তর চেষ্টা কোল্লে, এবং তার সেই চেষ্টা দেখে আমাদের আরও মনে হোলো এ নিশ্চয়ই বাঙ্গালী, কোন বিশেষ কারণে আত্মগোপন কোচ্ছে। আমি শেষে তাকে বোল্লুম সে যদি বাড়ী হোতে রাগ কোরে এসে থাকে, তবে আমরা তাকে আবার বাড়ী পৌঁছে দিতে প্রস্তুত আছি, আর যদি সে একান্তই বাড়ী ফিরে যেতে না চায় তা হোলে সে আমাদের সঙ্গে যেতে পারে। দেরাদূনে ফিরে গিয়ে যা হয় তার জন্য করা যাবে। সে আমার এ কথার কোন স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে বোল্লে

"আপনারা কেন আমাকে বাঙ্গালী মনে কোচ্ছেন ...লায় যে সকল বাঙ্গালী বাবু আছেন, তাঁদের কাছেই আমি বাঙ্গালা শিখেছি ;" তার এ কথার উত্তর দেওয়া আবশ্যক বোধ কোল্লুম না। আমাদের পাহাড়ী সঙ্গী এমন সময় এসে খবর দিলে যে, আমাদের খাবার প্রস্তুত। বালকটীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বোল্লে তার অত্যন্ত ক্ষুধা হোয়েছে, কাজেই আমাদের জন্যে প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্যের অংশ তাকে দেওয়া গেল ; সে খাদ্যটা কি শুন্‌বেন ? মোটা মোটা আধ পোড়া রুটী আর খোসাওয়ালা কলায়ের ডাল। ১০৩ ডিগ্রী জ্বর ও উদরাময়গ্রস্ত রোগীকে যদি দেশে এই রকম পথ্য দেওয়া হোতো তা হোলে আমরা নিশ্চয়ই Cu...ble homicide not amounting to murder এই অভিযোগে শে... ...য়রা সোপর্দ্দ হোতুম ; কিন্তু এই পর্ব্বতের মধ্যে এ ছাড়া আর অন্য ... কোথায় মিলবে ? রাত্রে বালকটি দু তিন বার উঠে বাইরে গেল, ত...দের ভয় হোল বুঝি আজই সে পেটের ব্যায়রামে মারা যায় ! যে প... ব্যবস্থা তাতে ভয় হবারই কথা, কিন্তু ছেলেটী বোল্লে, তার অবস্থা ...ক ভাল, এমন পরিপক্ক ভাল রুটী বহুদিন তার অদৃষ্টে জোটে নি ; নি... কষ্টে সৃষ্টে যা পারতো তাই বানিয়ে নিতো। আমরা বুঝলুম, এ "বিষ ...বিষমৌষধম্‌" অর্থাৎ ইংরেজী কথায় হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসা হোয়েছে, ভরসা করি আমার ডাক্তার বন্ধুরা এ ঔষধের সমর্থন কোর্‌বেন। নিদ্রায় অনিদ্রায় কোন রকমে রাত্রি কেটে গেল।

৩রা জুন, বুধবার—খুব ভোরে পাতালগঙ্গা চটি ত্যাগ কোল্লুম। ছেলেটি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চোলতে লাগলো। তাকে নিয়ে আমাদের কিছু অসুবিধা হোলো, কিন্তু সেদিকে দৃক্‌পাত না কোরে তার সঙ্গে অতি আস্তে আস্তে চোল্‌তে লাগলুম। তার শরীর মোটেই চলবার মত নয় ; এদিকে তার জন্যে পাতালগঙ্গায় দু তিন দিন বোসে থাকাও অসম্ভব, সুতরাং ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই সঙ্গত বোলে বোধ হোলো। চটি

ত্যাগ করবার আগে স্থির করা গেল যে, আজ যে রকমেই হোক দুপুরের সময় পিপুলকুঠিতে এসে আহারদি কোর্‌তে হবে।

দুপুরের সময় পিপুলকুঠিতে এসে পৌছন গেল। ছেলেটি সঙ্গে না থাকলে আমরা বেলা দশটার মধ্যেই এখানে এসে উপস্থিত হোতো পার্ত্তুম; কিন্তু তা আর ঘোটে ওঠে নি। আধ মাইল চলি, আর একটা গাছের ছায়া কি ঝরণার কাছে এসে বসি। ঝরণা দেখলেই ছেলেটী বোসতে চায়, অঞ্জলি পূরে জলপান করে, একটু বিশ্রাম কর্‌বার পর উঠে ধীরে ধীরে চোলতে আরম্ভ করে।

পিপুলকুঠিতে আমাদের সেই পূর্ব্বকার চটিতেই বাসা করা গেল। কিন্তু আজ পিপুলকুঠির ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত দেখলুম। গতরাত্রে এখানকার একজন বেণিয়ার দোকানে চুরী হোয়ে গিয়েছে। নগদ টাকা এবং সোনারূপার গহনা প্রভৃতিতে অনেক টাকা গিয়েছে। চোর মশায় কি উপায়ে গৃহপ্রবেশ কোরে এই সাধু অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হোয়েছেন, তা কেউ ঠিক কোর্ত্তে পারে নি, কিন্তু তিনি যে বমাল সমেত দরজা খুলে বেরিয়ে গেছেন, তা স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল। লালসাঙ্গার থানায় খবর পাঠান হোয়েছে, দু এক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিসের লোক এসে উপস্থিত হবে, সুতরাং বাজারের লোক কিছু ভীত ও ব্যস্ত হোয়ে পোড়েছে। আমরা পূর্ব্ববারে যে দোকান ঘরে আড্ডা নিয়েছিলুম, তার সম্মুখেই এই বেণিয়ার দোকান; কারো প্রতিসন্দেহ হয় কিনা জিজ্ঞাসা করায় সে বোল্লে কাকে সে সন্দেহ কোরবে? তার ত কোন 'দুষমন' নেই, কারো সে কখন অনিষ্ট করে না; কেন যে তার সর্ব্বনাশ হোলো, বিধাতাই জানেন; এই বোলে বেচারী কাঁদতে লাগলো। দোকানে কোন চাকর আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় জান্‌তে পারলুম, দুইজন চাকর দোকানের মধ্যেই থাকে; বেণিয়া নিজে থাকে না, সপরিবারে দোকানের উপরতালায় থাকে। বেণিয়ার আর কোন ভাই নেই, ছেলেপিলেগুলি সকলেই ছোট।

বেলা প্রায় ৮টার সময় দুই তিন জন লালপাগড়ি কনেষ্টবল সঙ্গে নিয়ে পুলিশের জমাদার সাহেব সেখানে এসে উপস্থিত হোলেন। আমরা আমাদের চটির মধ্যে বোসে জানালা দিয়ে জমাদার সাহেবের কাণ্ড-কারখানা দেখতে লাগলুম। মনে করেছিলুম, জমাদার এসেই চুরীর তদারক আরম্ভ কোর্‌বেন, কিন্তু তাঁর সে রকম ভাব কিছুই দেখা গেল না। ঘোড়া হোতে নেমেই জিজ্ঞাসা করা হোলো, কোথায় তাঁর বাসা দেওয়া হোয়েছে এবং তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কি না। কথার ভাবে বোধ হোলো, মেজাজটা বড় গরম! জমাদার সাহেব একে সরকারী লোক, তার উপর সরকারী কাজে এসেছেন, সুতরাং তাঁর কের্দ্দানীতে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য বাজার সশঙ্কিত হোয়ে উঠ্‌লো; কখন কার মাথা যায় তার ঠিক নেই!

যে বাসাটা জমাদার সাহেবের জন্যে ঠিক করা হোয়েছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে তা তাঁর পছন্দ হোলো না। তিনি গম্ভীরমুখে এবং ভারি রাগ কোরে আমাদের চটির পাশে আর একটা বাড়ীর বারাণ্ডায় একটা চারপায়ার উপর বোসে পোড়লেন। বেণিয়া তার সকল কষ্ট ভুলে হাস্যমুখে প্রচুর উপহারের সঙ্গে 'জমাদার মহাশয়ের অভ্যর্থনা কোর্ত্তে পারে নি' এই তার অপরাধ, এবং এই অপরাধের জন্যে তিনি কনেষ্টবল বেষ্টিত হোয়ে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক বোল্‌তে লাগ্‌লেন যে, চুরীর কথা সমস্ত মিথ্যা, এই শঠ বেণিয়া অনর্থক সরকারকে হায়রাণ করবার জন্যে চুরীর এজাহার দিয়েছে, বাজারের লোকেরও এতে যোগ আছে। শুনে বাজারেরর লোক আতঙ্কে আড়ষ্ট হোয়ে পোড়লো। জমাদারকে শান্ত করবার জন্যে অবিলম্বে তার সম্মুখে স্তূপাকারে খাদ্যদ্রব্যের অর্ঘ্য এনে হাজির করা হোলো। নানা রকমের জিনিস, এতই বেশী যে, জমাদার সাহেব সগোষ্ঠী মিলে তিন দিনেও তা উদরস্থ কোর্ত্তে পারেন না। এই উপহার স্তূপ দেখে হাকিম সাহেবের মেজাজটা একটু নরম হোলো; তিনি আয়াস স্বীকার কোরে তখন ধূমপানে মনোনিবেশ কোল্লেন। ধূমপান শেষ হোলে বোধ

করি চুরির কথাটা তাঁর মনে পড়লো। তিনি নিকটস্থ লোকগুলির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "কোন্ দোকানে চুরী হোয়েছে।" দশ বার জন লোক এক সঙ্গে তাঁর কথার জবাব দিল। বেণিয়া কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এসে তার সর্ব্বনাশ হোয়েছে এই কথা 'আরজ' কোর্ত্তে যাচ্ছিল, এমন সময় জমাদার সাহেব হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন ''ব্যস, চুপ'' ;—হতভাগ্য বেণিয়া, সঙ্গে সঙ্গে সাত আট জন দোকানী এই হুঙ্কার শব্দে বিচলিত হয়ে দশ হাত তফাতে সোরে দাঁড়ালো। হায়! এই দূর পার্ব্বত্যপ্রদেশ, এখানেও সেই 'বঙ্গীয় পুলিশের' অভিন্ন মূর্ত্তি ; তেমনি কর্কশ এবং কঠোর। ইহারাই আবার দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন কর্ত্তা! বুঝি পুলিশ সর্ব্বত্রই সমান।

হঠাঃ একটা কঠিন হুকুম জারি হোলো। জমাদার সাহেব হুকুম দিলেন যে, আজ বাজারে দোকানদার কি 'মুসাফির' লোক যত আছে, চুরীর তদন্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই স্থানান্তরে যেতে পারবে না। আমাদের চটিওয়ালা মনে করেছিল, আমরা বুঝি জমাদার সাহেবের এই কঠিন আদেশ শুন্‌তে পাই নি, তাই সে আমাদের কাছে এসে সংবাদ দিলে যে আজ আমরা পিপুলকুঠিতে বন্দী ; চুরীর তদন্ত শেষ না হোলে আমরা স্থানান্তরে যেতে পাচ্ছিনে। স্বামীজী বল্লেন, 'সুসংবাদ বটে! একেই বলে উদোর ঘাড়ে বুদোর বোঝা।" যে ভাবে জমাদার সাহেব তদন্ত আরম্ভ কোরেছেন, তাতে তদন্ত শেষ হওয়া পর্য্যন্ত যদি এখানে অপেক্ষা কোর্‌তে হয়, ত ইংরাজী মাসের এ কটা দিন এখানেই কাটিয়ে যেতে হবে। যা হোক্, যা হয় করা যাবে ভেবে আমরা আহারাদিতে মনঃসংযোগ কল্লুম। এ দিকে জমাদার সাহেব ষোড়শ-উপচারে আহার সম্পন্ন কোরে নিদ্রাদেবীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হ'লেন। বেলা তিনটের পর আমরা চটি ত্যাগ করা মনস্থ কল্লুম; কিন্তু জমাদার সাহেবের কঠোর হুকুম লঙ্ঘন কর্‌লে পাছে বিপদে পড়্‌তে হয়, এই ভেবে একটা উপায় স্থির করা আবশ্যক বোলে বোধ হলো।

জমাদার সাহেব তখন নিশ্চিন্ত মনে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত; দোকান-দারেরা কেহ কেহ দ্বার প্রান্তে বসে হুজুরের নিদ্রাভঙ্গের প্রতীক্ষা কচ্ছে। আমরা কি করি, তাই ভাবতে লাগ্‌লুম। স্বামীজী বল্লেন, জমাদার সাহেবকে বলে চলে যাওয়াই ভাল; কিন্তু কে সে ভারটা গ্রহণ কর্‌বে? একটু গুছিয়ে কথাগুলো বলা চাই, এবং আবশ্যক হলে ভয় দেখানও কর্ত্তব্য হবে। এই রকম অভিনয়ে আমা অপেক্ষা স্বামীজী পটু নহেন, সুতরাং আমি এ দৌত্য-কার্য্য গ্রহণে সম্মত হলুম।

জমাদার সাহেবের আড্ডায় হাজির হয়ে দেখলুম, সাহেব ঘোরতর নাসিকাগর্জ্জন কোরে নিদ্রা যাচ্ছেন; কনেষ্টবলেরা নিকটেই বসে আছে। আমি একজন কনেষ্টবলকে বল্লুম যে, প্রভুকে একবার জাগান দরকার—বিশেষ কাজ আছে। কনেষ্টবলের কাণে বোধ করি এ রকম অদ্ভুত কথা আর কখনও প্রবেশ করে নি; ঘুমন্ত জমাদারকে জাগান, আর ঘুমন্ত বাঘের গায়ে খোঁচা মারা, এ তারা একই রকম দুঃসাহসের কাজ বলে মনে করে, সুতরাং অবাক্ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমিও নাছোড়বান্দা; পুনর্ব্বার তাকে এ কথা বলা হলো, এবার কনেষ্টবল সাহেব ভ্রুকুটিভঙ্গে আমার দিকে চাইলে, পাছে হুজুরের নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌তে পাল্লে না। আমি দেখ্‌লুম, এ এক বিষম সমস্যা। শেষে খুব চেঁচিয়ে কথা কইতে লাগলুম, অভিপ্রায় আমার গলার আওয়াজে জমাদার সাহেবের নিদ্রাভঙ্গ হোক। ফলেও তাই হলো; আমার কণ্ঠস্বরে প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হলে তিনি চক্ষু রক্তবর্ণ করে বল্লেন "কোন্ চিল্লাতা হ্যায়?" সঙ্গে সঙ্গে উঠে বস্‌লেন। সম্মুখেই আমাকে দেখে ভারি গরম হয়ে কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "ক্যা মাঙ্গতা?" অনেক দিন এ দেশে থেকে পুলিশের লোকের চরিত্র সম্বন্ধে আমার অনেকখানি অভিজ্ঞতা জন্মেছে। এরা প্রবলের কাছে মেষশাবক, কিন্তু দুর্ব্বলের বাঘ! সুতরাং জমাদার সাহেব 'ক্যা মাঙ্গতা'

লেবামাত্র আমিও তেমনি স্বরে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন কল্লুম। আমরা যে তখনই চলে যেতে চাই, কোথা হতে এসেছি, কোথা যাব, আমরা কজন আছি, সমস্ত তাঁকে খুলে বলা হলো। তিনি "আবি নেহি হোগা" বলে ফরসির নলে মুখ লাগালেন। আমি দেখলুম, সহজে কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনা নেই; তখন আর একটু চড়া মেজাজে ইংরেজী ও হিন্দুস্থানীতে মিশিয়ে কথা বলতে আরম্ভ কল্লুম। তাকে সাজাসুজি জানিয়ে দিলুম যে, সে যদি আর এক দণ্ডও আমাদের ঘাটকে রাখে, তবে তার মস্তক ভক্ষণের সুব্যবস্থা করবো। রাস্তায় কোথাও কোন পুলিশের লোক কোনও রকম কুব্যবহার কল্লে তখনই ইনেস্পেকটরের জানানর ভার আমার উপর আছে; ইনেস্পেকটরের সঙ্গে যে আমার বন্ধুতা আছে সে কথাও তাকে জানিয়ে দিলুম, এবং আজ কয় দিন হলো, কর্ণপ্রয়াগে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাও বল্লুম। জমাদার যে ভাবে চুরীর তদন্ত করেন, আমি তা দেখে যাচ্ছি; এ কথা গোপন থাকবে না।

আমার কথা শুনে লোকটা একদম নরম হয়ে গেল। কাপুরুষদের বিশেষত্বই এই যে, তারা প্রথমে মুখে যতই তর্জ্জন করুক না কেন, কিন্তু ভয়ের কোন কারণ উপস্থিত হলেই একেবারে পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হলো। জমাদার সাহেব ফরসি ছেড়ে আমাদের সঙ্গে ভদ্রালাপ আরম্ভ করলেন এবং আমাদের প্রতি আদেশ দিলেন যে, আমরা যখন ইনেস্পেকটরের জানিত লোক এবং ইনেস্পেকটরের সঙ্গে কিঞ্চিৎ বন্ধুতাও আছে, তখন আমরা "চোট্টা কি ডাকু" হ'তে পারি নে; আমরা যখন ইচ্ছা চটি ত্যাগ কর্ত্তে পারি। অনেকেই সন্ন্যাসীর সাজ নিয়ে চুরী ডাকাতি কোরে বেড়ায় বলে, সকলের প্রতি তাঁকে পুলিসোচিত সন্দিগ্ধভাব প্রকাশ কর্ত্তে হয় এবং ইহা তাঁহার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফল! আমরা যদি খানিক আগে আত্মপ্রকাশ কত্তুম, তা হলে আর

তাঁকে বাধ্য হয়ে এ রকম রূঢ়তা প্রকাশ কর্ত্তে হতো না। তিনি আরও প্রকাশ করলেন যে, চুরীর তদন্ত তিনি অনেক আগে আরম্ভ করতেন, কিন্তু আজ তাঁহার "তবিয়ত আচ্ছা নেহি" তাই কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর তদন্ত আরম্ভ করা মনস্থ করেছেন, এতে সরকারী কাজের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। আর আমি এ সকল কথা যেন ইনেস্পেকটরের গোচর না করি। হাস্যমুখে তাকে অভয়দান কোরে চটি ত্যাগ করবার উদ্যোগ করতে লাগলুম; জমাদার সাহেবও তদন্ত আরম্ভ কোরলেন।

সেই এক বাজার পাহাড়ী লোকের মধ্যে দারোগা সাহেবকে খুব খানিকটে অপদস্থ কোরে আমরা চটি ত্যাগ কল্লুম; বলা বাহুল্য তখন মনে মনে প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করা গিয়েছিল এবং দারোগার দর্প চূর্ণ করবার দরুণ তার পরেও কিছু ক্ষোভের কারণ জন্মায় নি. তবে মনটা বিশেষ প্রসন্ন ছিল না। থানার দারোগা মফঃস্বলের সর্ব্বত্রই যমের এক একটী আধুনিক সংস্করণ; কনেষ্টবলগুলা যমদূত; কিন্তু সে কালের যম ও যমদূতের সঙ্গে একালের দারোগা এবং কনেষ্টবলদের অনেক বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। দারোগা সাহেবদের হাতে যমের ন্যায় কোন রকম দণ্ড না থাকলেও তাঁদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে মফঃস্বলবাসীদের সশঙ্কিত থাকতে হয়, এবং যদিও যমদূতদিগের শেল, শূল, মুষল, মুদ্গর ও পাশ একালে লৌহনির্ম্মিত হাতকড়া ও রুল নামক অনতিদীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ডে পরিণত হয়েছে তথাপি সাহসপূর্ব্বক বলা যায় যে, যম ও যমদূতের হাতে অন্তত সাধুদিগের কোন আশঙ্কা ছিল না, কিন্তু পুলিশের হাতে সাধু অসাধু কারও রক্ষা নেই; অতএব এ রকম ক্ষমতাশালী দারোগা সাহেব তাঁর হাতার মধ্যে একজন নগ্নপদ, রুক্ষকেশ, কম্বলধারী মুসাফির সন্ন্যাসীর কাছে এরূপভাবে অপদস্থ হয়ে এবং তাঁর অমোঘ হুকুম ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়ে সাধারণের সম্মুখে যে গৌরব হতে বঞ্চিত হলেন, তাঁর সেই হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে তাঁকে অনেক হয়রাণ হতে হবে এবং আমাদে

দোষে হয় ত অনেক নির্দ্দোষী বেচারা তাঁর হাতে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করবে। অনেক অসাধু লোকের এ রকম স্বভাব যে, যদি তারা নিজের কুকর্ম্মের জন্যে কারও কাছে নিগ্রহ ভোগ করে, তা হলে আর পাঁচটা নিরীহ লোককে নিগৃহীত করতে না পারলে তারা কিছুতেই শান্তি পায় না; যতক্ষণ সে রকম কোন স্থবিধা না পায়, ততক্ষণ মনে করে তার অপমানটা স্থদ সমেত অনাদায় থেকে গেল।

এই সকল কথা ভাবতে ভাবতে এবং তৎসম্বন্ধে বৈদান্তিক ভায়া ও স্বামীজীর সঙ্গে রহস্যালাপ করতে করতে আমরা অপরাহ্ণে পর্ব্বতগাত্রস্থ সঙ্কীর্ণ পথ ধরে চলতে লাগলুম। তখনও সূর্য্য অস্ত যায় নি: সূর্য্য ধূসর পাহাড়ের অন্তরালে খানিকটে ঢলে পড়েছিল, এবং তার লাল আভা পার্ব্বত্য গাছপালার উপর দিয়ে আকাশের অনেক দূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। অল্পক্ষণ পরে আকাশের পশ্চিম দিগন্তে একটু মেঘ দেখতে পেলুম, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে নীল আকাশের লোহিতাভ প্রদেশের অতি উর্দ্ধে দুই একটা কালো পাখী যেমন ছোট দেখায়, তেমনি ক্ষুদ্র একখণ্ড মেঘ,—ক্রমে মেঘখানি বড় হতে লাগলো, শেষে মোড় ঘুরে দেখি সম্মুখে পাহাড়ের উপর মেঘের দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে; বোধ হল যেন তারা পরামর্শবদ্ধ হয়ে কোন আগন্তুক শত্রুর প্রতীক্ষা কচ্ছে. আমরা বৃষ্টির জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুর্গম, দীর্ঘ পথের উপর সহসা এ রকম ঘনঘটা দেখে মনটা বড় অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো, ভাবলুম আর যাই হোক দারোগার শাপটা হাতে হাতে ফলে গেল। দেখছি কলিযুগেরও কিছু মাহাত্ম্য আছে; সত্যযুগে শুনেছি ব্রাহ্মণ যোগী ঋষির শাপে অগ্নিবর্ষণ হতো, ব্রহ্মতেজে অভিশপ্ত ব্যক্তি দগ্ধ হয়ে যেতো. আর এই কলির শেষে মুসলমান দারোগার শাপে বুঝি অজস্র বৃষ্টিধারায় আমরা ভেসে যাই। এখন কোথায় আশ্রয় নেওয়া যায়, এই চিন্তায় মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

কিন্তু এখানে আশ্রয় জুটানও বড় সহজ কথা নয়। এ সহর অঞ্চলের পথ নয় যে, ঝড়বৃষ্টির উপক্রম দেখলে কোন বাড়ীর দ্বারে আশ্রয় নেব। একবার পথে বেরুলে সহজে গ্রাম নজরে পড়ে না, যদি দুই বা চারি ক্রোশ অন্তর এক আধখান গ্রাম দেখা যায়, সে গ্রাম আর কিছুই নয়, পাঁচ সাত কি বড় জোর দশ খানি কুটীরের সমষ্টি মাত্র। গোটাকতক মহিষ, ছাগল আর জনকতক স্ত্রী পুরুষ এবং তাহাদের ছেলে মেয়ে এই গ্রামের অধিবাসী। যে কয়খান কুটীর, তা হয় ত তাদের নিজের ব্যবহারের জন্যই যথেষ্ট নয়। এই পথে চোলতে চোলতে অনেক সময় বিপদে পোড়ে এ রকম গ্রামে গৃহস্থের ঘরে আশ্রয় নিতে হোয়েছে, কিন্তু ঘরে আশ্রয় নিয়ে সমস্ত রাত্রি বাহিরেই কাটিয়েছি। আমাদের দেশে একটা কথা আছে; একবার একজন লোককে জিজ্ঞাসা করা হোয়েছিল যে, সে এতটা পথ কি রকম কোরে এল, তাতে সে লোকটা উত্তর কোরেছিল যে, "নৌকাতেই এসেছি, তবে সমস্ত রাস্তাটা গুণ টেনে। আমাদের এ পার্ব্বত্য আশ্রয়ও ঠিক সেই রকমের; গৃহস্থের ঘরে আশ্রয় পাওয়া গিয়েছিল বটে, কিন্তু সমস্ত রাত্রি অনাবৃত আকাশতলেই কাটাতে হোয়েছে। কেউ মনে কোরবেন না যে, আমি গ্রামবাসীদের আতিথেয়তার দো[illegible]দচ্ছি, তারা বাস্তবিকই অত্যন্ত আতিথেয়। পার্ব্বত্য গৃহস্থ দুর্গম হিমালয়ের নিভৃত বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়, তাই অনেক যাত্রীর প্রাণরক্ষা হয়। বাস্তবিক যদিও তারা গরিব এবং কায়ক্লেশে পর্ব্বত বিদীর্ণ কোরে যে মুষ্টিমেয় গম বা ভুট্টা সংগ্রহ করে তারই তিনখানা রুটির একখানা ক্ষুধিত অতিথিকে দিতে কিছুমাত্র কাতর হয় না; এবং অতিথির প্রতি তাদের যে যত্ন ও আগ্রহ, তা অপার্থিব। কিন্তু পরের জন্য তারা নূতন কোরে ঘর বেঁধে রাখতে পারে না; আর পাহাড়ের গায়ে বৈঠকখানা তৈয়েরী করবার মত জমিও মেলে না। অনেক খুঁজে পাহাড়ের যেখানে সামান্য একটু চাষের উপযুক্ত জায়গা পায়, তারই এক কোণে দুই পাঁচ ঘর গৃহস্থ ছোট

ছোট কুটীর তৈয়েরী করে, বাকি জমিটা চাষ করে। কাজেই অতিথির মাথা রাখবার মত স্থান কখন মেলে, কখন মেলে না। যা হোক আমাদের সম্মুখে ত আপাততঃ বৃষ্টি উপস্থিত, ঝড় হওয়াও আশ্চর্য্য নয়। তিনটী প্রাণী ঘোর তুফান মাথায় কোরে চোলেছি, এক একবার আকাশের দিকে চাচ্ছি আর অগ্রসর হোচ্ছি। কিছু লক্ষ্য নেই, তবু ব্যস্ত সমস্ত হোয়ে ছুটে চোলছি,—কথাটা আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু আমরা কেউ নির্ব্বাক্ হোয়ে চলছিনে। দারোগার সঙ্গে আমার যে কথান্তর হোয়েছিল তাহা লক্ষ্য কোরে বৈদান্তিক ভায়া উল্লেখ কোল্লেন যে, লোকের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করা সাধু সন্ন্যাসী মানুষের উচিত নয়, তাতে প্রত্যবায় আছে। তাঁর মত নৈয়ায়িকপ্রবর যে, এই শব্দ বিন্যাসের মধ্য হইতে 'অকারণ' কথাটা অনায়াসে বাদ দিলেন, সে জন্যে তাঁর সঙ্গে তর্ক করবার প্রলোভনটা সংবরণ করা দায় হোলো। আমি সবে গৌরচন্দ্রিকা ফেঁদে বিষম একটা তর্কজাল বিস্তার কোরবো এবং সেই অবসরে অনেক দূর নির্ভাবনায় যাওয়া যাবে ঠিক কোরেছি, এমন সময় স্বামীজী আমাদের ডেকে বোল্লেন সম্মুখে একটা ভয়ানক ঝড় উঠেছে; সময় থাক্‌তে আমাদের সাবধান হওয়া দরকার, আর তর্ক করবার সময় নাই! স্বামীজী আমাদের আগে আগে যাচ্ছিলেন, এক মিনিটের মধ্যে ঝড় আমাদের উপর এসে পড়লো। স্বামীজী তৎক্ষণাৎ পাহাড়ে ঠেস দিয়ে বোসে পোড়লেন। প্রবল বাতাসে কতকগুলো পাতা উড়ে স্বামীজীকে ছেয়ে ফেল্লে; তিনি ব্যতিব্যস্ত হোয়ে পোড়লেন, কিন্তু দেখলুম বৈদান্তিক ভায়া তর্ক কোরতে বিশেষ মজবুদ হোলেও তাঁর উপস্থিত বুদ্ধিটা আমার চেয়ে অনেক বেশী। তিনি অন্য উপায় না দেখে এবং বেশী কিছু বিবেচনা না কোরে আমাকে কোলের মধ্যে চেপে ধোরে রাস্তার পাশে উচু হয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি তাঁর শরীরের নীচে পোড়ে রইলুম; তিনি তাঁর বিপুল শরীর দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখ্‌লেন। বাতাসটা আমাদের উপর দিয়ে এত জোরে বোয়ে গেল, এবং আমাদের এমন

নাড়া দিলে যে, বোধ হোলো যেন সেই দণ্ডেই আমাদের দুজনকে উড়িয়ে নিয়ে পথের পাশে গভীর খাদের মধ্যে ফেলে দেবে ; কিন্তু দেখলুম, বৈদান্তিকের শরীরে অসাধারণ বল। সেই প্রবল ঝঞ্ঝাবাতটা তিনি অকাতরে সহ্য কোল্লেন। আমাদের নাক মুখের ভিতরে যে কত ছাইভস্ম প্রবেশ কোরলো তার শেষ নেই। বাতাস চোলে গেলে আমরা চেয়ে দেখলুম, গাছের পাতা ধূলো কাঁকর আর রাস্তার ছোট ছোট পাথরের মধ্যে আমরা সমাহিত হোয়েছি। দুজনেই গা ঝেড়ে উঠলুম, উঠে দেখি বৈদান্তিক ভায়ার পিট জায়গায় জায়গায় কেটে গেছে, এবং সেখান হোতে অল্প অল্প রক্ত পোড়ছে ; পাঁচ সাত জায়গায় ছড়ে গিয়েছে। বড় বড় কাঁকর খুব জোরে এসে পিঠে লাগাতেই এ রকম হোয়েছে। আমার কোন ক্ষতি হয় নি, শুধু একবার দম আটকে গিয়েছিল। ঝড় বৃষ্টির সময় পক্ষীমাতা যেমন তার ক্ষুদ্র, অসহায় শিশুটিকে বুকের মধ্যে নিয়ে তার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ও যত্ন এবং সুকোমল প্রসারিত পক্ষপুট দিয়ে ব্যাকুল আবেগের সঙ্গে ঢেকে রাখে, আজ এই ঘোর ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে বৈদান্তিকও তেমনি নিজের শারীরিক কষ্ট উপেক্ষা কোরে শরীর দিয়ে আমাকে রক্ষা কোরেছেন ; নিজের যে কষ্ট হোয়েছে, সে দিকে একটুকুও লক্ষ্য নেই। আমার শরীরে যে আঘাত লাগে নি এতেই তাঁর মহানন্দ। বৈদান্তিকের সহৃদয়তা, মহত্ত্ব এবং আমার প্রতি করুণ স্নেহ দেখে স্বতই আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতা রসে ভিজে গেল। বিপদের সময় ভিন্ন যে মানুষ চেনা যায় না, বিপদই মানুষের কষ্টি পাথর, তা তখন বুঝতে পারলুম। এই সংসারবিরাগী, শুষ্কহৃদয়, তর্কপ্রিয় পরুষভাষী বৈদান্তিকের সঙ্গে অনেক দিন হোতেই একত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি। শরীর শক্ত, মানুষ প্রকাণ্ড উঁচু, মাথার চুলগুলো আবড়া খাবড়া, ঠিক খেজুর গাছের মত ; মনে হোতো এর মধ্যে শুধু তর্কেরই ইন্ধন সঞ্চিত আছে ; এতে আর কিছু পদার্থ নেই ; কিন্তু আজ বুঝতে পাল্লুম, এই কঠিন দেহের মধ্যে একখানি অতি সুকোমল স্নেহার্দ্র হৃদয়

আছে, এবং তার ঐ অতি বিশাল বক্ষ আর্ত্তের স্নেহনীড়। কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে আমার চক্ষে জল এলো। আমরা উঠে দাঁড়ালে স্বামীজী তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে ছুটে এলেন ; আমরা কেমন কোরে রক্ষা পেয়েছি শুনে তিনি বৈদান্তিকের গায়ে তাঁর স্নেহাশীর্ব্বাদপূর্ণ হাতখানি বুলিয়ে দিলেন। স্বামীজীর ভাবে বোধ হোলো, আমাকে এমন ভাবে রক্ষা কোরেছেন বোলে বৈদান্তিককে তিনি তাঁর প্রাণের মধ্যে হোতে নীরব আশীর্ব্বাদ প্রেরণ কোরছিলেন। দুইজন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর এ কি ব্যবহার ? বৈদান্তিক বিপদের সময় আমার কাছে ছিলেন, ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে তিনি না হয় নিজের প্রাণ দিয়ে পরের প্রাণ রক্ষা কোরেছেন, কিন্তু স্বামীজী সংসারের উপর বীতস্পৃহ হোয়ে লোটা কমণ্ডলু মাত্র সার কোরে বেরিয়ে পোড়েছেন, তাঁর এ আসক্তি, এ মায়াবন্ধন, এ বিড়ম্বনা কেন ? কোথায় ভগবানের নামে বিভোর হোয়ে তিনি সময় কাটাবেন, না শুধু আমার সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্যেই তিনি ব্যস্ত। এই পর্ব্বতের মধ্যে শত কার্য্যে আমার প্রতি তাঁর স্নেহের পরিচয় পেয়েছি। আজ দেখলুম আমার জন্য তাঁর আগ্রহ, উৎকণ্ঠা—স্নেহবন্ধনে বদ্ধ গৃহীর আগ্রহ, উৎকণ্ঠা অপেক্ষা অল্প আসক্তি-বর্জ্জিত নয় ; তাই একবার আমার ইচ্ছা হোলো তাঁকে চেঁচিয়ে বলি, 'সাধু সন্ন্যাসি, এই কি তোমার সংসারত্যাগ, ইহারই নাম কি মায়ার বন্ধন ছেদন ? সমস্ত ছেড়ে হিমালয়ের মধ্যে এসেও তোমার আসক্তি বিদূরিত হোলো না। শেষে কি বোলবে যে, এই লেড়কা হামকো বিগাড় দিয়া"—কিন্তু এত কথা মুখ দিয়ে বাহির হোলো না, শুধু বোল্লুম "আমার প্রতি আপনার মায়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্চে, এটা কিন্তু ভাল নয়।" তিনি এবার জবাবে আমাকে যা বোলেছিলেন, তেমন দেববাণী আমি আর কখন শুনি নি ; তিনি বোল্লেন "আমি সংসার ছেড়ে এসেছি, সংসারে আমার কেহ নাই, তোমার সঙ্গেও আমার কোন সম্বন্ধ নেই। তোমার উপর আমার হৃদয়ের নিঃস্বার্থ স্নেহবর্ষণ কোরে

আমি প্রেমময়ের প্রেম-মন্দিরে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত কোরচি। তুমি আমার কে ?”

আমি নিরুত্তর রইলুম। অল্প অল্প বৃষ্টি পোড়তে আরম্ভ হোলো, তাতে পথ আরো পিচ্ছিল এবং দুরারোহ হোয়ে উঠলো। আমরা তিনটী প্রাণী নীরবেই চোলচি, কিন্তু বোধ করি মন চিন্তাশূন্য নয়। চারিদিকে ঘোর মেঘ, দূরে পাহাড়ের কোলে বড় বড় গাছ গুলোতে বাতাস বেধে একটা অস্পষ্ট অথচ বিকট শব্দ উঠচে, যেন বহুদূরে উন্মত্ত দৈত্যদল দুর্ভেদ্য পর্ব্বতদুর্গ বিদীর্ণ করবার জন্যে প্রবল আস্ফালন কোরুচে; আমরা কখন অতি ধীরে, কখন দ্রুতপদে চোলে অনেক বিলম্বে নারায়ণচটি নামক একটা খুব ছোট চটিতে উপস্থিত হোলুম। শুনলুম এ জায়গাটা পিপুলকুঠি হতে সবে দু মাইল; শুনে আমার বিশ্বাস হোলো না, আমাদের দেশে দু মাইল তফাৎ বোল্লে এ পাড়া ও পাড়া বুঝায়; বৌবাজার হোতে শ্যামবাজার দু মাইলের বেশী নয়; কিন্তু এ কি রকম গজের দু মাইল তা বুঝতে পাল্লুম না। এ যদি দু মাইল রাস্তা হয়, তা হলে স্বীকার কোর্ত্তে হবে, এর সঙ্গে আরো পাঁচ সাত মাইল ‘ফাউ’ যোগ করা ছিল।

আমি ইতিপূর্ব্বে আমাদের সঙ্গেকার যে রোগা ছেলেটির কথা বোলেছি, আমরা তাকে কাতর দেখে আহারান্তেই আগে রওনা কোরেছিলুম, কারণ সে যে রকম রোগা, তাতে সে যে আমাদের সঙ্গে চোল্‌তে পারবে, সে ভরসা ছিল না; তার উপর যদি তাকে আগে রওনা না করা যেতো, তা হোলে দেখছি, পথে এই দৈব দুর্য্যোগের মধ্যে সে নিশ্চয়ই মারা পোড়তো। যাহোক দারোগা সাহেব আমাদের চটী ত্যাগ করবার নিষেধবার্ত্তা জারী করবার পূর্ব্বেই সে বেরিয়ে পোড়েছিল। কথা ছিল, সে সম্মুখের চটিতে এসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা কোরবে; আমরা নারায়ণচটিতে পৌছে দেখলুম, সে আমাদের অপেক্ষায় বোসে আছে। পথে জল ঝড়ে আমাদের কি দুরবস্থা হোচ্ছে ভেবে বেচারী বড়ই চিন্তিত ও বিমর্ষ

হোয়ে বোসেছিল। আমরা ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে নারায়ণচটিতে উপস্থিত হোলুম; আমাদের দেখতে পেয়ে তার রোগক্লিষ্ট শুষ্কমুখে মৃদুহাসির রেখা ফুটে উঠলো, আমরাও তাকে সুস্থদেহে সেখানে উপস্থিত দেখে খুব আনন্দিত হোলুম।

নারায়ণ চটিতে যখন পৌছান গেল, তখনও দেখলুম বেলা আছে। পাতলা মেঘের দল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হোয়ে চারিদিকে উড়ে যাচ্চে; রোদ একটুও নেই, গাছের ডালে নানা রকম পাখী বোসে তাদের সিক্ত পাখা ঝাড়চে, আর কলরব কোর্‌চে। এখানে দু পাঁচজন মানুষের মুখ দেখে আমরা অনেকটা আশ্বস্ত হোলুম। এ চটিও পাহাড়ের এক অতি নির্জ্জন নেপথ্যে; লোকালয় নেই বোল্লেও অত্যুক্তি হয় না; তবু এখানে এসে মনে হলো, আমরা জনমানবশূন্য নির্জ্জন প্রান্তর ছেড়ে যেন একটা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ কোরেছি। পুরুষেরা নিশ্চিন্ত মনে গল্প কোরচে, মেয়েরা দু তিন জন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাসচে, কথাবার্ত্তা বোলচে; অপরিচিত কয়েকজন সন্ন্যাসীকে দেখে কৌতুক-বিস্ফারিত চোখে আমাদের দিকে চেয়ে জনান্তিকে কি বলা কহা কোরচে; আর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা এদিকে ওদিকে দৌড়ে বেড়াচ্চে; পথের উপরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাশীকৃত ভিজে কাঁকর জড় কোরচে, কিম্বা অদূরবর্ত্তী গাছের তলা হোতে রাশি রাশি শুকনো পাতা কুড়িয়ে আনচে। চারদিকে বেশ একটা জীবনের হিল্লোল এবং সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্চে।

এই চটিতে দুখানা ঘর। ঘর দুখানা নিতান্ত কুটীরের মত নয়, একটু বড় বড়। আমরা বদরিনারায়ণে যাবার সময় এ চটিটা দেখতে পাই নি। এই রাস্তা দিয়েই গিয়েছি তাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তখনো বোধ হয় এ চটি খোলা হয় নি, কি হয় ত কোন গৃহস্থের বাড়ী ভেবে এদিকে না তাকিয়েই চোলে গিয়েছি। সম্ভবতঃ তখন বিশেষ দরকার হয় নি বোলেই এ বিষয়ে উপেক্ষা কোরেছিলুম, এখন ফিরিবার সময় এই চটির

সম্ভাবনার কথা একবারও আমাদের মনে হয় নি বোলেই আমরা মেঘ দেখে ভারি ভয় পেয়েছিলুম; কারণ আমাদের মনে হোয়েছিল, এত নিকটে বুঝি আর চটি পাওয়া যাবে না। যাহোক এই চটিতে আজ আমরা কয়জন মাত্র যাত্রী; অন্য কোন যাত্রী নেই দেখে আমাদের মনে বড়ই ভরসা হোলো, কারণ যদি আমাদের আগে কোন যাত্রীর দল আস্‌তো, তা হোলে চটিতে যে সামান্য খাদ্য সামগ্রী পাবার সম্ভাবনা, তা তারা পঙ্গপালের মত সমস্ত নিঃশেষ কোরে চটির দোকানখানিকে গজভুক্ত কপিত্থবৎ নিতান্ত অসার কোরে রাখ্‌ত; আমরা দারুণ পথশ্রমে, এবং তা অপেক্ষাও নিদারুণ ক্ষুধা নিয়ে অনাহারেই পোড়ে থাকতুম। যৎকিঞ্চিৎ পানাহার হোতে বঞ্চিত হোতে হবে না ভেবে, আমরা অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত এবং আনন্দিত হোলুম। বৈদান্তিক ভায়া পেটের চিন্তাতে এতই বিভোর হোয়ে পোড়েছেন যে, তাঁহার পিঠের বেদনার দিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। চটিতে যাত্রীর ভিড় নেই দেখে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁর সেই দীর্ঘনিশ্বাসকে ভাষায় তর্জ্জমা কোর্ত্তে হোলে, এই ভাবখানা দাঁড়ায় যে, "রাম, বাঁচা গেল, একটা বাজে লোকও এখানে আসে নি দেখ্‌চি, তা হোলে এখানে দুটো খাবার এবং একটু মাথা রেখে আরাম করবার অসুবিধা হবে না।"

চটীতেই দোকানদারকে দেখতে পেলুম। তার বাড়ীও এই চটির নিতান্ত কাছে, একেবারে লাগাও বোল্লেই হয়। রাস্তার বাঁ ধারে পাহাড়ের ঢালুর দিকে দুখানা দোকান ঘর, আর ডাইন পাশে একটু উচু জমীতে তার বসতবাড়ী। দোকানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে একটু উপর দিকে নজর কোল্লেই তার বাড়ী দেখতে পাওয়া যায়। আজ এতদিন পরে তার সেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট চটিখানার কথা লিখচি, এখনও যেন সেই ঘর, দ্বার, বাড়ী আমার চক্ষুর সম্মুখে চিত্রের মত ভাস্‌চে। তার বাড়ীখানিও বেশ সুন্দর। আমাদের বঙ্গদেশের সমভূমিতে পল্লীগ্রামের সাধারণ গৃহস্থ-

বাড়ী যে রকমের, ঠিক সেই রকমের নয় বটে, কিন্তু তার সেই পার্ব্বত্য-পল্লীর সামান্য বাড়ীটাতে আমাদের পল্লীগ্রামের অনেকটা ভাব পরিস্ফুট দেখা গেল ; তেমনি জাঁকজমকহীন, পরিষ্কার সরল মাধুর্য্যমণ্ডিত, রাঙা-মাটির দেওয়াল—দেওয়ালের উপরে নানা রকমের ফল ফুল লতা পাতা-কাটা, পল্লীগ্রামের অজ্ঞাতনামা রবিবর্ম্মার হাতে তৈয়ারি অদ্ভুত রকমের পাখীর ছবি ; ছবিগুলিতে যে পরিমাণেই শিল্প-চাতুর্য্যের অভাব থাকুক, কিন্তু সেই অশিক্ষিত হস্তের অঙ্কনভঙ্গীর মধ্যে একটা আগ্রহের ভাব ফুটে উঠেছিল। সুন্দর কোরে আঁক্‌বার জন্য যে একটা ব্যাকুলতা, আর তাতে স্থায়িত্ব স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা তার প্রত্যেক রেখার মধ্যে দেখা যাচ্ছিল, আর সেইটিই সকলের চেয়ে আমার কাছে সজীব এবং সুন্দর বোলে বোধ হোচ্ছিল। পৃথিবীতে সকলে সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করে না, কিন্তু যারা সিদ্ধিলাভের জন্যে চেষ্টা করে, অসিদ্ধ হোলেও তাদের প্রাণপণ আকাঙ্ক্ষাটা উপেক্ষার বস্তু নয়।

দোকানদারের বাড়ীতে দুখানা ঘর ; একখানা বেশ বড়, তাতেই সে সপরিবারে বাস করে,আর একখানা ছোট কুঁড়ে—বোধ হোলো গোয়াল, কিন্তু তখন সে ঘরের মধ্যে গরু ছিল না, একটা মাঝারি গোছ বেল-গাছতলাতে দু তিনটে গরু বাঁধা ছিল, এবং একটা ছোট বাছুর পাহাড়ের একধারে ছুটাছুটি কোরে বেড়াচ্ছিল। বাছুরটা এক একবার তাহার মায়ের দৃষ্টির বাহিরে গেলেই তার পয়স্বিনী মাতা মাথা উঁচু কোরে প্রসারিত চক্ষে ঘন ঘন সে দিকে তাকিয়ে দেখচে, যেন সেই রজ্জুবদ্ধ গাভীটীর সকরুণ মাতৃস্নেহ অক্ষয় কবচ হোয়ে তার চঞ্চল বৎসটীকে কোন অনিশ্চিত বিপদ হোতে রক্ষা কোরতে চায়। এই বেলগাছের অদূরে আরও একটা বেলগাছ এবং দুটো পেয়ারাগাছ। এখন বর্ষার পূর্ব্বভাস মাত্র, ফুল এবং ছোট ছোট ফলে পেয়ারা গাছ দুটি ভোরে গিয়েছে। গোয়ালের পাশে এক ঝাড় কলা গাছ, তেমন সরল নয়, এবং পাতাগুলো

ছোট ছোট, যেন পাহাড়ের শুষ্ক নীরস জমী হোতে তারা যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যরস সংগ্রহ কোর্ত্তে পাচ্ছে না। দোকানদারের বাড়ীর ঠিক নীচে দিয়ে একটা ঝরণা বোয়ে যাচ্ছে; জল গভীর নয় কিন্তু অতি নির্ম্মল, এবং এই ক্ষুদ্র গ্রামখানির প্রাণস্বরূপিণী। দোকানদারের বাড়ীর সম্মুখে একটুখানি সমতল জমী আছে, মাঝখানে একটা মধ্য আকৃতি বটগাছ, গোড়াটা পাথর দিয়ে বাঁধান; আমাদের দেশের কোন কোন গাছের তলা যেমন ইঁট পাথর দিয়ে বাঁধান হয়, সে রকম নয়; কতকগুলো বড় বড় পাথর গোল কোরে গাছের গোড়ায় দেওয়া। পাথরগুলি সমস্তই আল্‌গা, তবে তার উপর বোসলে ধোসে পড়বার কোন সম্ভাবনা নেই। সকালে সন্ধ্যায় অনেকেই এই গাছের তলায় বোসে গল্প গুজবে দু দণ্ড কাটিয়ে দেয়; ধোরতে গেলে এই গাছতলাই দোকানদারটার বৈঠকখানা। আমরা এই দোকানদারের দোকানেই রাত্রির মত আশ্রয় নিলুম।

আমরা যে দোকানে আশ্রয় নিয়েছিলুম, সেই দোকানদারের বাড়ী ও দোকান খুব কাছাকাছি বোলে সে দোকান এবং ঘরের দু জায়গার কাজই চালাতে পারে। তার কটি ছেলে মেয়ে তা জানি নে, তবে একটি একটু বড় মেয়ে দোকানে এসে আমাদের জিনিসপত্র এনে দিয়েছিল। আমরা আজ সত্যসত্যই একটা প্রকাণ্ড ভোজের আয়োজন কোরে ফেল্লুম। দোকানে চাউল মিল্‌লো না, এ পাহাড়ে রাস্তার অতি কম জায়গাতেই চাউল পাওয়া যায়; অনেকদিন পরে পিপুলকুঠিতে একদিন পাওয়া গিয়েছিল। চাউল না পাবার কারণ এই যে, ভাত-ভক্ত বাঙ্গালী এদিকে প্রায়ই তীর্থ কোরতে আসে না; যে দু পাঁচজন আসে তারা অল্পদিনের মধ্যে অগত্যা ডাল রুটিতে অভ্যস্ত হোয়ে পড়ে। দোকানদারের মেয়ে আমাদের জন্যে আটা নিয়ে এল। আটার চেহারার বর্ণনাটা এখানে দিতে পাল্লুম না, সেটা আমার দোষ নয়, বঙ্গভাষায় তার উপযুক্ত দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করবার চেষ্টায় একেবারে হয়রাণ হোয়ে গিয়েছি; তবে কাব্যরস-

বঞ্চিত বৈদান্তিকের মুখে একটা উপমার কথা শুনা গিয়েছিল, তিনি আটার রং দেখে বলেছিলেন "এ কি আটা? তবু ভাল, আমি ভাব্‌ছি বুঝি খোল পিষে এনে দিয়েছে।" —কথাটা শুনে আমার মনে একটু তত্ত্ব-কথার উদয় হোলো; আমি বোল্লুম "আমাদের মনরূপ গাড়োয়ান এই দেহরূপ গরুগুলার নাকে দড়ি দিয়ে ক্রমাগত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে; কাঁধের জোয়ালও নামচে না, যাত্রারও অবসান নেই। শুধু মহাপ্রাণীটাকে কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে সন্ধ্যাবেলা এই রকম চাট্টি খোল বিচালীর বন্দোবস্ত হোলো।" স্বামীজি সকল অবস্থাতেই অটল, তিনি বোল্লেন "অচ্যুত, আজ তুমি যেমন পিঠে খেয়েছ, তেমনি এই আটা দিয়ে লুচি তৈয়েরী কোরে তোমাকে পেটে খাওয়াতে পার্ত্তুম ত বড় আনন্দ হোতো।"—"সে ত আর কঠিন কথা নয়" বোলে আমি দোকানদারের দোকানে প্রবেশ কোল্লুম এবং তার ঘিয়ের ভাঁড়টি বাদ সমস্ত ঘিটুকু নিয়ে এলুম। দোকানদার আমাদের এই ভোজন-ব্যাপারে স্বয়ং পরিশ্রম দ্বারা সাহায্য কোর্ত্তে অঙ্গীকার কোরলে। সে তার বাড়ী হোতে জিনিসপত্র এনে আমাদের যোগাড় কোরে দিলে, তার মেয়েটি আমাদের কাছেই বসে রইল। উনন জ্বলছে, আটা মাখা হোচ্চে, একটি ছোট প্রদীপে ছোট ঘরখানি আলোকিত হোয়েছে, আর মেয়েটি যুক্তাসনে বোসে তিনটি অপরিচিত অতিথির কারখানা দেখচে; একবার বা আমাদের দিকে চাইতেই আমাদের সঙ্গে যেমন চোখোচোখি হোচ্ছে, অমনি মুখ নামিয়ে দুহাতের দশটা অঙ্গুলী নিয়ে খেলা করচে। আমি বারেবারে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখেছিলুম; মুখখানি যে খুব সুন্দর তা নয়, তবে ভারি সরলতাপূর্ণ। চোখের উপর কাল কাল ভ্রূ; সমস্ত মুখখানি এবং রুক্ষ অপরিচ্ছন্ন চুলের উপর প্রদীপের আলো পোড়ে তাকে একটী পবিত্র আরণ্য ফুলের মত দেখাচ্ছিল; সুন্দর না হোক কিন্তু তার সুবাস ঢাকা থাকে না। এই মেয়েটি তার ক্ষুদ্র জীবনের কয়েক বৎসর মধ্যে আমাদের

মত কত অপরিচিত পথিক দেখেছে, কতদিন কত লোকের সুখ দুঃখের সঙ্গে তার জীবনের একদিনের সুখ, দুঃখ, আনন্দ মিশিয়ে দিয়েছে। সংসারের সকল বন্ধন কেটে যারা সন্ন্যাসী হোয়ে বেরিয়েছে, পুত্রকন্যার স্নেহের টান এই দূর হিমালয়শৃঙ্গেও যাদের হৃদয়কে সবলে আকর্ষণ কোরেছে— এমন কত লোক এমনি সন্ধ্যাবেলা এই কুটীরে প্রদীপের আলোতে এই মেয়েটির কচি মুখখানি দেখে চিরবিদায়-ক্লিষ্ট-হৃদয়ে আপনার একটী সুন্দর ছোট মেয়ের করুণ আহ্বান অনুভব কোরেছ, হঠাৎ একটা অব্যক্ত মধুর ব্যথায় তাদের বুকের শিরাগুলো টনটন কোরে উঠেছে ; এই সকল কথা ভাবতে ভাবতে আমি কুটীরের এক কোণে শুয়ে ঘুমিয়ে পোড়েছিলুম। বৃষ্টি ও ঝড়ে আমার শরীরটেও বড় কাতর হোয়েছিল, কাজেই আমাকে ঘুমুতে দেখে কেউ জাগিয়ে দেন নি। শেষে কতক্ষণ পরে জানিনে, স্বামীজির ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল, দেখি তখনো মিট্‌মিট কোরে আলো জ্বলচে, উননের আগুন নিবে গিয়েছে, মেয়েটিও চোলে গিয়েছে, তার বদলে থালের উপর অনেকগুলি গরম লুচি, খোসাওয়ালা 'রহড়কী ডাল' আর ছোট একতাল গুড়, তাতে বা[illegible] কাঁকর প্রভৃতি এমন অনেক জিনিস প্রচুর পরিমাণে মিশানো, যা [illegible]ন কালে খাদ্যশ্রেণীর মধ্যে ধর্ত্তব্য হোতে পারে না ; কিন্তু তাই পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করা গেল। আমার অনুরোধ ক্রমে দোকানদার তার মেয়েটীকে নিয়ে এল, বোধ হয় সে ঘুমিয়েছিল। প্রথমে কিছুতেই খাবার নিতে চায় না, শেষকালে তার বাপের উপদেশে কিছু কিছু নিলে। দোকানদার নিজের বা গৃহিণীর হাতের রান্না ভিন্ন খায় না, ব্রাহ্মণদের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বোলে নিজের পরিচয় দিল, সুতরাং আমাদের এই আনন্দভোজন হোতে তাকে বঞ্চিত হোতে হোলো। আমরা খুব পরিতোষের সঙ্গেই আহার কোল্লুম, পথের সমস্ত কষ্ট এবং ক্ষুধা এই গরম পুরী ও 'রহড়কী ডালের' সঙ্গে পরিপাক হোয়ে গেল। আমাদের সঙ্গী রোগা

ছেলেটীর প্রতিও এই পথ্যের ব্যবস্থা হোলো; কিন্তু এই ব্যবস্থার সমালোচনা কর্‌বার উপযুক্ত লোক সেখানে ছিলেন না; এক স্বামীজী নাড়ী টিপ্‌তে জান্‌তেন, কিন্তু তিনিই রোগা ছেলেটীকে স্বহস্তে 'ডাল ও পুরী' দিলেন।

আহারান্তে আবার নিদ্রা—অতি চমৎকার নিদ্রা; এই দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হোয়ে আমাদের সকল জিনিসের অভাব ছিল, অভাব ছিল না কেবল একটী জিনিসের, সেটী হচ্ছে—সুনিদ্রা; বাস্তবিকই এই অতি দুর্গম দীর্ঘ পথে নিদ্রা আমাদের সঙ্গিনী মায়ের মত হোয়েছিল। এই নিদ্রার অভাব হোলে বোধ করি আমরা এতটা কষ্ট সহ্য কোর্ত্তে পাত্তুম না। বিছানা ত কোনদিন জোটেই নি, কোনদিন কদাচিৎ পত্রকুটীরে মাথা রাখ্‌বার জায়গা পেয়েছি, অধিকাংশ সময়ই হয় অনাবৃত পর্ব্বত-বক্ষে, না হয় গাছের তলায় রাত্রি কাটাতে হোয়েছে; কিন্তু তখন সেই পর্ব্বতগহ্বরে ভূমি-শয্যায় কম্বল মুড়ি দিয়ে যেমন ঘুম হোতো, সেরূপ নিদ্রালাভ করবার জন্যে এখন কতদিন সুকোমল শয্যার উপর শয্যাকণ্টক ভোগ কোরতে হোয়েছে। সন্ধ্যার সময় শুয়েছি, আর এক ঘুমেই রাত্রি ভোর হোয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে শরীরের জড়তা, পায়ের বেদনা, মনের অবসন্ন ভাব দূর হোয়ে গিয়েছে; সম্মুখের বড় বড় চড়াই উৎরাইগুলো ভাঙ্গ্‌তে কিছুই কষ্ট বোধ হয় নি। আজ এই বাঙ্গালাদেশে সে সব কথা স্বপ্ন বোলে মনে হয়; আরও দিনকতক পরে হয় ত মনেই কোর্ত্তে পারবো না যে, আমার দ্বারা এমন একটা গুরুতর কাজ সম্পন্ন হোয়েছে।

৪ঠা জুন, বৃহস্পতিবার—আজ সকালে যাত্রা আরম্ভের উদ্যোগ কোরলুম। স্থির করা গেল লালসাঙ্গায় গিয়ে দুপুর বেলা বিশ্রাম কোর্ত্তে হবে। লালসাঙ্গার কথাটা আমার এখনো বেশ মনে আছে। এই পথ দিয়ে নারায়ণে যাবার সময় এখানেই সেই জুতোচোর সাধুর বিড়ম্বনা দেখেছিলুম। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আজও কিছু লজ্জাজনক ব্যাপার

দেখ্‌তে হোলো। নারায়ণ চটী হোতে লালসাঙ্গা ছয় মাইল; পথের বর্ণনার আর দরকার নেই; আজ এই একমাসের উপর হোতে শুধু চড়াই ও উৎরাই, নামা আর উঠা, পর্ব্বত নির্ঝর এবং নির্ঝর পর্ব্বত এই নিয়েই আছি। এসব কথা বলতে আর ভাল লাগে না, কিন্তু এখন নেমে যাচ্ছি, আর কখন এ সব জায়গাতে ফিরে আস্‌তে পারবো না—তাই ভেবে মনে বড় কষ্ট বোধ হোচ্ছে। একরাত্রিও যে দোকানে বাস কোরেছি, সেটি ছাড়তে মনে হোচ্ছে যেন চিরকালের মত একটা শান্তির আশ্রম ছেড়ে চোল্লুম; নারায়ণে যাবার সময় মনে হোয়েছিল যেন মহাপ্রস্থানের পথে স্বর্গে চোলেছি। এখন মনে হোচ্ছে আবার সেই আকাঙ্ক্ষা-কাতর, ধূলিময়, রৌদ্রদগ্ধ পৃথিবীতে ফিরে যাচ্ছি। আমার চিরদিনের মাতৃভূমিতে যাচ্ছি এই যা কিছু সান্ত্বনা; কিন্তু সেখানেও দুঃখ, যন্ত্রণা, হাহাকারের বিরাম নেই।

এই সকল কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে চোল্‌তে লাগলুম, শেষে বিস্তর চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে শ্রান্ত দেহে বেলা প্রায় এগারটার সময় লালসাঙ্গায় পৌঁছলুম। আজ আমার পথশ্রম বড়ই বেশী হোয়েছিল। ধীরে ধীরে আমার অভ্যাস নয় সে কথা পূর্ব্বেই বোলেছি; চোল্‌তে চোল্‌তে মধ্য রাস্তাতে বোসে আমি কোনদিনই বিশ্রাম কোর্ত্তে পারি নি। যেদিন যতটুকু যাওয়া দরকার এক দম্ চোলে, তারপর হাত পা ছড়িয়ে সে দিনের মত ছুটি। এই রকম হিসাবে চোলে আসা যাচ্ছিল, কিন্তু আজ আমাকে বাধ্য হোয়ে এ অভ্যাস ছাড়তে হোলো; আমাদের সঙ্গে সেই রোগা ছেলেটি আছে, সে নিতান্ত ভালমানুষ, মুখে কথাটি নেই। তাকে সঙ্গে কোরে পথ চলা বড় কঠিন; পাছে দ্রুত চোল্‌তে তার কষ্ট হয়, এই ভেবে আমি বড় আস্তে আস্তে চোলছিলুম। সে দশ পা যায়, আবার নিতান্ত অবসন্ন হোয়ে পড়ে; তখন গাছের ছায়ায় কি পাথরের পাশে বোসে তাকে অঞ্জলি পূরে ঝরণার জল খাওয়াই, ইংরেজী পুঁথির দু চারটে ভাল গল্প বলি, কখন বা দুই একটা

কবিতা বলে তার মনটা প্রফুল্ল করবার চেষ্টা করি। তারপর আবার তাকে নিয়ে উঠি—ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে তাকে নানারকমের অদ্ভুত গল্প বোলে—মা যেমন ছোট ছেলেটির মন গল্পে আকৃষ্ট কোরে তাঁর চঞ্চল শিশুটীকে ঘুমের রাজ্যে নিয়ে যান, তেমনি আমিও তার অজ্ঞাতসারে তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, অজ্ঞাতসারে তার গতিবৃদ্ধি হোচ্চে। এই রকম কোরে ছয় ঘণ্টায় প্রায় ছয় মাইল পথ পার হোয়ে লালসাঙ্গায় হাজির হওয়া গেল।

নারায়ণে যাওয়ার সময় লালসাঙ্গার বাজারটী পর্য্যন্ত ঘুরে দেখি নি। এবার লালসাঙ্গায় এসে সেবারকার সেই দোকানের উপরঘরেই বাসা নেওয়া গেল। আহারাদির বন্দোবস্তের ভার সঙ্গীদের উপরে সমর্পণ কোরে বাজার দেখ্‌তে বেরিয়ে পড়া গেল।

বাজারের ঘরগুলি বেশ বড় বড়, অধিকাংশই দোতালা। দোকানগুলিতে প্রচুর পরিমাণে জিনিসপত্র আছে। চারিদিক দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমি বাজারের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হোলুম। সেখানে একটা ছোট অথচ বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুটীরের সম্মুখে একটু জনতা দেখ্‌তে পেয়ে সেখানে গিয়ে দেখি চার পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপার কি জানবার জন্যে একটু অগ্রসর হোয়ে দেখি, দুজন স্ত্রীলোক হিন্দী ও বাঙ্গলায় কথা মিশিয়ে ঝগড়া কোরচে। এই দূরদেশে বাঙ্গলা কথা, তা আবার স্ত্রীলোকের মুখে, আমি আরও খানিকটে অগ্রসর হোলুম। সে সময় আমার চেহারা এমন হয়েছিল যে, আমার অতি নিকট বন্ধুও আমাকে বাঙ্গালী বোলে সন্দেহ কোর্ত্তে পার্ত্তেন না, সুতরাং সেখানে যে সমস্ত পাহাড়ী দাঁড়িয়ে ঝগড়া দেখ্‌ছিল, আমিও তাদের মধ্যে একজন হোয়ে পোড়লুম; কিন্তু গিয়ে দেখি সেখানে না গেলেই ভাল হোতো। সে দৃশ্য দেখে আমার যেমন কষ্ট তেমনি রাগ হোলো। অনেক দিন হতেই সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে চলা ফেরা, আহার উপবেশন কোচ্চি, সাধারণের

কাছে আমিও একজন সন্ন্যাসী বোলে পরিচিত, কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীর মধ্যে থেকেও সন্ন্যাসীর জাতের উপর শ্রদ্ধা অপেক্ষা আমার অশ্রদ্ধাই বেশী হোয়েছে। সন্ন্যাসীদের দূর হোতে দেখ্‌তে বেশ, কোন আসক্তি নেই; বিলাস লালসা, সংসারচিন্তার নাম মাত্র নেই; মুক্ত স্বাধীন বন্ধনহীন, কিন্তু শরীরের উপরের মত তাদের অধিকাংশেরই মনের ভিতরে এত ময়লামাটি যে, এদের ঘৃণা করাই অত্যন্ত স্বাভাবিক বোলে বোধ হয়। শ্রেষ্ঠতীর্থ কাশীধামের পবিত্রতার আবরণতলে যে বীভৎস কাণ্ডের অভিনয় হয়, পবিত্র সন্ন্যাসী নাম গ্রহণ কোরে কত সমাজতাড়িত লোক যে সন্ন্যাসধর্ম্মের উপর কলঙ্ক ঢেলে দিচ্ছে; তার আর অবধি নেই। অধিকাংশ সন্ন্যাসীই শুধু গাঁজাখোর, ভিক্ষুক, কোপনস্বভাব; সকল দোষের ঝুলি নিয়ে তীর্থে তীর্থে পাপের বীজ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তবে বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর সংখ্যা নিতান্ত কম, তাই তাদের কুকীর্ত্তি বলবার কোন সুযোগ হয় না, কিন্তু খুঁজে দেখলে বাঙ্গালী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর মধ্যেও অনেক ভণ্ড নজরে পড়ে।

আজ যে স্ত্রীলোক দুটীকে প্রকাশ্য বাজারের মধ্যে দাঁড়িয়ে অশ্লীল ভাষায় ঝগড়া কোর্‌তে দেখলুম, তারা বাঙ্গালী সন্ন্যাসি[illegible] ভৈরবী বেশ, পরিধানে গৈরিক বস্ত্র, সিঁথিতে রক্তচন্দনের কি [illegible]দূরের ফোঁটা, রুক্ষকেশপাশ আলুলায়িত, হস্তে ত্রিশূল ও কমণ্ডলু, গলে রুদ্রাক্ষের মালা, কাঁধের ঝুলি বোধ হয় কুটীরের মধ্যে আছে। অনুষ্ঠানের ত্রুটী নেই, যাত্রার দলের নির্লজ্জ ছোকরারা যেমন গোঁফ কামিয়ে সন্ন্যাসিনীর পোষাকে দর্শকদিগের সম্মুখে দর্শন দেয়, কিছুমাত্র সঙ্কোচ কিম্বা শ্লীলতা নেই, এদের দুজনেরও ঠিক সেই ভাব দেখা গেল। অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি না থাকলেও এদের আর কিছুই নেই, ধর্ম্ম নেই, কর্ম্ম নেই, সতী-ত্বের সৌকুমার্য্য নেই। স্ত্রীলোক দুজন মধ্যবয়সী, একটি প্রৌঢ়বয়স্ক বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। যার বয়স কিছু বেশী, সে এইমাত্র লালসাঙ্গা[illegible] এসেছে; দেখে বোধ হোলো সে এখনও বাসা নেয় নি; সর্ব্বশরীর

ধূলিধূসরিত শ্রান্ত ক্লান্ত। এদের বিবাদের কারণ শুনে আমার মনে যুগপৎ লজ্জা ও দুঃখ হোলো। এরা দুজনেই কেদারনাথ দর্শন কোরতে গিয়েছিল, বড় ভৈরবীর সঙ্গে একটি সাধুপুরুষ ছিল, কনিষ্ঠা ভৈরবী পূর্ব্বদিন অপরাহ্ণে সেই সাধুটিকে ভুলিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। জ্যেষ্ঠা সন্ন্যাসিনী বহু পরিশ্রমে এখানে এসে তার হারানিধিকে আবিষ্কার কোরেছে, এবং সেই সাধু পুরুষের উপর অধিকার কার, এই নিয়ে দুজনে বিষম ঝগড়া আরম্ভ কোরেছে। এ বিবাদের কথাবার্ত্তা সমস্ত হিন্দুস্থানীতে পুষিয়ে ওঠে নি, কাজেই হিন্দুস্থানী ছেড়ে এখন বাঙ্গলায় কথা চোলছে, সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই হাত মুখের অতি কুৎসিত ভঙ্গী কোরচে। আমি আর সেখানে লজ্জায় দাঁড়াতে পাল্লুম না। যে সকল দর্শক সেখানে উপস্থিত ছিল, তারা বাঙ্গলা জানে না, কাজেই তারা পরম তৃপ্ত মনে এই বীরত্ব-গাথা শুনে যাচ্ছিল। আমি সেখান হোতে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এলুম, কথায় কথায় অচ্যুত ভায়া এই কলঙ্ক কাহিনী শুন্‌তে পেলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন "তারা কি সত্যিসত্যিই বাঙ্গালী নাকি? এতক্ষণ বল নি!"—এই বলে তিনি তাঁর সুবৃহৎ পার্ব্বত্য যষ্টি নিয়ে ভৈরবীদ্বয়ের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় চটি ত্যাগ কোল্লেন। আমি ও স্বামীজি মিলে কি তাঁকে ঠাণ্ডা কোর্ত্তে পারি? শেষে অনেক নীতিকথা ব্যয় কোরে তাঁকে ফিরাই। ভৈরবীদ্বয় আপাততঃ রক্ষা পেলে, কিন্তু ভায়া তর্জ্জন কোরতে কোরতে বোল্লেন যে, একবার তাদের সঙ্গে দেখা হোলে এক লাঠির বাড়িতে তাদের ভণ্ডামী ভেঙ্গে দেবেন।

নারায়ণে যাবার সময়ে লালসাঙ্গায় এক বিনামোচোর সাধুর কীর্ত্তি-কাহিনী বোলেছিলুম, এখন ফিরবার সময়ে দুইটি বাঙ্গালী ভৈরবীর পাশব দৃশ্য দেখা গেল। স্বামীজির ইচ্ছা ছিল যে, আজকার দিনটা লাল-সাঙ্গায় থাকা যাক, বৈদান্তিক ভায়ারও তাতে বড় একটা আপত্তি ছিল না; কিন্তু না হক বোসে থাকা আমার ভাল লাগ্‌লো না; কাজেই আমরা

সেই অপরাহ্ণেই বেরিয়ে পোড়্লুম! শীঘ্র শীঘ্র নন্দপ্রয়াগে আস্‌বার আমার আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল; আমাদের সঙ্গে একজন অজ্ঞাতকুল-শীল বালক সন্ন্যাসী জুটেছিল, তার শরীরের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। আজ অনেক কষ্টে তাকে লালসাঙ্গা অবধি নিয়ে এসেছি। আজ রাতটা যদি এখানে বাস করি, তা হোলে এমনটি হওয়াও অসম্ভব নয় যে, সে একেবারে অবসন্ন হোয়ে পোড়বে; তার শরীর এমন ভেঙ্গে পোড়বে যে আর তার চলবার শক্তি থাক্‌বে না। যদিও লালসাঙ্গাতেও চিকিৎসালয় আছে, কিন্তু যাকে আজ কয়দিন থেকে সঙ্গে কোরে ফিরছি, তাকে এই অপরিচিত স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয়ে ফেলে যাব, একথাটা যেন মনে কেমন ঠেক্‌তে লাগ্‌লো। তাকে হয় ত দুদিন পরে ডাক্তারখানা থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে, অথবা সচরাচর দাতব্য চিকিৎসালয়ে রোগীদের প্রতি যে প্রকার যত্ন লওয়া হয়, তাতে এই দুর্ব্বল রুগ্ন অসহায় বালকটি দুদিন আগেই জীবনলীলা শেষ কোরে বোস্‌বে। কোন রকমে তাকে নন্দ-প্রয়াগে নিয়ে যেতে পার্‌লে আমার আর সে ভয় থাক্‌বে না। যখন নারায়ণ দর্শনে যাই, সেই সময়ে নন্দপ্রয়াগের দাতব্যচিকিৎসালয়ের ডাক্তার বাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় হোয়েছিল; তাঁকে একজন দয়ালু ভাল লোক বোলে আমার বেশ বিশ্বাস হোয়েছিল; এই রোগীটিকে তাঁর হাতে দিয়ে যেতে পার্‌লে তার যে অযত্ন হবে না এবং সেই ডাক্তারের যতটুকু বিদ্যা তাতে যদি বালকের রোগমুক্তির সম্ভাবনা থাকে, তা হোলে চাই কি সে আবার সুস্থ হোয়ে নিজ গন্তব্য স্থানে চোলে যেতে পারবে। এই জন্যই সেই অপরাহ্ণে তাড়াতাড়ি নন্দপ্রয়াগে আসবার জন্য বেরিয়ে পড়া গিয়েছিল।

প্রাতে ছয় মাইল রাস্তা হেঁটেই বালকটি কাতর হোয়েছিল, এবেলা আমাদের বাহির হবার আয়োজন দেখে সে যে অতি অনিচ্ছায় তার ঝুলিটি কাঁধে ফেলে বাহির হোলো, তা তার আকার প্রকারেই বেশ বুঝতে পারা

গিয়েছিল; কিন্তু কি করা যায়! তার মঙ্গলের জন্যই তাকে আজ এই অপরাহ্ণে আবার ছয় মাইল পথ যেতে হোলো। অপরাহ্ণ বোলে আজ আর আমরা কেহই একাকী চোল্লুম না; আমরা চারিজন মানুষ এক সঙ্গে চোলতে লাগলুম; বালকটীকে ধীরে ধীরে চলবার জন্য স্বামীজী তার সঙ্গে নানাপ্রকার গল্প জুড়ে দিলেন। সে এমনই ধীর, অথবা তার স্বাভাবিকতা গোপন করবার তার এতটাই দরকার যে, সে হুঁ, না, সেই প্রকার দুই একটী কথা ভিন্ন বেশী বাক্যব্যয় মোটেই কোরলে না; তার এই প্রকার সঙ্কোচের ভাব দেখে সে যে নিশ্চয়ই বাঙ্গালী, এ বিশ্বাস আমার ক্রমেই দৃঢ় হোচ্ছিল। সে যদি বালক না হোতো, তা হোলে তার পরিচয়ের জন্য এত আগ্রহ হোতো না; কারণ বাঙ্গালীই হোক আর হিন্দুস্থানীই হোক সন্ন্যাসীদলের মধ্যে এ প্রকার লোকের সংখ্যা খুব বেশী, যাদের পূর্ব্বজীবন না জানাই ভাল; আইনের হাত থেকে পালিয়ে জটাধারী হোয়ে ভস্ম মেখে কতজন তাদের দুর্ব্বহ জীবন যাপন কোরছে, তার ঠিকানা কি? কি কষ্টেরই জীবন তাদের! হৃদয়ের মধ্যে সন্ন্যাসের বোঝা প্রকৃত সন্ন্যাসী অপেক্ষা তাদেরই বেশী কোরে বইতে হোচ্ছে; তাদের ভাণ বেশী, কারণ তাদের আত্মগোপন বেশী দরকার। বালকটী অবশ্যই এমন কোন অপরাধ করে নি, বা তার পক্ষে এমন কোন কাজ করা সম্ভবপর নয়, যার জন্যে সে এই নবীন বয়সে সব ছেড়ে বনে বনে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। পারিবারিক কোন প্রকার অশান্তি, বা মনের কষ্টেই সে ঘর ছেড়ে ফকির হোয়েছে; নতুবা ছেলেমানুষ, ইংরেজী Entrance অবধি পোড়েছে, বয়সও অল্প এবং জাতিতে সম্ভবতঃ বাঙ্গালী, সে যে ধর্ম্মের জন্যে সব ছেড়েছে, এ কথা, এই কলিযুগের শেষভাগে পুনরায় প্রহ্লাদের ন্যায় ভক্তের আগমন সম্বন্ধে বিশ্বাসবান্ ব্যক্তি ব্যতীত আর কেউ সহজে, কি মোটেই বিশ্বাস কোরতে চাইবে না।

রাস্তায় এমন কোন ঘটনা উপস্থিত হয় নি, যার কথা বলা যেতে

পারে ; তবে রাস্তার বর্ণনা একটা দেওয়া অনায়াসেই যেতে পারে ; কিন্তু তার ভিতরে ত আর নূতন কথা কিছু নাই ; সেই চড়াই আর উৎরাই, সেই বন আর নির্ঝর ; সেই হিমালয়, সেই পাখীর কলতান, আর সেই জনশূন্য পথে আমাদের মধুর গমন। রাস্তার ধারে তেমনি অতুল শোভা বিকাশ কোরে ফুল ফুটে রোয়েছে ; অলকনন্দা তেমনি কুলকুলস্বরে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে ; বনের মধ্যে পাখীসকল তেমনি গান কোরছে। এ সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা একেবারে অভ্যস্ত হোয়ে পড়েছি। লালসাঙ্গা থেকে নন্দপ্রয়াগ ছয় মাইল। আমাদের নন্দপ্রয়াগে পৌছিতে রাত হোয়ে গেল ; তাতে আমাদের বিশেষ কোন অসুবিধার ভয় ছিল না। এখন প্রত্যাবর্তনের পথ, কোথায় কি আছে সব আমরা জানি ; যে দিন যেখানে গিয়ে সুবিধামত থাকতে পারা যায়, তারও বন্দোবস্ত আমরা পূর্ব্ব হোতেই কোরতে পারি। নন্দপ্রয়াগে উপস্থিত হোয়ে আমাদের সেই পূর্ব্ববাসেই অবস্থিতি হোলো। রাত্রিকালে আর বালকটীকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে নিয়ে যাওয়া হোলো না। যতক্ষণ তাকে আমাদের কাছে রাখতে পারি, সেই ভাল। আমাদের পৌছান সংবাদ পেয়ে থানার দারোগা মহাশয় আমাদের সঙ্গে দেখা কোর্‌তে এলেন। নারায়ণে যাবার সময়ে এখানেই পুলিসের ইন্‌স্পেক্‌টর বাবুর সঙ্গে পরিচয় হোয়েছিল, সেই সূত্রে নন্দপ্রয়াগ থানার দারোগা বাবুও আমাকে একটা বড় লোক ঠাউরে রেখেছিলেন। রাস্তায় কোন প্রকার অসুবিধা হোয়েছে কি না, পুলিসের কোন কর্ম্মচারী কোন যাত্রীর উপর কোন প্রকার অত্যাচার কোরেছে কি না, ইন্‌স্পেক্‌টর সাহেবকে আমি কোন পত্র লিখেছি কি না, এই সব কথা তিনি একটা একটা কোরে জিজ্ঞাসা কোরতে লাগলেন। তাঁর কথাগুলির জবাব দিয়ে আমি সঙ্গী বালকের কথা পাড়লুম; তাকে যে দাতব্য চিকিৎসালয়ে রেখে যাব সে কথা জানিয়ে দিলুম, এবং তাঁদের ভরসায় যে আমি নিশ্চিন্ত হোয়ে বালকটীকে ফেলে যাচ্ছি, সে কথা

বোলতেও ত্রুটী করা গেল না। দারোগা সাহেব প্রাণপণে এ কাজ কোরবেন বোলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোলেন একে সে রোগী, তার তত্ত্বাবধান করা ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম; তারপর আমি যখন এত কোরে অনুরোধ কোচ্ছি এবং ছেলেটীর সম্পূর্ণ ভার তাঁর উপরে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোচ্ছি, তখন তিনি যে প্রকারে হউক তাকে আরাম কোরে দেবেন। সেই রাত্রেই বালকটীকে চিকিৎসালয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত, কিন্তু রাত্রিটা আমরা এক সঙ্গে বাস কোর্‌বো এই অভিপ্রায় প্রকাশ করায় অতি 'সবেরে' এসে একত্রে ডাক্তারখানায় যাওয়া যাবে, এই বন্দোবস্ত স্থির কোরে 'বন্দেগি' জানিয়ে নন্দপ্রয়াগের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা মহাশয় প্রস্থান কোর্‌লেন। তিনি চোলে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁর অনুচরগণ সে রাত্রি আমাদের ছেড়ে সহজে যায় নি। আমার কথা ত বোলেই রেখেচি, কোন রকমে একবার কম্বলখানি গায়ে জড়িয়ে পোড়তে পেলেই হয়, তা হোলে স্বয়ং কুম্ভকর্ণও পেরে উঠেন কি না সন্দেহ। পর দিন ভোরে উঠে শুন্‌লুম সমস্ত রাত্রিই কনেষ্টবলগণ বাজারে পাহারা দিয়েছে এবং তাদের চীৎকারে মরা মানুষেরও নিদ্রাভঙ্গ হয়; বৈদান্তিক ভায়া নাকি রাত্রে দুই তিনবার তাদের উপর চটে উঠেছিলেন, কিন্তু আজ তারা মনিবের হুকুম পেয়েছে, আজ বেশ ভাল কোরে পাহারা দিতে হবে। কেউ যেন মনে না করেন, আমাদের মত অজ্ঞাতকুলশীল মুসাফির লোক আজ বাজারে বাসা নিয়েছে, রাত্রে হয় ত কিছু চুরি কোরে নিয়ে আমরা পালিয়ে যেতে পারি, সেই জন্যই এত কড়াকড় পাহারা। ব্যাপার এই, নীচে নেমে যাচ্ছি, খুব সম্ভবতঃ নীচে কোন জায়গায় ইনেস্পেকটর বাবুর সঙ্গে দেখা হোলে নন্দপ্রয়াগের পুলিস বন্দোবস্ত সম্বন্ধে তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা কোরলে আমি খারাপ কিছু বোল্‌তে পারি; যাতে তা না বলি তারই জন্য আজ এ প্রকার পাহারা। নতুবা দোকানদারের কাছে শুন্‌লুম, অন্য কোন দিন রাত্রে পাহারাওয়ালাদের সাড়াশব্দও পাওয়া যায় না।

পরদিন প্রাতঃকালে (৫ই জুন শুক্রবার) আমরা প্রস্তুত হবার পূর্ব্বেই দারোগা সাহেব ও দুইজন বরকন্দাজ ধড়াচূড়া পোরে এসে হাজির। স্বামীজী, বৈদান্তিক ও আমি তিনজনেই বালকের সঙ্গে সঙ্গে দাতব্য চিকিৎসালয়ে গেলুম। ডাক্তার বাবু খুব খাতির যত্ন কোর্‌লেন। পথে কোন প্রকার অসুখ হোয়েছিল কি না তার তত্ত্ব নিলেন; স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয় কোরে দিলুম। ডাক্তার অতি ভক্তিভরে তাঁর চরণ বন্দনা কোল্লেন। শেষে বালকটীর কথা বলায় অতি আগ্রহে তাকে হাঁসপাতালের একটা ছোট ঘরে একাকী থাক্‌বার বন্দোবস্ত কর্‌বার আদেশ দিলেন। বালকটীকে বিশেষ রকমে তত্ত্ব লওয়ার জন্যে এবং তাকে ভাল কোরে শুশ্রূষা কোরতে যদি কিছু ব্যয় হয় আমি তা দিয়ে যেতে প্রস্তুত হওয়ায় ডাক্তার বড়ই দুঃখিত হলেন। চিকিৎসালয়ের নিয়মানুসারে সরকার থেকেই সব দেওয়া হয়ে থাকে, তা ছাড়াও যদি বিশেষ কিছু দরকার হয়, তা হলে সেটা দেবার ক্ষমতা ভগবান্ ডাক্তারকে দিয়েছেন, এ কথা তিনি অতি বিনীতভাবে বল্‌লেন।—আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলুম।

বালকটীর জন্য বিছানা প্রস্তত হলে তাকে সেই ঘরে [illegible]য়ে যাওয়া হলো, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গেলুম। এখন বিদায় গ্রহণের সময় উপস্থিত হলো। আজ তিনদিন যদিও বালকটীকে পেয়েছি, তবুও তাকে আমাদের একজন নিতান্ত আপনার জন বলে মনে হ'তে লাগ্‌লো। এই অসহায় রুগ্ন-অবস্থায় তাকে এই পর্ব্বতের মধ্যে ফেলে যাচ্ছি: এ জীবনে হয় ত আর তার সঙ্গে দেখা হবে না; এই দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে সে যে আর বাহির হ'তে পার্‌বে, তারই বা নিশ্চয় কি, এই সব কথা ভেবে প্রাণের মধ্যে কেমন কর্‌তে লাগ্‌লো। তারপর যখনই তার সেই রোগক্লিষ্ট মলিন মুখের দিকে দৃষ্টি পড়্‌তে লাগ্‌লো, তখনই একটা অব্যক্ত শোকের ছায়া এসে আমার হৃদয় আচ্ছন্ন কর্‌তে লাগ্‌লো। তবুও আমি ধীর নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম; বৈদান্তিক ভায়ার দুইটি চক্ষু বিস্ফারিত দেখে

বেশ বুঝ্তে পার্লুম, মায়াবাদী অনেক কষ্টে মনের কোমল ভাব গোপন কর্ছেন। স্বামীজি কিন্তু কেঁদে ফেল্লেন। তিনি আর আত্মসম্বরণ কর্তে পার্লেন না ; বালকটীর হাত ধরে তিনি কান্না জুড়ে দিলেন। হায় সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, তুমিই ধন্য ! নিজের সব ত্যাগ কোরে এসে এখন পথে ঘাটে যাকে কাতর দেখ, যাকে দুঃখী দেখ, তারই জন্য কেঁদে আকুল। আমরা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর এই অশ্রুজল দেখ্তে লাগ্লুম। পরের জন্যে যে এমন ক'রে চোখের জল ফেল্তে পারে, সে দেবতা নয় ত কি !

বেলা হয়ে যায় দেখে, আমরা অতি কষ্টে বালকের নিকট হ'তে বিদায় গ্রহণ কর্লুম। ডাক্তার বাবু ও দারোগা মহাশয়কে বিশেষ ক'রে অনুরোধ করা গেল। শেষে তাঁদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আমরা নন্দপ্রয়াগ ত্যাগ ক'রে চলে এলুম। আর হয় ত এ জীবনে নন্দপ্রয়াগ দেখা হবে না। যে সব স্থান ছেড়ে যাচ্ছি, কতদিনের সাধনফলে তবে এমন সব পবিত্র স্থান দেখা হ'য়েছিল ; আবার কি এ পুণ্যভূমিতে আসা হবে ? কে জানে ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে ? কে জানে অদৃষ্ট-দেবী অন্তরাল থেকে আমাদিগকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। রাস্তায় যেতে যেতে শুধু বালকটির কথাই মনে হ'তে লাগ্লো। সে যদি আপনার পরিচয় দিত, তা হ'লে তার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা কর্তে পার্তুম। সে ত নিজের পরিচয় দিলে না। কি এক মনের আবেগে, কি এক হৃদয়ভেদী কষ্টে, যন্ত্রণায় সে লোকালয় ছেড়ে এই ভয়ানক পর্ব্বত প্রদেশে মাথা দিতেছে, তা না জান্তে পেরে তার উপরে আমাদের স্নেহ আরও বৃদ্ধি হ'য়েছিল। এমনি ক'রে কত পথিকের সঙ্গে কত দিন কত পথে দেখা হ'য়েছিল, আজ হয় ত তাদের চেহারা পর্য্যন্তও মনে নাই।

আজ ৫ই জুন শুক্রবার—নন্দপ্রয়াগ ত্যাগ ক'রে আমরা তিনটি মানুষ ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে লাগ্লুম ; কারও মনে প্রসন্নতা নেই। কেমন একটা গভীর বিষাদ বুকে কোরে আমরা নিঃশব্দে পথ বেয়ে চল্লুম ; পা

দুখানি যেন কলে চল্‌ছে। কারও মুখে কথা নেই। এমন অবসাদ নিয়ে কি বেশী পথ চলা যায়; কাজেই বেলা যখন দশটা তখন আমরা সবে চার মাইল রাস্তা এসে কালকাচটিতে বাসা নিলুম। এখন পথ ঘাট সব চেনা; যে চটিতে যাবার সময় বাস ক'রে গিয়েছি, সে চটিওয়ালাকে পর্য্যন্ত বেশ ভাল ক'রে মনে ক'রে রেখেছি। বিদ্যাবুদ্ধি মোটেই নেই, টাকা কড়ি দিয়ে যে লোককে বশ কর্‌বো তাও তেমন ছিল না; তবে একটি জিনিস সম্বল ক'রে এ পথে বেরিয়েছিলুম, সেটি 'শীতল বুলি'। একটা দোঁহা আমি সর্ব্বদাই আবৃত্তি কর্‌তুম এবং জীবনে সেটিকে কার্য্যে পরিণত কর্‌বার জন্য অনেক চেষ্টাও করেছি; সে চেষ্টা যে নিতান্তই বৃথা করি নি, তার প্রমাণ এই নারায়ণের পথে পেয়েছি। দোঁহাটী ঠিক হবে কি না বল্‌তে পারি না, তবে আমি তাকে এই আকারেই পেয়েছি;—

"ইয়ে রসনা বশ কর, ধর গরিবি বেশ,
শীতল বুলি লেকে চলো, সবহি তুমহারা দেশ।"

এই 'শীতল বুলি'—এই মিষ্ট কথাতেই সকলের সঙ্গে মিলে মিশে চলে এসেছি। আমার ত এই অভিজ্ঞতা জন্মেছে যে, পথে ঘাটে চল্‌তে হলে টাকায় কুলায় না, মান মর্য্যাদা, গর্ব্ব অহঙ্কার পদে পদে বিড়ম্বিত হয়; তারা কোন দিনই পথের সঙ্গী নয়, তা এই পাহাড়ের মধ্যেই হউক, আর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেলের গাড়ীতেই হউক। নিজের ধন, মান, মর্য্যাদা, বংশগৌরব নিজের গ্রামে বা আশ্রিতমণ্ডলীতে বেশ গুছিয়ে আপন আধিপত্য বিস্তার কর্‌তে পারে, পথে ঘাটে তা বিশেষ অসুবিধাই ঘটিয়ে দেয়। এই মিষ্ট বাক্যে সকল চটিওয়ালাকেই বাধ্য ক'রে আমরা পথ চলেছি।

কালকাচটিতে আমরা পৌঁছিলে চটিওয়ালা আমাদের দেখে বড়ই আনন্দিত হলো; কতদিন সে কতজনের কাছে আমাদের কথা বলেছে;

প্রতিদিনই আমাদের প্রত্যাগমনের পথের দিকে সে চেয়ে থাকৃত। তার কথাগুলি শুনে আমাদের মনে বড়ই আনন্দ হলো! আমরা কোথাকার কে, কবে এক রাত্রির জন্যে তার দোকানে আশ্রয় নিয়েছিলুম, আর সে আমাদের কথা মনে রেখেছে, এ কথা শুনে মনে বড়ই আনন্দ হোলো!

আমরা চটিতে বিশ্রাম কচ্ছি; দোকানদার আমাদের আহারাদির আয়োজন কর্‌ছে। সে দিন আমরা ব্যতীত সে চটিতে আর কোন যাত্রী বাসা নেয়নি; তাই দোকানদার তার যা কিছু মনোযোগ সমস্তই আমাদের সেবায় নিযুক্ত করেছে। বেলা যখন প্রায় ১১টা সেই সময়ে নীচের দিক থেকে একজন বৈষ্ণব সাধু এসে ঐ চটিতে উপস্থিত হলেন। তাঁর ভাব দেখে বোধ হলো, তিনি আজ অনেক পথ হেঁটেছেন। তাঁর সঙ্গে আর দ্বিতীয় লোকটী নেই। আমাদের দেশের বৈষ্ণবের মত বেশ; স্কন্ধে একটী ছোট রকমের ঝুলি আছে। তিনি দোকানে প্রবেশ ক'রেই নিজের ঝুলিটী নামিয়ে রেখে একেবারে মাটির উপর শুয়ে পড়লেন, এবং কতক্ষণ চোক বুজে রইলেন। তাঁর ভাব দেখে বোধ হোলো, এমনি ক'রে শুয়ে তিনি বেশ আরাম বোধ কচ্ছেন। তাঁর সে আরামে বাধা দিয়ে কথাবার্ত্তা বলা সঙ্গত নয় মনে ক'রে আমরাও চুপ ক'রে বসে রইলুম। একটু পরেই তিনি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বস্‌লেন এবং স্বামীজির দিকে চেয়ে বল্লেন, "পথশ্রমে বড়ই কাতর হয়ে পড়েছিলুম, তাই আপনাদের সঙ্গে কথা কইতে পারি নি, কিছু মনে করবেন না।" স্বামীজি অবাক্ হয়ে গেলেন; তাঁর সেই আগুল্‌ফলম্বিত দাড়ি এবং গৈরিক বস্ত্রের প্রকাণ্ড উষ্ণীষ সত্ত্বেও কি ক'রে বৈষ্ণব তাঁকে বাঙ্গালী ঠাউরে নিয়ে বেশ দিব্বি বাঙ্গালায় কথা বল্লেন, এই স্বামীজির বিস্ময়ের কারণ। কিন্তু বৈষ্ণব মহাশয় তা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন; কারণ পরক্ষণেই তিনি বল্লেন, "আপনি সন্ন্যাসীর বেশেই থাকুন আর যাই

করুন, আপনার দাড়ি আমরা কোন দিন ভুল্‌বো না। আপনার হয় ত মনে নাই, কিন্তু আপনারা যখন মুঙ্গেরে ছিলেন আমি তখন জামালপুরে থাকতুম।” স্বামীজি তাঁকে তবুও চিনতে পারলেন না। বৈষ্ণব শেষে আত্মপরিচয় দিলেন; তিনি জামালপুরে কোন আফিসে চাকরী করতেন। যখন মুঙ্গেরে কেশববাবু স্বদলবলে অবস্থান কর্‌ছিলেন, সেসময়ে ঐ অঞ্চলে খুব একটা ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হয়েছিল। অনেক শিক্ষিত যুবক ব্রাহ্মসভা, সংশোধনী সভা প্রভৃতি স্থাপন ক'রে খুব একটা সোরগোল উপস্থিত করেছিলেন; তার পর কেশব বাবুরা চলে এলেন; কিন্তু ধর্ম্মের আন্দোলন সহজে মুঙ্গের জামালপুর ত্যাগ করলে না; কতকগুলি যুবক যথারীতি স্বধর্ম্ম অবলম্বন কর্‌লেন; কেউ শৈব হলেন, কেউ বৈষ্ণব হলেন। প্রব্রিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, যিনি পরে কৃষ্ণানন্দ স্বামী নাম ধারণ করেছিলেন, তিনি সেই মুঙ্গেরের যুবকদলের একজন উৎসাহী নেতা ছিলেন। কতকগুলি যুবক ধর্ম্মের জন্য চাকুরী আদি ত্যাগ কর্‌লেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন হিন্দুধর্ম্মের প্রচারক হয়ে দেশে দেশে ফির্‌তে লাগ্‌লেন, তাঁর বক্তৃতা শুনে চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল! আমাদের সঙ্গে যে বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ হলো, তিনি কিছুদিন সেই দলেই ছিলেন, কিন্তু শেষে নিজের রুচি অনুসারে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে, যথারীতি ভেক নিয়ে এখন বৃন্দাবনে বাস কর্‌ছেন। নারায়ণ দর্শন উদ্দেশ্যে তিনি এদিকে আসেন নাই; তাঁর একজন বাঙ্গালী বন্ধু কানপুরে থাকেন; সেই বন্ধুটীর একমাত্র পুত্র কোথায় চলে গিয়েছে। তাঁরা কেমন ক'রে সন্ধান পেয়েছেন যে, সে ছেলেটী বদরিকাশ্রমের দিকে এসেছে; তাই এই বৈষ্ণব সেই ছেলের অনুসন্ধানে এসেছেন; বৃন্দাবনে বসেও প্রভুর নাম কর্‌ছিলেন, পথেও তাঁহরই নাম কর্‌বেন; বন্ধুর ছেলেটী যদি পাওয়া যায়, তা হলে বন্ধুর যথেষ্ট উপকার করা হবে, বন্ধুপত্নীও প্রাণ পাবেন। পরের উপকারের জন্যই সাধু বৈষ্ণব এই ভয়ানক পথে এসেছেন।

আমরা ত তাঁকে একেবারে নিরাশ ক'রে দিলুম। তিনি যে লোকের উদ্দেশে যাচ্ছেন তার চেহারা যে ভাবে বল্‌লেন তাতে তেমন চেহারার লোক ত আমাদের নজরে পড়ে নাই। একটী ছেলেকে আমরা সে দিন ডাক্তারখানায় রেখে এসেছি, তাকে দেখে আমাদের বাঙ্গালী বলে বিশ্বাস হয়েছে; সে কথা তাঁকে জানিয়ে দিলুম। তিনিও সেই দিনই যে ক'রে হোক্, সেই ডাক্তারখানা অবধি যাবেন। যখন এতদূর এসেছেন, তখন আর নারায়ণ দর্শন না ক'রে শ্রীধামে ফিরবেন না। লোকটী বড়ই সুন্দর প্রকৃতির। চৈতন্য দেব উপদেশ দিয়েছিলেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা,
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।

সে উপদেশ আধুনিক বৈষ্ণব মহাশয়েরা কতদূর পালন কোরে থাকেন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা তাতে ত বোল্‌তে পারি বৈষ্ণব মহাশয়েরা উপদেশের শেষাংশ পালন কোরে থাকেন, সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন তাঁরা কোরে থাকেন; তবে তার কতখানি হরির জন্য, আর কতখানি ভিক্ষার, পদ প্রসারের জন্য তা তাঁরা এবং তাঁদের হরিই বোল্‌তে পারেন। বৈষ্ণবের নাম শুন্‌লেই তার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি কথা, অনেকগুলি ভাব, আমাদের মনে এসে পড়ে; সে গুলি নামের সঙ্গে এমন দৃঢ়রূপে জড়িয়েছে যে, তাদের স্থানচ্যুত করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার হোয়ে পোড়েছে। ভাল বৈষ্ণব বড় একটা নজরে পড়ে না। প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে যে সব বৈষ্ণব দেখ্‌তে পাই, তারা শুধু ভিক্ষা পাবার জন্যই তিলকমালা ধারণ কোরেছে বোলে মনে হয়। বৈষ্ণবের কথা বোল্‌তে বোল্‌তে একটা অনেক দিনর কথা আমার মনে পোড়ে গেল। যিনি সে কথাটী বোলেছিলেন, তিনি আজ স্বর্গে; এখন তাঁর কথা আর প্রতিদিন মনে হয় না; তিনি আমার স্বর্গীয়া মাতৃদেবী। তিনি যদিও হিন্দু পরিবারের মধ্যে বর্দ্ধিত হোয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ধর্ম্মভাব

সার্ব্বভৌমিক ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত ছিল। তিনি কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়েরই গোঁড়ামী দেখ্‌তে পার্‌তেন না। তিনি এক দিন এই বৈষ্ণবদের সমালোচনা কোর্‌তে গিয়ে বোলেছিলেন যে, আমরা সংসারের মধ্যে থেকে হরিনাম অনেক সময়ে ভুলে যাই সুতরাং আমরা পাপী তার আর সন্দেহ নেই; কিন্তু এই বৈষ্ণবগুলো সংসারটাকে এতই ভালবাসে যে, তাকে একদণ্ড কাছ ছাড়া কোরতে পারে না; তাই তারা তাদের সংসারের উনকুটি চৌষট্টি ঝুলির ভিতর পূরে দিনরাত কাঁধে কোরে, পিটে ঝুলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এরা এই ঝোলাই বইবে, না হরিনাম কোর্‌বে! কথা কয়টী বড় ঠিক। বৈষ্ণব সাধু সন্ন্যাসী আমি জীবনে অনেক দেখেছি, কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই প্রাণের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা সংসার। তারা যে কেমন কোরে সমস্ত সংসার বাসনা ঝুলিতে বোঝাই কোরে নিয়ে বেড়ায় তাই ভেবে উঠা যায় না।

সে কথা থাক্। আজ এই চটিতে যে বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা হোলো, তাঁর উপরে কোন কথাই খাটে না। তাঁকে দেখে সেই অল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছিলুম, তাতে বোল্‌তে পারি লোকটি বেশ ধার্ম্মিক; আর তিনি সত্যসত্যই ধর্ম্মের জন্যই এই আশ্রমে প্রবেশ কোরেছেন। তিনি এত বেলায় রান্না কোর্‌তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমরা আর তাঁকে সে কষ্ট পেতে দিলুম না; আমাদের জন্য যে খাবার তৈয়েরী হোয়েছিল, তাই তাঁর সঙ্গে ভাগ কোরে গ্রহণ করা গেল।

আহারান্তে তিনি আর একদণ্ডও বিশ্রাম কোর্‌লেন না; আমরা যে দেশ ছেড়ে এসেছি, তিনি সেই দেশের দিকে চোলে গেলেন। আমার প্রাণের মধ্যে আবার বাসনা জেগে উঠ্‌লো। মনে হোতে লাগ্‌লো, নেমে কোথায় যাব? আমার আবার প্রত্যাবর্ত্তন কেন? বেশ ত গিয়েছিলুম, নেমে আসবার কি এমন একটা দরকার হোয়েছিল, তা ত আজ বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। কি মনে কোরে যে এতটা রাস্তা এসেছি, তা আজ মোটেই

মনে আন্‌তে পাল্লুম না। বড়ই ইচ্ছা হোলো বৈষ্ণবের সঙ্গে আবার নারায়ণের পথে চোলে যাই; সেখানে গিয়ে শেষে যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে। যে কথা সেই কাজ; আমি তখনই কম্বল কাঁধে কোরে বার হবার উদ্যোগ কোচ্ছি দেখে স্বামীজি নিষেধ কোল্লেন, এত রৌদ্রে বাহির হোয়ে কাজ নেই। আমি তাঁকে জানিয়ে দিলুম যে, আমি আবার নারায়ণের পথে যাচ্ছি; নিচে ফিরে যাওয়ার মত পরিবর্ত্তন হোয়েছে। স্বামীজি শুনে একেবারে অবাক্। সত্যসত্যই হাঁ কোরে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন; দেখে যেন বোধ হোলো, হয় তিনি আমার কথা মোটেই বুঝতে পারেন নি, আর না হয় তিনি আমার মস্তিষ্ক বিকৃতির কথা ভাবছেন। আমি তাঁকে এই অবস্থায় দেখে নিজেই নীরবতা ভঙ্গ কোরে দিলুম। 'তা হোলে আসি' এই বোলে আমি যখন পা বাড়িয়েছি, তখন সেই সন্ন্যাসী, সেই সংসারত্যাগী সর্ব্বত্যাগী সাধু এসে একেবারে দুই হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধোর্‌লেন; সেই শীর্ণ দুর্ব্বল দুই খানি হাতের বাঁধন দিয়ে আমাকে আটকিয়ে রাখ্‌বেন বোলে মনে কোর্‌লেন। শুধু তাই নয়, নির্ব্বাক সন্ন্যাসী দুই চারি বিন্দু চখের জল ফেল্‌লেন। হায় কপট সন্ন্যাসী, হায় ভণ্ড সাধু, আজ তুমি এই বাহুবন্ধনে ও চখের জলে ধরা পোড়েছ। তোমার গৈরিকবসন, দণ্ড কমণ্ডলু ও তোমার এই কষ্ট স্বীকার, এত সাধন ভজন, সব মিথ্যা; তুমি ঘোর সংসারী; তুমি এক সংসার ছেড়ে এসে আর এক সংসারে পোড়েছ। তুমি ভগবানের দ্বারে পৌঁছিতে পার্‌ছ না। এত যার স্নেহ মমতা, এত যার মানুষের উপর টান সে ভগবানকে ডাকে কি কোরে! আমি সন্ন্যাসীর সে বাহুবন্ধনে মহা বিপন্ন হোয়ে পোড়লুম, তাঁর চখের জল দেখে আমার সব ঘুরে গেল। আমি আর কথাবার্ত্তা না বোলে সেখানে বোসে পোড়লুম। স্বামীজিও আমার কাছে বোসে সস্নেহে আমার দীর্ঘকেশ রুক্ষ মস্তকে হাত বুলাতে লাগ্‌লেন। আমার আর নারায়ণের পথে যাওয়া হোল না; কিন্তু

তখনই সকলে মিলে সে চটি থেকে বেরিয়ে পড়া গেল। সন্ধ্যার সময়ে কর্ণপ্রয়াগে এসে নীরবে নিঃশব্দে একটা দোকান ঘরে রাত্রিবাস করা গেল। কর্ণপ্রয়াগে পেড়া কিন্‌তে পাওয়া যায়; সেই পেড়া খেয়েই সে রাত্রি কাটিয়ে দেওয়া গেল। ৬ই জুন—প্রাতে উঠে দেখি আকাশ একেবারে মেঘে ছেয়ে ফেলেছে, আর ধীরে ধীরে বেশ বৃষ্টি হোচ্ছে। পাহাড় অঞ্চলে এ রকম বৃষ্টি দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে হবে যে, সে দিন বৃষ্টি বড় শীঘ্র থাম্‌বে না। আমার আর এ বৃষ্টির মধ্যে বার হওয়ার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, আবার বেশ গুছিয়ে কম্বলখানি মুড়ি দিয়ে শয়ন কোর্‌তে যাচ্ছি, এমন সময়ে বৈদান্তিক ভায়া বাধা দিলেন; তিনি বোল্লেন "এ রকম বাজারে জায়গায় আর একবেলা থেকে দরকার নেই, যদি এক আধ বেলা বিশ্রাম করা নিতান্তই দরকার হয় ত পাহাড়ের মধ্যে কোন একটা নির্জ্জন চটীতে দুই এক দিন কাটিয়ে দেওয়া ভাল।" বৈদান্তিক ভায়ার কখন কি মত হয়, তা দেবতারাও ঠিক্ কোরে বোলতে পারেন না। যেখানে বেশ জিনিস পত্র পাওয়া যায়, সেখানে থাক্‌তে ইতিপূর্ব্বে কোনদিনও তাঁর কোন প্রকার আপত্তি হয় নি; কিন্তু আজ তিনি জঙ্গলের মধ্যে জনহীন পর্ব্বতগহ্বর, কি সামান্য চটীতে বিশ্রাম ভাল বোলে মত প্রকাশ কোর্‌লেন। হয় তিনি আমাকে বার হোতে অনিচ্ছুক দেখেই বার হবার জন্য প্রস্তুত হোলেন, না হয় আজ এই বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পোড়ে রাস্তায় কিঞ্চিৎ কষ্টভোগ আমাদের অদৃষ্টলিপি ছিল, তাই বৈদান্তিক আজ সকলের আগে কম্বল কাঁধে কোরে বেরিয়ে পোড়্‌লেন। আমি বাক্যব্যয় না কোরে তাঁর অনুবর্ত্তী হোলুম।

খানিকটে দূর এগিয়ে এমন ঝড়ে আটকিয়ে যাওয়া গেল যে আর এক পা অগ্রসর হবার শক্তি রইল না। মড় মড় কোরে বড় বড় গাছ সব ভেঙ্গে পোড়্‌তে লাগলো, প্রতি মুহূর্ত্তে বোধ হোল যেন এইবারেই হয় আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে বা উপর থেকে হয় গাছ ভেঙ্গে না হয়

পাহাড়ের ধস্ নেমে আমাদের সন্ন্যাসীগিরি জন্মের মত ঘুচিয়ে দেবে; আমরা তিনজন তখন এক জায়গাতেও নেই যে, একত্রে জড়িয়ে পোড়ে থাক্‌ব; কে যে কোথায় তা আর সে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে দেখ্‌তে পাওয়া গেল না। আমি একে নিজের প্রাণ নিয়ে ব্যস্ত, তার মধ্যে আবার স্বামীজির কথা মনে হোতে লাগলো। একটা গাছের শিকড় প্রাণপণে দুই হাত দিয়ে আঁকড়ে ধোরে আমি শুয়ে পোড়ে আছি। মাথার উপর দিয়ে কত কি বোয়ে যাচ্ছে, একবার একটা হয় ত প্রকাণ্ড ডালই হবে আমার মাথার কাছ দিয়ে চোলে গেল। কম্বলখানির দুই তিন জায়গা ছিঁড়ে গেল, গানের বই খানি কিন্তু বুকের মধ্যে আছে। ঝড় আর থামে না, তবু একটু নরম হোলো; বৃষ্টি খুব কম হোয়ে গেলো। বৃষ্টি কম হওয়াতে কিছু এলো গেল না; তার চাইতে যদি বাতাসটা কমে গিয়ে বৃষ্টি সমভাবেই থাক্‌তো তাতে আমার কোনই ক্ষতি ছিল না; কাপড় ও কম্বল যতটা ভিজে গিয়েছিল তার চাইতে বেশী ভিজিবার যো ছিল না। এ ভাবে আমাকে অধিকক্ষণ আর থাক্‌তে হয় নি। অচ্যুত বাবাজী আমার সম্মুখে কোথায় ছিলেন; তিনি বিপুল বিক্রমে বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ কোর্‌তে কোর্‌তে আমার কাছে এসে উপস্থিত হোলেন এবং তাঁর সেই বিশাল দেহ দিয়ে আমাকে আবৃত কোরে বোসলেন। আমার মনে পড়ে যখনই ঝড় বৃষ্টি হোয়েছে, তখনই বৈদান্তিকের নির্ম্মম কঠোর বক্ষতলে আমি আশ্রয় পেয়েছি। পক্ষীমাতা যেমন নিরাশ্রয় শাবককে বিপদ্‌কালে নিজে পাখা দুইখানির নীচে লুকিয়ে রাখে বৈদান্তিকের সেই বিপুলবক্ষ তেমনি আমাকে অনেক বিপদের সময়ে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা কোরেছে। আমি বিপন্ন হোলে আর কোন দিনই সে মায়াবাদের আশ্রয় গ্রহণ কোরে আমাকে উড়িয়ে দিতে পারে নি। এ মানুষটী এতদিন আমাদের সঙ্গে রইল, তবু এর ভাব গতিক আমি ত মোটেই বুঝ্‌তে পারলুম না; তার মতামতের একটা সামঞ্জস্য কখনও দেখা গেল না। কি একটা এলোমেলো হৃদয় নিয়ে সে যে

দেশত্যাগ কোরেছে, তা আর বোলতে পারি নে ; সে বোধ হয় এত দিনে তার সব প্রাণের বিক্ষিপ্ত জিনিসগুলিকে একত্র সংগ্রহ কোরে একটা বুদ্ধি স্থির কোর্ত্তে পারে নি।

আর একটু পরেই ঝড় থেমে গেল। স্বামীজি আমাদের পশ্চাতে আছেন, তাঁর উদ্দেশ করা দরকার হোয়ে পোড়লো ; কারণ এখনও তাঁর কোন খোঁজ খবরই নেই। আমরা দুই জনে তাঁর বিলম্ব দেখে বড়ই ব্যস্ত হোয়ে যে পথে এসেছিলাম সেই পথে ফিরে যেতে লাগ্‌লুম। বেশী দূরে যেতে হোলো না ; একটু পথ যেতে না যেতেই দেখি তিনি ভারি ব্যস্ত হোয়ে ছুটে আস্‌ছেন। আমাদের দুই জনকে দেখে একেবারে বোসে পোড়লেন; তাঁর এই প্রকার হঠাৎ বোসে পড়া দেখে আমরা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লুম, তিনি অনেক দূর থেকে ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে আমাদের যে কি দশা হোলো তাই জান্‌বার জন্য বিশেষ আকুল হয়ে আস্‌ছিলেন, সম্মুখে আমাদের দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে চুপ কোরে বোসে রইলুম। তিনি যখন একটু কথা কইবার মত হোলেন, তখন আমরা কি কোরে কোথায় আশ্রয় পেয়েছিলুম তাই জান্‌বার জন্য উৎসুক হোলেন এবং আমাদের ভিজে কাপড় ও কম্বল দেখে দুঃখ কর্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর নিজের শরীরে মোটেই জল লাগে নি ; তিনি ভগবানের কৃপায় একটী প্রশস্ত গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেখানে ঝড় বৃষ্টি মোটেই ঢুকতে পায় নি, আমাদের অবস্থা শুনে তিনি ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানালেন ; আজ যে ঝড়জল তাতে ভগবানের কৃপা না হলে আমরা আর বাঁচতুম্ না। স্বামীজি এতই ভগবদ্‌প্রেমে বিগলিত হয়ে পড়লেন যে, সেখান থেকে যে তিনি শীঘ্র গা ঝাড়া দিয়ে উঠেন তেমন রকমটা মোটেই বোধ হোলো না। প্রথমে তিনি চক্ষু মুদ্রিত কোরে বস্‌লেন, আমরা দুইটী হতভাগ্য পাষাণ-হৃদয়-জীব হাঁ কোরে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। একটু পরেই তিনি গান আরম্ভ কোরে দিলেন।—আমার উপর তাঁর

একটা আদেশ ছিল যে, যখনই যেখানে তিনি যে অবস্থায় গান ধর্‌বেন আমাকে তাতে যোগ দিতেই হবে, আমার ভাগ্যক্রমে তিনি কখনও এমন কোন গান করেন নি যা আমি জানিনে; গাইতে যদিও ভাল জানি না—ভাল কেন, নিজের তৃপ্তি ব্যতীত আমার গান শুনে আর দ্বিতীয় ব্যক্তির তৃপ্তি জন্মাবার দুরাশা আমি ত কোন দিনও মনে স্থান দিই নি, কিন্তু তা বোলে আমার গানের তহবিল শূন্য নয়; গাইতে পারি আর না পারি গান আমার অনেক সংগ্রহ আছে; আর তা না হলে যদিও কম্বল ও যষ্টি সম্বল কোরে পথে বেরিয়েছিলুম, কিন্তু আমার পরমারাধ্য কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের গানের বইখানি কোন দিনও ছাড়ি নি, সেখানিকে বৈষ্ণবের জপমালার মত বুকে কোরে নিয়ে বেড়িয়েছি।

স্বামীজি গান ধর্‌লেন; তার সবটা মনে নেই। তবে তার মুখখানি মনে আছে, পাঠকগণের মধ্যে যাঁদের জানা আছে তাঁরা সবটা গেয়ে নেবেন, গানটী এই -

"হরি সে লাগি রহো রে ভাই"

এই গানটী মিরা বাইয়ের রচিত। স্বামীজি যখন তখনই এ গানটী গাইতেন। তিনি যে ভাবে উল্‌টে পাল্‌টে গানটী গাইতে লাগ্‌লেন, তাতে কতক্ষণে যে তিনি গান ছেড়ে দেবেন তা মোটেই বুঝতে পারা গেল না; এ দিক বেলাও হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। অগত্যা আমি গান ছেড়ে দিলুম; তাঁরও স্বরও ধীরে ধীরে নাম্‌তে লাগ্‌লো, শেষে একেবারে বাতাসে মিলিয়ে গেল। কিন্তু তখনও তিনি উঠ্‌লেন না। গান শেষ হয়েছে দেখে আমরা দুইজনে উঠে এদিক্ ওদিক্ কর্‌তে লাগ্‌লুম। কিছুক্ষণ পরে তিনি আপন মনেই চল্‌তে লাগলেন; আমরা দুইজন ধীরে ধীরে তাঁর পশ্চাতে যেতে লাগ্‌লুম।

আজ দুই প্রহরে যে চটিতে আশ্রয় নিয়েছিলুম তার নামটী আমার খাতায় লেখা নেই, সে জায়গাটা ফাঁক রয়েছে; বোধ হয় সেই দুই

প্রহরে কোন নূতন চটিতে ছিলাম, তার নামটী শুনে নিতে মনে ছিল না, বিশেষ এই প্রত্যাবর্ত্তনের সময় আমার ডাইরীটা তেমন নিয়ম মত লেখাই হোতো না ; তার কারণ হচ্ছে এই নারায়ণে যাবার সময় যেমন একটা ফুর্ত্তি নিয়ে বেরিয়েছিলুম, আসবার সময় তার সম্পূর্ণ অভাব। এখন কলের পুতুলের মত যাচ্ছি, এ কথাটা মনে হোলে আমার প্রাণের ভিতর কেমন একটা ঘোর অবসাদের ভাব এসে উপস্থিত হোতো ; আমার উদাস প্রাণকে আরও উদাস কোরে ফেল্‌তো ; আমি মোটেই মনটাকে স্থির কোরে নিতে পার্‌তুম না ; কাজেই সে সময়ে কোন কাজই ভাল লাগ্‌তো না ; আর সেই জন্যই প্রত্যাবর্ত্তনের ডাইরী শুধু যে ভাল কোরে রাখা হয় নি তা নয়, অ সম্পূর্ণ পড়ে রয়েছে। যতই নীচে নেমেছি ততই জড়তা, বিষাদ, দুঃখ কষ্টের ছবি সব আমার প্রাণের ভিতর বেশী কোরে ফুটে উঠেছে, আর ততই আমি অন্যমনস্ক হয়েছি।

সেই অজ্ঞাতনামা চটিতে দুই প্রহরে বিশ্রাম কোরে অপরাহ্ণে আবার পথে। আজ সন্ধ্যায় আমরা শিবানন্দী চটিতে এসে রইলুম। এই চটিতে আমাদের একাকী ফেলে অচ্যুত বাবাজী চলে গেলেন। আমরা শিবানন্দীর সেই ঠাকুরবাড়ীতে পূর্ব্ব বারের মত বাসা কোরে রইলুম। রাত্রিটা বেশ কেটে গেল।

৭ই জুন—শিবানন্দী হতে রুদ্রপ্রয়াগ পর্য্যন্ত পথ অতি দুর্গম্য, এমন ভয়ানক রাস্তা যে কিছুতেই পা ঠিক রাখা যায় না। আর এই পথের মধ্যে পাহাড়গুলো আবার এমন নরম যে, একটু জল হলেই অনেক ধস্ নামে। গবর্ণমেণ্ট এই রাস্তাটাকে ঠিক রাখ্‌তে না পেরে শিবানন্দীর ৪ মাইল উপরে পিপল চটিতে একটা লোহার সেতু নির্ম্মাণ কোরে রাস্তা-টাকে নদীর অপর পার দিয়ে চালিয়েছেন এবং সেই রাস্তা রুদ্রপ্রয়াগে এসে আবার আর একটা লৌহ সেতুর সাহায্যে পূর্ব্ব রাস্তায় এসে মিশেছে। আমরা এ সংবাদ জান্‌তুম, কিন্তু আমাদের এও জানা ছিল, এই নূতন

রাস্তায় আশ্রয়স্থান নেই। তাই আমরা নারায়ণে যাবার সময়েও সে রাস্তায় যাই নি; এখন ফিরিবার সময়েও সে রাস্তায় গেলাম না। পিপলচটিতে অপেক্ষা না কোরে আমরা একেবারে শিবানন্দীতে এসে উঠেছিলুম। আজ শিবানন্দী হতে বাহির হয়ে একটু, বোধ হয় মাইল দেড় কি দুই মাইল হবে, অগ্রসর হয়েই দেখি রাস্তার চিহ্নমাত্র নেই। গতকল্য যে ঝড় জল হয়েছিল, তাতে রাস্তা একেবারে ধুয়ে নেমে গিয়েছে। এখন কি করা যায়; স্বামীজি বল্লেন, আর কি করা; ফিরে পিপল চটিতে আজ রাত্রিবাস কোরে, কাল খুব ভোরে উঠে নদী পার হয়ে নূতন রাস্তা ধরে যেমন করে হোক, না খেয়ে নাগাদ সন্ধ্যা কি চার ছয় দণ্ড রাত্রের মধ্যে রুদ্রপ্রয়াগে পৌছতে হবে, তা ছাড়া আর উপায় নেই। ফিরে যেতেও আমাদের আপত্তি ছিল না। তার পরের দিন অনাহারে সারাদিন চল্‌তেও যে বড় একটা ভারি কষ্ট হবে তাও মনে হয় নি; কিন্তু আজকের সারা দিন রাত্রি পিপলচটিতে বাস অপেক্ষা গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া ভাল; অচ্যুত ভায়ারও এই মত। যে পিপলচটির লক্ষ লক্ষ মাছির দৌরাত্ম্যের কথা আজও আমার মনে আছে, সেখানে কিছুতেই রাত্রিবাস করা হবে না। অচ্যুত ভায়া বল্লেন, "আপনারা এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি একটু উপরে উঠে গাছ ধরে ধরে এগিয়ে দেখি এই সুমুখের পাহাড়ের ও পাশে রাস্তা আছে কি না।" যে কথা সেই কাজ; তিনি তাঁর বেদান্তদর্শনের বোঝা ও কম্বলখানি নামিয়ে রেখে বিপুল বিক্রমে গাছপালা ধরে ধরে উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন; এবং কখন গাছের পাতা সরিয়ে, কখন শিকড় ধরে বেশ যেতে লাগ্‌লেন; এবং মধ্যে মধ্যে আমাদের দিকে সগর্ব্ব দৃষ্টিনিক্ষেপ কোর্‌তে লাগ্‌লেন। কিছুক্ষণ পরেই চীৎকার কোরে বল্লেন, "ভয় নেই, এ দিকের রাস্তা তেমন ভাঙ্গে নি" তার পর আবার যেমন কোরে গিয়েছিলেন ঠিক তেমনি কোরে ফিরে এলেন।

আমি তাঁর গমনাগমন দেখে বেশ যেতে পারব বলে মনে ভরসা বাঁধলুম, কিন্তু স্বামীজি তেমন সাহস পান না। অবশেষে কি করেন, আর ত কোন উপায় নাই; কাজেই তাঁর দণ্ড কমণ্ডলু অচ্যুত ভায়ার জিম্মা কোরে দিয়ে তিনিই আগে রওনা হলেন; বৈদান্তিক তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগলেন; সে সময়ে বৈদান্তিকের দৃষ্টি এমন সতর্ক যে তা লিখে বোঝাতে পাচ্ছি না; তিনি শুধু স্বামীজির গতি বিধির উপর নজর রেখে অগ্রসর হচ্চেন, আর মধ্যে মধ্যে খবরদারী করছেন। বোধ হয় আমি তাঁর প্রদর্শিত পথে অনায়াসে যেতে পারব ভেবে তিনি আর আমার দিকে লক্ষ্য রাখলেন না, শুধু সাবধান কোরে দিতে লাগলেন। আমরা তিনটী মানুষ অতি সাবধানে পাহাড়ের গা দিয়ে যেতে লাগলুম; কখন গাছের ডাল ধরে, কখনও লাফিয়ে অগ্রসর হতে লাগলুম। শেষে অনেক কষ্টে নিরাপদে একটা রাস্তায় উঠা গেল। এই আমাদের কষ্টের শেষ নয়। রাস্তায় ৫।৭ জায়গায় ভেঙ্গে গিয়েছে; তবে এই ভাঙ্গনটা যেমন অনেকটা স্থান জুড়ে, অন্যগুলি তেমন নয়। সেগুলি পার হতেও লাফালাফি কোর্‌তে হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে তেমন বেশী কষ্ট হয় নি। যাই এক দুই ঘণ্টার পথ ৫ ঘণ্টায় চলে বেলা প্রায় ১১টার সময় আমরা রুদ্রপ্রয়াগে এসে উপস্থিত। নারায়ণে যাবার সময়ে আমরা রুদ্রপ্রয়াগের গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্মশালায় ছিলাম এবং সেখানে পীড়িত হয়ে আমাদের তিন দিন থাক্‌তে হয়; এবারে সেইজন্য আর ধর্ম্মশালায় গেলাম না; বাজারে একটা দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল।

আমরা আহারাদি শেষ কো'রে বিশ্রামের আয়োজন কচ্ছি; বেলা তখন দুইটা বেজে গিয়েছে বলে বোধ হলো। সেই সময়ে দেখি একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী বাঙ্গালা ভাষায় যাচ্ছেতাই বলে দোকানদারগণকে গালাগালি দিতে দিতে আমাদের সম্মুখ দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমরা যে দোকানখানিতে ছিলুম, সেখানি বাজারের একপ্রান্তে অবস্থিত। লোকটীর গৈরিক বসন

দেখে তাকে সন্ন্যাসী বলেছি। তার পায়ে বেশ এক্‌জোড়া জুতা, পরিধানে গৈরিক বস্ত্র, গায়ে গৈরিক পিরান, একখানি কম্বল, তাকেও রং কোরে পোষাকের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে; হাতে একটা সেতার; তারও পরিত্রাণ নাই, তাকেও গৈরিক খোলে মোড়া হয়েছে। লোকটা বড়ই রাগান্বিত দেখে আমি তাকে ডাক্‌তে লাগ্‌লুম; বাঙ্গালা ভাষায় তাকে ডাক্‌ছি তবুও সে রাগের ভরে চলে যায় দেখে আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে তার পথ রোধ কোরে দাঁড়ালুম এবং কেন সে এত চটে গিয়েছে জিজ্ঞাসা করায়, সে দোকানদারের পিতৃমাতৃ উচ্চারণ কোরে গালি দিতে লাগ্‌লো এবং রাগে গর্ গর্ কোরে কতকগুলি কথা বলে ফেল্‌লে। তার সার এই যে, আজ ভোরে রওনা হয়ে ৭।৮ ক্রোশ রাস্তা সে হেঁটে এসেছে, সঙ্গে একটি পয়সা নেই; এখানে এসে যে দোকানে যায় সেই দোকানদারই বিনা পয়সায় তার আহার যোগাতে অসম্মত হয়; বেলা আড়াই প্রহরের সময় বেচারীর উপর এ প্রকার অত্যাচার করায় সে কি কোরে তার মেজাজ ঠিক্ রাখ্‌তে পারে; আপনারাই তার বিচার করুন। অনেক বুঝিয়ে তাকে এনে আমাদের দোকানে বসালুম এবং দোকানদারের ঘরে জল খাবার যা ছিল তা দিয়ে তার উদরদেবকে শান্ত করা গেল। সে যখন প্রকৃতিস্থ হোলো তখন তাকে আমি বুঝিয়ে দিলাম যে, সে যে প্রকার চটা মেজাজের লোক তাতে বিনা সম্বলে এ পথে চোল্‌তে পার্‌বে না; তার চাইতে তার পক্ষে ফিরে যাওয়া ভাল, এবং সে যদি সম্মত হয়, তা হোলে তাকে আমরা সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজী আছি। সে তাতে সম্মত হোলো না; যে কোরেই হোক সে নারায়ণ দর্শন কোরতে যাবেই। তার সদুদ্দেশ্যে বাধা দেওয়া অকর্ত্তব্য মনে কোরে আমি যথাসাধ্য তাকে সাহায্য কোল্লুম; শেষে এক সঙ্গেই সকলে বাহির হওয়া গেল। দুর্ব্বাসার ছোট সংস্করণ সাধু নারায়ণের পথে গেলেন, আমরাও শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হুলোম। এই স্থানে একটি

না। আমার সঙ্গে একখানি গানের বই ছিল, সেই বই খানি যখন ভাল কোরে বাঁধান হয়, সেই সময়ে তাতে কতকগুলি সাদা কাগজ জুড়ে রাখি; উদ্দেশ্য নূতন নূতন গান পেলে সেখানে লিখ্‌ব। যখন নারায়ণের পথে যাই সে সময়ে সেই খাতায় সাদা কাগজ দেখে স্বামীজি আমাকে কিছু কিছু লিখে রাখ্‌তে বলেন এবং তাঁরই আদেশে আমি যে দিন যেখানে যা দেখেছিলুম তা লিখে রাখি। কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনের পথে শ্রীনগর অবধি এসে আর আমার লেখ্‌বার তেমন ইচ্ছা হোলো না। আসল কথা এই যে, যতই আমি লোকালয়ের দিকে নেমে আস্‌ছিলুম ততই যেন কেমন কোরে আমার সব গোলমাল হোয়ে যাচ্ছিল, আমার মনের অবস্থা ততই কেমন খারাপ হোচ্ছিল; এ অবস্থায় কি আর রোজনামচা লিখে রাখবার ইচ্ছা হয়। বিশেষ যে পথে গিয়েছিলুম, সেই পথেই প্রত্যাবর্ত্তন; নূতন ব্যাপার, নূতন দৃশ্য কিছুই আমার সম্মুখে পড়ে নি; ডাইরি না লিখবার ইহাও একটী কারণ।

শ্রীনগর হিমালয়ের মধ্যে হোলেও সেটা লোকালয়। আমরা লোকালয়ে পৌছিয়েছি। শ্রীনগরে আমার অনেক বন্ধু, অনেক ছাত্র আছেন, তাঁদের সঙ্গে কয়েক দিন কাটিয়ে আমি ফিরে আসি।

এখন আমার বিদায় গ্রহণের সময়। হিমালয়ের পরম পবিত্র মহিমা আদি কীর্ত্তন কোর্‌তে পারে নাই; যেটী যেমন কোরে বোল্‌লে ভাল হোতো, যেটী যে ভাবে বর্ণনা কোর্‌লে ঠিক কথাটী বলা হোতো, আমার দুর্ব্বল লেখনী তাহা বোল্‌তে পারে নি। যে দৃশ্যেরসম্মুখে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান শিল্পী নিজের দুর্ব্বল হস্তের অযোগ্যতায় কাতর হোয়ে তুলিকা দূরে নিক্ষেপ করে সেই মহান দৃশ্যের সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়িয়ে থেকেই কৃতার্থ হন, আমি সেই হিমালয়ের মহিমা বোলতে গিয়েছিলুম, আমার স্পর্দ্ধা কম নয়! আর যে রকম কোরে দেখ্‌লে ঠিক দেখা হোতো, আমার তা মোটেই হয় নি। আমি শ্মশানের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা বুকে নিয়ে

হিমালয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পোড়েছিলুম; আমি শুধু দুই হাতে হিমালয়ের শীতল বাতাস, হিমালয়ের কঠিন বরফ বুকে চেপে ধোরেছি; চারি দিকে যে স্বর্গের দৃশ্য জগৎপাতার অনন্ত মহিমা অনুক্ষণ কীর্ত্তন কোর্‌ত, আমার কি সে সব দেখ্‌বার শুন্‌বার সময় ছিল, না তেমন আমার মন ছিল? আমি তখন মাথা উঁচু কোরে কি আকাশের দিকে, স্বর্গের দিকে চাইতে পার্‌তুম; সে ভাবই তখন আমার ছিল না। আর হৃদয়ের মধ্যে যে কবিত্ব থাক্‌লে মানুষ গাছের ফল, নদীর জল, ফুলের সৌন্দর্য্য, নির্ঝরিণীর কলতান, বিহঙ্গের হৃদয়মনমোহন কূজন বর্ণনা কোর্‌তে পারে, আমার সে কবিত্ব কোন দিনই ছিল না; আমার কবিত্বানুভবের অবকাশ বা সুবিধা কোন দিনই হয় নাই, সুতরাং কিছুই বলা হয় নাই। আমার এই অতি সামান্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত পোড়ে যদি কারো প্রাণে হিমালয় দর্শন ইচ্ছা প্রবল হয়, তাহা হোলেই আমার এ সব লেখা সার্থক হবে, এবং সেই হিমালয়ের দেবতা ভগবানের চরণে যদি কেহ অগ্রসর হোতে পারেন, তা হোলে আমার জীবন সার্থক হবে।